শিবাজী

যদুনাথ সরকার

শিবাজী

যদুনাথ সরকার

হিন্দুত্ববুক্স

বইটি প্রকাশে প্রুফ সংশোধনের যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রী দেবদত্ত মাজী (সভাপতি, সিংহবাহিনী), শ্রী দেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শ্রীতমা দেবনাথ, শ্রীমতী মনামী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রাজা দেবনাথ এবং আরও একজন, তিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

https://hindutvabooks.com

https://facebook.com/hindupustakkendra

https://twitter.com/hindutvabooks

mailto:hindutvabooks@gmail.com

প্রথম অধ্যায় : মহারাষ্ট্র দেশ ও মারাঠা জাতি

দেশের বিস্তৃতি

১৯১১ সালের গণনায় দেখা গেল যে, সমগ্র ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় দুই কোটি নরনারী মারাঠী ভাষা বলে। ইহার মধ্যে এক কোটির কিছু বেশী বোম্বাই প্রদেশে, প্রায় আধ কোটি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে, এবং পঁয়ত্রিশ লক্ষ নিজামের রাজ্যে বাস করে। সিন্ধু বিভাগ বাদ দিলে বোম্বাই প্রদেশের যাহা থাকে তাহার অর্দ্ধেক অধিবাসীর, মধ্যপ্রদেশের এক-তৃতীয়াংশের, এবং নিজাম-রাজ্যের সিকি লোকের মাতৃভাষা মারাঠী। এই ভাষার দিন দিন বিস্তৃতি হইতেছে, কারণ ইহার সাহিত্য বৃহৎ এবং বর্দ্ধিষ্ণু, আর মারাঠারা তেজস্বী উন্নতিশীল জাতি।

প্রকৃত মহারাষ্ট্র দেশ বলিলে বুঝাইত দক্ষিণ ভারতের উঁচু জমির পশ্চিম প্রান্তে প্রায় আটাশ হাজার বর্গমাইল স্থান; অর্থাৎ, নাসিক, পুণা ও সাতারা এই তিন জেলার সমস্তটা, এবং আহমদনগর এবং শোলাপুর জেলার কিছু কিছু,—উত্তরে তাপ্তী নদী হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর আদি শাখা বর্ণা নদী পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে সীনা নদী হইতে পশ্চিম দিকে সহ্যাদ্রি (অর্থাৎ পশ্চিম-ঘাট) পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত। আর, ঐ সহ্যাদ্রি পার হইয়া আরব-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে লম্বা ফালি জমি তাহার উত্তরার্দ্ধের নাম কোঁকন, এবং দক্ষিণ ভাগ কানাড়া ও মালবার; এই কোঁকনে থানা, কোলাবা ও রত্নগিরি নামে তিনটি জেলা এবং সংলগ্ন সাবন্ত-বাড়ী নামক দেশী রাজ্য প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল ব্যাপিয়া আছে। ইহার অধিকাংশ লোকে এখন মারাঠী বলে, কিন্তু তাহারা সকলেই জাতিতে মারাঠা নহে।

চাষবাস ও জমির অবস্থা

মহারাষ্ট্র দেশে বৃষ্টি বড় কম এবং অনিশ্চিত; এজন্য অল্প শস্য জন্মে, এবং তাহাও অনেক পরিশ্রমের ফলে। কৃষক সারা বৎসর খাটিয়া কোনমতে পেট ভরিবার মত ফসল লাভ করে। ইহাও আবার সকল বৎসরে নহে। যে শুষ্ক পাহাড়ে দেশ, তাহাতে ধান হয় না, গম ও যব জন্মে অত্যন্ত কম। এ দেশের প্রধান ফসল এবং সাধারণ লোকের একমাত্র খাদ্য জোয়ারি, বাজ্‌রী এবং ভুট্টা। মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিতে এইসব গাছের চারা শুকাইয়া যায়, জমির উপরটা পুড়িয়া ধূলার রং হয়,

সবুজ কিছুই বাঁচে না, অসংখ্য নরনারী এবং গরু-বাছুর অনাহারে মারা যায়। এইজন্যই আমরা এতবার দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে পাই।

পাহাড় বনে ঢাকা অনুর্ব্বর দেশ, কাজেই লোকসংখ্যা বড় কম। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সহ্যাদ্রি পর্ব্বতশ্রেণী মেঘ পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া সমুদ্রে যাইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর এই সহ্যাদ্রি হইতে পূর্ব্বদিকে কতকগুলি শাখা বাহির হইয়াছে। এইরূপে দেশটা অনেক ছোট ছোট অংশে বিভক্ত, প্রতি অংশের তিনদিকে পাহাড়ের দেওয়াল আর মাঝখান দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত কোন প্রাচীন বেগবতী নদী। এই খণ্ডজেলাগুলিতে মারাঠারা নিভৃতে বাস করিত, বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিত না, কারণ তাহাদের না ছিল ধনধান্য, না ছিল তেমন কিছু শিল্প-বাণিজ্য, না ছিল বণিক, সৈন্য বা পথিককে আকৃষ্ট করিবার মত সমৃদ্ধ রাজধানী। তবে ভারতের পশ্চিম সাগরতীরের বন্দরগুলিতে পৌঁছিতে হইলে এই প্রদেশ পার হইয়া যাইতে হইত।

গিরি-দুর্গ

এই নির্জ্জনবাসের ফলে মারাঠা জাতি স্বভাবতঃই স্বাধীনতাপ্রিয় হইল এবং জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিল। এই দেশে প্রকৃতিদেবী নিজ হইতে অসংখ্য গিরি গড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে আশ্রয় লইয়া মারাঠারা সহজেই অনেকদিন ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে এবং বহুসংখ্যক আক্রমণকারীকে বাধা দিতে পারিত; অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত শত্রু অবসন্নমনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত।

পশ্চিমঘাটশ্রেণীর অনেক পর্ব্বতের শিখরদেশ সমতল আর পাশগুলি অনেকদূর পর্য্যন্ত খাড়া, অথচ তাহাদের উপরে অনেক ঝরণা আছে। অতীত যুগে এই পাহাড়ের গা হইতে ট্র্যাপ প্রস্তর গলিয়া পড়িয়া অতি কঠিন ব্যাসল্ট (কষ্টিপাথর) খাড়া দেওয়াল অথবা স্তূপের আকারে বাহির হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গা বা খোঁড়া যায় না। পর্ব্বতের চূড়ায় পৌঁছিবার জন্য পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটিলেই এবং পথরোধের জন্য গোটাকয়েক দরজা গাঁথিলেই, এক একটি সম্পূর্ণ দুর্গ গঠিত হয়,—বিশেষ কোন পরিশ্রম বা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। এরূপ গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়া পাঁচশত লোক বিশ হাজার শত্রুকে বহুদিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। অগণিত গিরিদুর্গ দেশময় ছড়ান থাকায়, বিনা কামানে মহারাষ্ট্র জয় করা অসাধ্য।

জাতীয় শ্রমশীলতা ও সরলতা

যে দেশের অবস্থা এরূপ, সেখানে কেহই অলস থাকিতে পারে না। প্রাচীন মহারাষ্ট্রে কেহই অকর্ম্মণ্য ছিল না—কেহই পরের পরিশ্রমের ফলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত না; এমন কি গ্রামের জমিদার (পাটেল বা প্রধান) শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া নিজের অন্ন উপার্জ্জন করিতেন। দেশে ধনীর সংখ্যা খুব কম ছিল, এবং তাহারা ব্যবসায়ী শ্রেণীর। জমিদারগণেরও যে গৌরব ছিল তাহা ততটা মজুত টাকার জন্য নহে, যতটা শস্য ও সৈন্য-সংগ্রহের জন্য।

এরূপ সমাজে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ কায়িক পরিশ্রম করিতে বাধ্য; সৌখিনতা ও কোমলতার স্থান এখানে নাই। প্রকৃতিদেবীর কঠোর শাসনে সকলকেই কোনমতে সাদাসিদে ধরণে সংসার চালাইতে

হইত; সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা, অনন্যমনে জ্ঞান বা সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা, এমন কি ভব্যতা পর্য্যন্ত অসম্ভব ছিল। উত্তর-ভারতে মারাঠাপ্রাধান্যের সময় এই বিজেতাদের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইত—তাহারা অহঙ্কারী হঠাৎ বড়লোক, কোমলতা ও ভব্যতাহীন, এমন কি বর্ব্বর। তাহাদের প্রধান ব্যক্তিরাও শিল্পকলা, সামাজিকতা, এবং সৌজন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না। ভারতের অনেক প্রদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা রাজা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা কোন সুন্দর অট্টালিকা, মনোহর চিত্র বা কারুকার্য্যময় পুঁথি প্রস্তুত করায় নাই।

মারাঠা চরিত্র

মহারাষ্ট্র দেশ শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর; এরূপ জলবায়ুর গুণও কম নয়। এই কঠিন জীবনের ফলে মারাঠা-চরিত্রে আত্মনির্ভরতা, সাহস, অধ্যবসায়, কঠোর আড়ম্বরশূন্যতা, সাদাসিদে ব্যবহার, সামাজিক সাম্য, এবং প্রত্যেক মানবেরই আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা,—এই-সব মহাগুণ জন্মিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পর্য্যটক ইউয়ান্ চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপ চক্ষে দেখিয়াছিলেন,— “এই দেশের অধিবাসীরা তেজী ও যুদ্ধপ্রিয়; উপকার করিলে কৃতজ্ঞ থাকে, অপকার করিলে প্রতিহিংসা খোঁজে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে তাহারা ত্যাগস্বীকার করে, আর অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়ে না। তাহারা প্রতিহিংসা লইবার আগে শত্রুকে শাসাইয়া দেয়।”

যে সময় এই বৌদ্ধ-পথিক ভারতে আসেন, তখন মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের মধ্য অংশে সুবিস্তৃত ও ধনজনপূর্ণ রাজ্যের অধিকারী। তাহার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিজয়ের ফলে রাজ্য হারাইয়া তাহারা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লইল, এবং গরীব অবস্থায় কোণঠাসা হইয়া পড়িল। এই নির্জন দেশে জঙ্গল, অনুর্ব্বরা জমি এবং বন্যজন্তুর সহিত লড়াই করিয়া কমে তাহারা ভব্যতা ও উদারতা অনেকটা হারাইল বটে, কিন্তু অধিকতর সাহসী, চতুর এবং ক্লেশসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। মারাঠা-সৈন্যগণ সাহসী, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী; রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা শত্রুর জন্য ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া বুদ্ধিবলে নিজেকে বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানর সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রণালী বদলানর ক্ষমতা—একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফগান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য কোন জাতির নাই।

সামাজিক সাম্যভাব

ধনী এবং সুসভ্য সমাজে যেমন অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ, উচ্চনীচ-ভেদ আছে, ষোড়শ শতাব্দীর সরল গরীব মারাঠাদের মধ্যে সেরূপ ছিল না। সেখানে ধনীর মান ও পদ দরিদ্র হইতে বড় বেশী উঁচু ছিল না, এবং অতি দরিদ্র লোকও যোদ্ধা বা কৃষকের কাজ করিত বলিয়া আদরের পাত্র ছিল; অন্ততঃ তাহারা আগ্রা-দিল্লীর অলস ভিক্ষুকদল বা পরান্নভোজী চাটুকারদের ঘৃণিত জীবন যাপন করা হইতে রক্ষা পাইত, কারণ এদেশে কুঁড়ে পুষিবার মত কোন লোক ছিল না। প্রাচীন প্রথা এবং দারিদ্র্যের ফলে মারাঠা-সমাজে স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দিত না, অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিত না। স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ট্রে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ হইল এবং সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল। ঐ দেশের ইতিহাসে অনেক কর্ম্মী ও বীর মহিলার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শুধু যে-সব বংশ

ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিত, তাহারাই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের অবরোধে রাখিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ-বংশের স্ত্রীলোকেরাও অবরোধ-মুক্ত, এমন কি অনেকে অশ্বারোহণে পটু ছিলেন।

দেশের ধর্ম্মও এই সামাজিক সাম্যভাব বাড়াইল। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রগ্রন্থ নিজহাতে রাখিয়া ধর্ম্মজগতে কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নূতন নূতন জন-ধর্ম্ম উঠিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শিখাইল যে লোকে চরিত্রের বলেই পবিত্র হয়,—জন্মের জন্য নহে; ক্রিয়াকর্ম্মে মুক্তি হয় না, হয় অন্তরের ভক্তিতে। এই নব ধর্ম্মগুলি ভেদবুদ্ধির মূলে আঘাত করিল। তাহাদের কেন্দ্র ছিল এই দেশের প্রধান তীর্থ পংঢ়ারপুরে। যে-সব সাধু ও সংস্কারক এই ভক্তিমন্ত্রে দেশবাসীকে নবজীবন দান করিলেন, তাঁহারা অনেকেই অব্রাহ্মণ নিরক্ষর,—কেহ দর্জ্জি, কেহ ছুতার, কেহ কুমোর, মালী, মুদী, নাপিত, এমন কি মেথর। আজিও তাঁহারা মারাঠা দেশে ভক্তহৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। তীর্থে তীর্থে বাৎসরিক মেলার দিনে অগণিত লোক সম্মিলিত হইয়া মারাঠাদের জাতীয় একতা, হিন্দুজাতির একপ্রাণতা অনুভব করিত; জাতিভেদ ঘুচিল না বটে, কিন্তু গ্রাম ও গ্রামের মধ্যে, প্রদেশ ও প্রদেশের মধ্যে ভেদবুদ্ধি কমিতে লাগিল।

সাধারণের সাহিত্য ও ভাষা

মারাঠী জন-সাহিত্যও এই জাতীয় একতা-বন্ধনের সহায় হইল। তুকারাম ও রামদাস, বামন পণ্ডিত ও মোরা পন্ত প্রভৃতি সন্ত-কবির সরল মাতৃভাষায় রচিত গীত ও নীতিবচনগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছিল। “দক্ষিণদেশ ও কোঁকনের প্রত্যেক শহর ও গ্রামে, প্রধানতঃ বর্ষাকালে, ধার্ম্মিক মারাঠা-গৃহস্থ পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবর্গ লইয়া শ্রীধর কবির “পোথী” পাঠ শোনে। ভাবাবেশে তাহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে থাকে, মাঝে মাঝে কেহ হাসে, কেহ দুঃখের শ্বাস ফেলে, কেহ বা কাঁদে। যখন চরম করুণ রসের বর্ণনা আসে তখন শ্রোতারা একসঙ্গে দুঃখে কাঁদিয়া উঠে, পাঠকের গলা আর শুনা যায় না।” [একবার্থ]

প্রাচীন মারাঠী কবিতায় সুদীর্ঘ গুরুগম্ভীর পদলালিত্য ছিল না, ভাবোচ্ছ্বাসময় বীণার ঝঙ্কার ছিল না, কথার মারপেঁচ ছিল না। "নিরক্ষর জনসাধারণের প্রিয় পদ ছিল 'পোবাড়া' অর্থাৎ 'কথা' (ব্যালাড্)। ইহাতেই জাতীয় চিত্তের স্ফুরণ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সমতলক্ষেত্র, সহ্যাদ্রির গভীর উপত্যকা এবং উচ্চগিরিশ্রেণী—সর্ব্বত্রই গ্রামে গ্রামে দরিদ্র 'গোন্ধালী'-গণ (অর্থাৎ, চারণেরা) ভ্রমণ করে, এখনও সেই অতীত যুগের ঘটনা লইয়া 'কথা ও কাহিনী' গান করে,—যখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অস্ত্রবলে সমগ্র ভারত জয় করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সমুদ্রপার হইতে আগত বিদেশীর কাছে আহত বিধ্বস্ত হইয়া দেশে পলাইয়া আসিয়াছিল। গ্রামবাসীরা ভিড় করিয়া সেই কাহিনী শুনিতে থাকে, কখন-বা মুগ্ধ, নীরব থাকে, কখন-বা উল্লাসে উন্মত্ত হয়।”[একবার্থ]

মারাঠী জনসাধারণের ভাষা আড়ম্বরশূন্য, কর্কশ, কেবলমাত্র কাজের উপযোগী। ইহাতে উর্দ্দূর কোমলতা, শব্দবিন্যাসের মারপেঁচ, ভাব প্রকাশের বৈচিত্র্য, ভব্যতা ও আমীরি সুর একেবারেই নাই। মারাঠারা যে স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রজাতন্ত্রপ্রিয় তাহার প্রমাণ—তাহাদের ভাষায় ‘আপনি’ অর্থাৎ সম্মানসূচক কোন ডাক ছিল না, সকলেই 'তুমি'।

এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল, মহারাষ্ট্র দেহে ভাষায় ধর্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য্য একতা ও সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ছিল; তাহাও পূরণ

করিলেন—শিবাজী। তিনিই প্রথমে জাতীয় স্বরাজ্য স্থাপন করিলেন; তিনি দিল্লীর আক্রমণকারীকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে যুদ্ধের সূচনা করেন, তাহা তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ চালাইয়া দেহের রক্তদানে মারাঠা-মিলন গাঁথিয়া তুলিল। অবশেষে পেশোয়াগণের রাজত্বকালে সমগ্র ভারতের রাজরাজেশ্বর হইবার চেষ্টার ফলে যে জাতীয় গৌরব-জ্ঞান, জাতীয় সমৃদ্ধি, জাতীয় উৎসাহ জাগিয়া উঠে তাহা শিবাজীর ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া দিল,—কয়েকটি জাত (caste) এক ছাঁচে ঢালা হইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ (nation) গঠিত হইবার পথে অগ্রসর হইল। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে ইহা ঘটে নাই।

কৃষক ও সৈনিক জাত

'মারাঠা' বলিতে বাহিরের লোক এই নেশন্ বা জনসঙ্ঘ বোঝে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে এই শব্দের অর্থ একটি বিশেষ জাত অর্থাৎ বর্ণ, সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী নেশন্ নহে। এই মারাঠা জাত্ এবং তাহাদের নিকট কুটুম্ব কুন্‌বী জাতের অধিকাংশ লোকই কৃষক সৈন্য বা প্রহরীর কাজ করে। ১৯১৯ সালে মারাঠা জাত সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং কুন্‌বীরা পঁচিশ লক্ষ ছিল। এই দুই জাত লইয়া শিবাজীর সৈন্যদল গঠিত হয়—যদিও সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছিলেন।

"মারাঠা (অর্থাৎ কৃষক) জাত সরল, খোলামন, স্বাধীনচেতা, উদার ও ভদ্র; সদ্ব্যবহার পাইলে পরকে বিশ্বাস করে; বীর ও বুদ্ধিমান, পূর্ব্বগরিমা স্মরণ করিয়া গর্বোৎফুল্ল। ইহারা মুরগী ও মাংস খায়, মদ ও তাড়ি পান করে (কিন্তু নেশাখোর নহে)। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার মারাঠা জাত হইতে যত লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়, অন্য কোন জাত হইতে তত নহে। অনেকে পুলিস এবং পাইক হরকরা হয়। মারাঠারা কুন্‌বীর মত শান্ত ভদ্রব্যবহারকারী, মোটেই রাগী নহে, কিন্তু অধিকতর সাহসী ও দয়াদাক্ষিণ্যশালী। তাহারা বেশ মিতব্যয়ী, নম্র, ভদ্র ও ধর্মপ্রাণ। কুন্‌বীরা এখন সকলেই কৃষক হইয়াছে—তাহারা স্থির, শান্ত, শ্রমী, সুশৃঙ্খল, দেবদেবীভক্ত, এবং চুরি-ডাকাতি বা অন্য অপরাধ হইতে মুক্ত। তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পুরুষের মত বলিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।" (বম্বে গেজেটিয়র)

মারাঠা-চরিত্রের গুণের কথা বলিলাম, এইবার তাহাদের দোষগুলির আলোচনা করা যাক।

মারাঠা চরিত্রের দোষ

মারাঠা-রাজশক্তি বিদেশ-লুণ্ঠনের বলে বাঁচিয়া থাকিত। এরূপ দেশের রাজপুরুষেরা নিজের জন্য লুঠ করিতে, অর্থাৎ ঘুষ লইতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রভুর প্রবৃত্তি ভৃত্যে দেখা দেয়। শিবাজীর জীবিতকালেও তাঁহার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীরা নির্লজ্জভাবে ঘুষ চাহিত ও আদায় করিত।

মারাঠাদের মধ্যে ব্যবসায়-বুদ্ধি বড় কম, ইহার ফলে তাহাদের রাজত্ব বেশীদিন টেকে নাই। এই জাতির মধ্যে একজনও বড় শ্রেষ্ঠী(ব্যাঙ্কার), বণিক, ব্যবসায়-পরিচালক, এমন কি সর্দ্দার ঠিকাদারেরও উদ্ভব হয় নাই। মারাঠা-রাজশক্তির প্রধান ত্রুটি ছিল—অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপারকতা। ইহাদের রাজারা

সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত, নিয়মিত সময়ে ও সুচারুরূপে রাজ্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ এবং শাসন-যন্ত্র ঠিক এবং দ্রুত পরিচালন করা তাঁহাদের সকলের নিকট অসম্ভব ছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান মারাঠারা এক অতুলনীয় সম্পদে ধনী। মাত্র তিন পুরুষ আগে তাহাদের জাতি শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিল, রাজ্যের দৌত্যকার্য্য ও সন্ধির তর্ক এবং ষড়যন্ত্রজালে লিপ্ত হইয়াছিল, রাজস্ব-চালনা আয়ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিল,সাম্রাজ্যের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা যে-ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা এখন সেই ভারতেরই অধিবাসী। এই-সব কীর্তির স্মৃতি প্রতি মারাঠার অন্তরে অবর্ণনীয় তেজের সঞ্চার করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধীর শ্রমশীলতা, সরল চালচলন, মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য প্রাণের টান, যাহা উচিত বলিয়া জানি তাহা করিবই—এই দৃঢ়পণ, ত্যাগস্পৃহা, চরিত্রের দৃঢ়তা, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যে বিশ্বাস,—এই-সব গুণে মারাঠী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের অপর কোন জাতি হইতে কম নহে, বরং অনেকস্থলে শ্রেষ্ঠ। আহা! সেই সঙ্গে তাহাদের যদি ইংরাজদের মত অনুষ্ঠানগঠনে ও বন্দোবস্তে দক্ষতা, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবার শক্তি, লোককে চালাইবার ও বশ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, এবং অজেয় বিষয়-বুদ্ধি (common sense) থাকিত, তবে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরূপ হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিবাজীর অভ্যুদয়

ভোঁশলে বংশ

শিবাজীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক মারাঠাদের জাতীয় জীবন-প্রভাত। তিনিই দেশের শক্তিহীন, খ্যাতিহীন বিক্ষিপ্ত মানুষগুলিকে একত্র করিয়া, শক্তি দিয়া রাষ্ট্রসঙ্গে গাঁথিয়া, হিন্দুর ইতিহাসে এক নবীন সৃষ্টি রচনা করেন। এটি যে তাঁহার ব্যক্তিগত কীর্ত্তি তাহার প্রমাণ পাই—যখন আমরা তাঁহার আদি-পুরুষদের ইতিহাস এবং তাঁহার পৈত্রিক পুঁজিপাটা খুঁজিয়া দেখি। বিশাল বেগবতী স্রোতস্বতীর মত তাঁহার উদ্ভব অতি ক্ষুদ্র স্থান হইতে, প্রায় অজ্ঞাত তমসাচ্ছন্ন।

মারাঠা নামক জাতের যে শাখায় শিবাজীর জন্ম, তাহার উপাধি "ভোঁশলে"। এই ভোঁশলে পরিবার দাক্ষিণাত্যে অনেকস্থলে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহারা রাজপুতদের বংশশাখার মত এক রক্তের টানে বাঁধা ছিল না, অথবা কোনো একজন দলপতির আজ্ঞায় চালিত হইত না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবার লইয়া নিজ গ্রামে থাকিত, কোন সাধারণ গোষ্ঠীপতিকে মানিত না, বা জাতের মিলনে কখনও সমবেত হইত না। জমি-চাষ ও পশুপালনই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল, যদিও মারাঠা জাতের দুই-চারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী প্রধান বা জমিদারের নাম মধ্যযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বহমানী-সাম্রাজ্য ভাঙিবার সময় এবং তাহার শতবর্ষ পরে আহমদনগরের নিজামশাহী রাজবংশের দ্রুত অবনতির বিপ্লবে, মারাঠারা এক মহাসুযোগ পাইল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ফলে মারাঠা কৃষক-বংশের অনেক বলিষ্ঠ, চতুর ও তেজী লোক হাল ছাড়িয়া অসি ধরিল, সৈনিকের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া পরে জমিদার ও রাজা হইতে লাগিল। কিরূপে কৃষকপুত্র ক্রমে ক্রমে দস্যুর সর্দ্দার, ভাড়াটে সৈন্যের দলপতি, রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত সামন্ত, এবং অবশেষে স্বাধীন নরপতির পদে উঠিতে পারিত তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত—শিবাজী।

শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষ

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাবাজী ভোঁশলে পুণা জেলার হিঙ্গনী এবং দেবলগাঁও নামক দুইটি গ্রামের পাটেল (অর্থাৎ মণ্ডল)-এর কাজ করিতেন। গ্রামের অন্যান্য কৃষকগণের ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যের এক অংশ পাটেল পদের বেতনস্বরূপ তাঁহার প্রাপ্য ছিল; ইহা ছাড়া তিনি নিজের কিছু ক্ষেতও চাষ করিতেন। এই দুই উপায়ে তাঁহার সংসার চলিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার

দুই পুত্র মালোজী ও বিঠোজী প্রতিবেশীদের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া এলোরা পর্ব্বতের পাদদেশে বিরুল গ্রামে চলিয়া গেলেন। এখানে চাষবাসে আয় বড় কম দেখিয়া তাঁহারা সিন্ধখেড়ের জমিদার এবং আহমদনগর রাজ্যের সেনাপতি লখ্‌জী যাদব রাও-এর নিকট গিয়া সাধারণ অশ্বারোহী (বার-গীর্) সৈন্যের চাকরি লইলেন। প্রত্যেকের বেতন হইল মাসিক কুড়ি টাকা।

শাহজী ও জীজা বাঈ

যাদব রাও ভোঁশলেদেরই মত জাতে মারাঠা। মালোজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজী দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন, যাদব রাও এই বালকটিকে সোহাগ করিতেন এবং সঙ্গে করিয়া অতঃপুরে লইয়া যাইতেন। একদিন হোলীর সময় যাদব রাও নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধব অনুচরগণ লইয়া নাচ-গান উপভোগ করিতেছিলেন। পাঁচ বৎসরের বালক শাহজীকে এক কোলে এবং নিজের তিন বছরের কন্যা লীলা বাঈকে অপর কোলে বসাইয়া তাহাদের হাতে আবীর দিলেন এবং শিশু দুটির হোলী খেলা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ভগবান মেয়েটিকে কি সুন্দর করিয়াই গড়িয়াছেন। আর শাহজীও রূপে ইহারই সামিল। ঈশ্বর যেন যোগ্যে যোগ্যে মিলন ঘটান!”

যাদব রাও হাসির ভাবে একথা বলিলেন, কিন্তু মালোজী অমনি দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, “আপনারা সকলে সাক্ষী, যাদব রাও আজ তাঁহার কন্যাকে আমার ছেলের সঙ্গে বাগদত্তা করিলেন।” একথা শুনিয়া যাদব রাও ক্ষুণ্নমনে মেয়ের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; অন্যদিনের মত শাহজীকে সঙ্গে লইলেন না।

যাদব রাও-এর পত্নী গিরিজা বাঈ অতি বুদ্ধিমতী ও তেজস্বী বীর রমণী। (১৬৩০ সালে যখন নিজাম শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দরবার মধ্যে হঠাৎ তাঁহার স্বামীকে খুন করেন, তখন গিরিজা বাঈ এই দুঃসংবাদে অভিভূত না হইয়া তৎক্ষণাৎ পরিবারবর্গ অনুচর ও ধনসম্পত্তি লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে রাজধানী হইতে বাহির হইলেন এবং দলবদ্ধভাবে কুচ করিতে করিতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলেন। শত্রুপক্ষ তাঁহাকে বন্দী করিতে অথবা তাঁহাদের সম্পত্তি লুঠিতে পারিল না। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা ঐ সময়ে তাঁহার স্থিরবুদ্ধি ও সাহসের খুব প্রশংসা করিয়াছেন।)

হোলীর মজলিসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত শুনিয়া গিরিজা বাঈ রাগিয়া স্বামীকে বলিলেন, “কি! এই গরীব ভবঘুরে সামান্য ঘোড়সওয়ারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের সম্বন্ধ? বিবাহ সমান সমান ঘরেই সম্ভব। তুমি কি অবিবেচনার কাজই করিয়াছ! কেন উহাদের এই অন্যায় কথার উপযুক্ত জবাব দিলে না, এবং ধমকাইলে না?”

মালোজীর সংসারে উন্নতি

যাদব রাও পরদিনই দুই ভাইকে তাঁহাদের বেতন চুকাইয়া দিয়া চাকরি হইতে বরখাস্ত করিলেন। মালোজী ও বিঠোজী অগত্যা বিরুল গ্রামে ফিরিয়া আবার চাষ করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে মালোজী ক্ষেতের শস্য পাহারা দিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক গর্ত্ত হইতে একটি বড় সাপ

বাহির হইল, আবার তথায় ঢুকিল। মাটির তলে গুপ্তধন প্রাচীন সাপে রক্ষা করে এই বিশ্বাস সেকাল হইতে অনেক দেশে চলিয়া আসিতেছে। মালোজী ঐ গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেখানে সাতটি লোহার কড়াই-ভরা মোহর পাইলেন।[1]

এতদিনে মালোজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরাইবার উপায় জুটিল। ঐ গুপ্তধন চামারগুণ্ডা গ্রামের একজন বিশ্বাসী মহাজনের জিম্মায় রাখিয়া, তাহার কিছু খরচ করিয়া ঘোড়া, জীন, অস্ত্র ও তাম্বু কিনিয়া তিনি এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত করিলেন, এবং তাহাদের নেতা হইয়া ফল্‌টন গ্রামের নিম্বলকর-বংশীয় জমিদারের সহিত যোগ দিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন। অল্পদিনেই তাঁহার ক্ষমতা ও খ্যাতি এত বাড়িয়া গেল যে, অবসন্নপ্রায় নিজামশাহী-রাজা তাঁহাকে সরকারী সৈন্যমধ্যে ভর্তি করিয়া সেনাপতি উপাধি দিলেন। মালোজী আর সাধারণ ঘোড়সোয়ার বা চাষী নহেন, তিনি এখন ওমরা—যাদব রাও-এর সমপদস্থ। তখন যাদব রাও নিজ কন্যার সহিত শাহজীর বিবাহ দিলেন (সম্ভবতঃ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে)।

ধনবৃদ্ধির সঙ্গে মালোজী অনেক জনহিতকর কাজ ও দানধর্ম্ম করিলেন। মন্দির-নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন ছাড়া, সাতারা জেলার উত্তর অংশে মহাদেব পর্ব্বতের শিখরে শম্ভু-মন্দিরে চৈত্র মাসে সমবেত লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য তথায় পাথর কাটিয়া একটি বড় পুষ্করিণী খুঁড়িলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে বর দিলেন, "আমি তোমার বংশে অবতীর্ণ হইয়া দেবদ্বিজকে রক্ষা করিব, দক্ষিণ দেশের রাজ্য তোমায় দিব।"

ধনে মানে বাড়িয়া কালক্রমে মালোজী মারা গেলেন, তাহার পর তাঁহার জমিদারী ও সৈন্যদল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিঠোজী চালাইলেন। বিঠোজীর মৃত্যুর পর (অনুমান ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) শাহজী পৈত্রিক সম্পত্তির ভার পাইলেন, এবং ভোঁশলে বংশের সেনাদলের নেতা হইলেন। এই দল এতদিনে বাড়িয়া দু হাজার আড়াই হাজার লোক হইয়াছিল।

শাহজীর অভ্যুদয়

১৬২৬ সালে নিজামশাহী রাজ্যের সুদক্ষ মন্ত্রী, মালিক অম্বর আশী বৎসর বয়সে মারা গেলেন এবং তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ উজীর হইলেন। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর এবং বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহও প্রাণত্যাগ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে ভীষণ গোলমাল ও যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

শাহজীর কাজের উল্লেখ ইতিহাসে ১৬২৮ সালে প্রথম পাওয়া যায়। সেই বৎসর তিনি ফতে খাঁর আজ্ঞায় সসৈন্য মুঘল-রাজ্যের পূর্ব্ব-খান্দেশ প্রদেশ লুঠ করিতে যান, কিন্তু স্থানীয় মুঘল-সেনানীর হাতে বাধা পাইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর-রাজ্যে শেষ-ভাঙ্গন ধরিল। দরবারে দলাদলি যুদ্ধ ও খুন, শাসনে বিশৃঙ্খলা ও রাজ্যে অরাজকতা নিত্য ঘটিতে লাগিল।

[1]পরে লোকের মুখে ঘটনাটি এই আকার ধারণ করে—মালোজী বড় দেবদেবীভক্ত গৃহস্থ। একদিন মাঘ মাসের রাত্রে ক্ষেতে পাহারা দিতে দিতে তিনি দেখিলেন যে, মাটির তল হইতে শ্রীদেবী (অর্থাৎ শিবানী) আবির্ভূত হইলেন এবং নিজ জ্যোতির্ম্ময় অলঙ্কার-মণ্ডিত হাত তাঁহার মুখ ও পিঠে বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "বৎস! আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এই গর্ত্তটি খুঁড়িলে সাত কড়াই-ভরা মোহর পাইবে। উহা আমি তোমাকে দান করিলাম। তোমার বংশে ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজপদ চলিবে। তোমাদের সব বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

শাহজী এই সুযোগে নিজের জন্য রাজ্য জয় করিতে শুরু করিলেন। কখন-বা তিনি মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেন, কখন-বা বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের সহিত; আবার কখনও বা নিজাম শাহের চাকরিতে ফিরিয়া আসেন। মুঘলেরা শেষ নিজামশাহী রাজধানী দৌলতাবাদ জয় করিয়া সুলতানকে বন্দী করিল (১৬৩৩)।

তখন শাহজী ঐ বংশের একজন বালককে 'নিজাম শাহ' বলিয় মুকুট পরাইয়া, নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া তিন বৎসর ধরিয়া পুণা-দৌলতাবাদ অঞ্চলে রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৬৩৬ সালে মুঘলদের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, সব ছাড়িয়া দিয়া বিজাপুর সরকারের চাকরি লইতে বাধ্য হইলেন।

শিবাজীর জন্ম ও বাল্যকাল

জীজা বাঈ-এর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র হয়,—শম্ভুজী[2] (১৬২৩) এবং শিবাজী (১৬২৭)। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে জীজাবাঈ জুন্নর শহরের নিকট শিবনের গিরিদুর্গে বাস করিতেছিলেন; দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "শিবা-ভবানীর" নিকট তিনি ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, এইজন্য পুত্রের নাম রাখিলেন “শিব” (দাক্ষিণাত্যের উচ্চারণ “শিবা”)।

১৬৩০ হইতে ১৬৩৬ পর্য্যন্ত শাহজী নানা যুদ্ধবিগ্রহ, বিপদ ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কাটান। এজন্য তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হয়। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় শিবনের-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার পর ১৬৩৬ সালে মুঘলদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ মিটিল, এবং তিনি বিজাপুর-রাজসরকারে কার্য্য লইলেন বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রে আর রহিলেন না, মহীশূর প্রদেশে নূতন জাগীর স্থাপন করিতে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তুকা বাঈ মোহিতে তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ব্যঙ্কোজী (ওরফে একোজী)-কে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্র যেন ত্যাজ্য হইল; তাহাদের বাসের জন্য পুণা গ্রাম এবং ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য ঐ জেলার ক্ষুদ্র জাগীরটি দিয়া গেলেন। জীজা বাঈ এখন প্রৌঢ়া, তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর। তরুণবয়স্কা সুন্দরী সপত্নীর আগমনে তিনি স্বামী-সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইলেন। জন্মের পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিবাজী পিতাকে খুব কম সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর তাহার পর দুজনে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলেন।

শিবাজীর মাতৃভক্তি ও ধর্ম্মশিক্ষা

স্বামীর অবহেলার ফলে জীজা বাঈ-এর মন ধর্ম্মে একনিষ্ঠ হইল। আগেও তিনি ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, এখন একেবারে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন—যদিও উপযুক্ত সময়ে জমিদারীর আবশ্যক কাজকর্ম্ম দেখিতেন। মাতার এই ধর্ম্মভাব পুত্রের তরুণ হৃদয় অধিকার করিল। শিবাজী নির্জ্জনে বাড়িতে লাগিলেন; সঙ্গীহীন বালক, ভাই নাই, বোন নাই, পিতা নাই, এই নিঃসঙ্গ জীবনের ফলে মাতা ও পুত্র আরও ঘনিষ্ঠ হইলেন; শিবাজীর স্বাভাবিক মাতৃভক্তি শেষে দেবোপাসনার মত ঐকান্তিক হইয়া দাঁড়াইল।

[2]এই শম্ভুজী যৌবনে কনকগিরি দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া মারা যান। ইতিহাস তাঁহার সম্বন্ধে নীরব।

শিবাজী বাল্যকাল হইতে নিজের কাজ নিজে করিতে শিখিলেন—অন্য কাহারও নিকট আদেশ বা বুদ্ধি লইবার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইত না। এইরূপে জীবন-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দায়িত্ব জ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। বিখ্যাত পাঠান-রাজা শের শাহের বাল্যজীবনও ঠিক শিবাজীর মত; দুজনেই সামান্য জাগীরদারের পুত্র হইয়া জন্মান, বিমাতার প্রেমে মুগ্ধ পিতার অবহেলার মধ্যে বাড়িয়া উঠেন, বনজঙ্গল ঘুরিয়া, কৃষক ডাকাত প্রভৃতির সহিত মিশিয়া দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন, চরিত্রের দৃঢ়তা, শ্রমশীলতা ও স্বাবলম্বন নিজ হইতে শিক্ষা করেন, পৈত্রিক জাগীরের কাজ চালাইয়া নিজেকে ভবিষ্যৎ রাজ্যশাসন কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন। দুজনেরই চরিত্র ও প্রতিভা একরূপ, দুজনেই ঠিক একশ্রেণীর ঘটনার মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হন।

পুণার অবস্থা

আজ পুণা শহর বম্বে প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী, মারাঠাদের শিক্ষা সভ্যতা ও আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কিন্তু ১৬৩৭ সালে যখন বালক শিবাজী এখানে বাস করিতে আসিলেন, তখন পুণা একটি গণ্ডগ্রাম—অতি শোচনীয় দশায় উপস্থিত। ছয় বৎসর ধরিয়া যুদ্ধে দেশ ছারখার হইয়া গিয়াছিল, বার বার নানা আক্রমণকারী আসিয়া গ্রাম লুঠ করিয়া পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইত, তাহার পর অরাজকতার সুযোগে আশপাশের ডাকাত-সর্দ্দারেরা নিজ আধিপত্য স্থাপন করিত। এই অঞ্চলটি ভূতের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মানুষের মধ্যে যুদ্ধ, অশান্তি ও লোকক্ষয়ের ফলে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলে নেকড়ে-বাঘের বংশ খুব বাড়িয়া গিয়াছিল; তাহাদের উৎপাতে পুণা জেলার গ্রামগুলিতে ভেড়া বাছুর এবং ছেলেপিলে নিরাপদ ছিল না; ভয়ে চাষবাস প্রায় বন্ধ হইল।

দাদাজী কোণ্ডদেব, অভিভাবক

১৬৩৭ সালে, শাহজী বিজাপুরের চাকরি লইয়া মহীশূর প্রদেশে চলিয়া যাইবার সময় দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক বিচক্ষণ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে পুণা জাগীরের কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “আমার প্রথম স্ত্রী ও পুত্র শিবাজী শিবনের দুর্গে আছে। তাহাদের পুণায় আনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ কর।” তাহাই করা হইল।[3]

এই পুণা জাগীরের খাজনা কাগজে চল্লিশ হাজার হোণ (অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা) ছিল, কিন্তু আদায় হইত অনেক কম। দাদাজী কোণ্ডদেব জমিদারী কাজে সুপরিপক্ক। তিনি সহ্যাদ্রি শ্রেণীর পাহাড়ী লোকদিগকে পুরস্কার দিয়া সেখানকার নেকড়ের দল নির্ব্বংশ করিলেন; ঐ লোকদের হাত করিয়া প্রথমে জমির খাজনা খুব কম, পরে ধীরে ধীরে বর্দ্ধনশীল নিরিখে ধার্য্য করিয়া, তাহাদিগকে

[3]দুই বৎসর পরে (১৬৩৯) জীজা বাঈ ও শিবাজী দাদাজীর সহিত শাহজীর নিকট বাঙ্গালোরে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের পুণায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সমতল ভূমিতে আসিতে ও চাষ করিতে রাজি করাইলেন। এইরূপে দেশে লোকের বসতি ও কৃষিকার্য্য দ্রুত বাড়িতে লাগিল।

শান্তিরক্ষার জন্য তিনি কতকগুলি স্থানীয় সৈন্য, অর্থাৎ বর্ক-আন্দাজ, নিযুক্ত করিয়া জায়গায় জায়গায় থানা বসাইলেন। দাদাজীর দৃঢ়শাসন ও ন্যায় বিচারে দস্যু ও অত্যাচারীর নাম পর্য্যন্ত দেশ হইতে লোপ পাইল। তাঁহার নিয়মপালনের একটি গল্প আছে। তিনি "শাহজী বাগ" নাম দিয়া একটি ফলের বাগান করেন। তাঁহার কড়া আদেশ ছিল, কেহ গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত লইলে শাস্তি পাইবে। একদিন ভুলিয়া তিনি নিজেই একটি আম পাড়িলেন। নিয়মের কথা মনে পড়িলে নিজের উপর দণ্ড দিবার জন্য তিনি অপরাধী নিজ হাত কাটিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সকলে ধরিয়া তাঁহাকে থামাইল। ইহার পর হইতে তিনি অপরাধের চিহ্নস্বরূপ একটি লোহার শিকল গলায় পরিয়া থাকিতেন।

শিবাজী লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষতি হয় নাই। আকবর, হাইদর আলী, রণজিৎ সিংহ—ভারতের এই তিনজন কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ রাজাও নিরক্ষর ছিলেন। সে সময়টা মধ্যযুগ, অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত; তখনকার দিনে এই পুঁথিগত বিদ্যার অভাব তাঁহার মনকে অন্ধকার অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে নাই, অথবা তাঁহার কার্য্যদক্ষতা হ্রাস করে নাই। কারণ, শিবাজী রামায়ণ মহাভারতের গল্প এবং পুরাণ-পাঠ ও কীর্ত্তন শুনিয়া শুনিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনীর আস্বাদ পান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রণকৌশল ও শাসন-বিধান শেখেন। যেখানে কীর্ত্তন হইত সেখানে তিনি যাইতেন এবং তন্ময় হইয়া শুনিতেন; কোন হিন্দু-সন্ন্যাসী বা মুসলমান পীরের আগমন হইলে তিনি তাঁহার কাছে গিয়া ভক্তি দেখাইতেন এবং ধর্ম্মের উপদেশ লইতেন। কাজেই শিক্ষার প্রকৃত ফল তাঁহাতে সম্পূর্ণ ভাবে ফলিয়াছিল।

মাব্‌লে জাতি

পুণা জেলার পশ্চিম প্রান্তে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের গা বাহিয়া ৯০ মাইল লম্বা এবং ১২ হইতে ২৪ মাইল প্রশস্ত যে ভূমিখণ্ড আছে, তাহার নাম 'মালব'[4] অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের দেশ বা পশ্চিম। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত অসমান, অধিত্যকার পর অধিত্যকা, আর তাহাদের ধারগুলি খাড়া হইয়া নামিয়াছে; নীচে আঁকা-বাঁকা গভীর উপত্যকা। এই নীচের সমভূমি হইতে ছোট-বড় অনেক পাহাড় স্তরে স্তরে উঠিয়াছে, তাহাদের উঁচু গায়ে কাল কষ্টিপাথরের বড় বড় বোল্‌ডার্‌ ছড়ান। স্থানে স্থানে পর্ব্বত-গাত্র বনে আবৃত, গাছের তলায় ঘন গাছড়া ও লতাপাতা চলিবার পথ বন্ধ করিয়াছে।

এই মাব্‌ল প্রদেশের উত্তরাংশে কোলী নামক এক প্রাচীন অসভ্য দস্যুজাতির বাস, আর দক্ষিণাংশে মারাঠা কৃষক। মাব্‌লের মারাঠাদের শরীরে কিছু পাহাড়ী জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে; তাহাদের আকৃতি কাল সরু, কিন্তু মাংসপেশী-বহুল ও কর্ম্মঠ। এদেশের বাতাস শুষ্ক ও হালকা, এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থান হইতে কম গরম। মাব্‌লের জলবায়ু শরীরে বল বৃদ্ধি করে।

---

[4]মারাঠী ভাষায় 'মাবলনো' (infinitive) ক্রিয়াপদ, অর্থ 'অস্ত যাওয়া'। পর্ব্বতগাত্রের এই দেশকে উত্তরে (অর্থাৎ বগলানায়) 'ডাঙ্গ', মধ্যভাগে (অর্থাৎ নিজ মহারাষ্ট্রে) 'মাবল' এবং দক্ষিণ অর্থাৎ কর্ণাটকে 'মহাড়' বলা হয়।

শিবাজীর মাব্‌লে বন্ধুগণ

দাদাজী মাব্‌লদেশ নিজের অধীনে আনিলেন। অনেকে গ্রামের তহসিলদার (দেশপাণ্ডে)-কে হাত করিলেন। যাহারা অবাধ্য হইল তাহাদের যুদ্ধে বিনাশ করিলেন। এইরূপে সেই অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপিত হইল এবং মাব্‌ল গ্রামগুলি পুণা জেলার অধিকারীর পক্ষে অর্থ ও লোকবলের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই মাব্‌ল দেশ হইতে শিবাজীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য আসিল; এখানে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও অত্যন্ত অনুগত কর্ম্মচারিগণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে বালক শিবাজী পশ্চিমঘাটের বন-জঙ্গল ও পর্ব্বতে, নদীতীরে ও উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি ক্রমেই কষ্টসহিষ্ণু ও অক্লান্তশ্রমী হইয়া উঠিলেন এবং দেশ ও দেশবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে চিনিলেন। শিবাজীর উত্থানে মাব্‌ল-জমিদার ও বলিষ্ঠ কৃষকদের পক্ষে সমস্ত দাক্ষিণাত্য ব্যাপিয়া কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ক্ষমতা ও খ্যাতিলাভের মহাসুযোগ জটিল। শিবাজীর যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সহকারী হইয়াই এই কোণঠাসা গরীব গ্রাম্যলোকেরা সেনাপতি ও সম্ভ্রান্ত পুরুষের পদে উঠিতে পারিল। সুতরাং তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার রাজ্যাভিলাষের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা হইল। তিনি খোলাখুলিভাবে মিশিয়া তাহাদের ভাইবন্ধুর সামিল হইলেন। ফরাসী-সৈন্যদের চক্ষে নেপোলিয়ন যেমন একাধারে বন্ধু নেতা ও দেবতার সমান ছিলেন, মাব্‌লদের নিকট শিবাজীও তাহাই হইলেন।

শিবাজী স্বাধীন জীবন চান

দাদাজী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ যে রামায়ণ মহাভারত ও শাস্ত্র পাঠ করিতেন তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিবাজীর তরুণ হৃদয় গঠিত হইল। সন্ন্যাসিনীতুল্য মাতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ পাইয়া শিবাজীর মনে সাত্ত্বিক ভাব, দৃঢ়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতা জন্মিল। স্বাধীন জীবনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল; কোন মুসলমান-রাজার অধীনে সেনাপতি হইয়া অর্থ ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করাকে তিনি দাসত্ব বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিলেন। স্বাধীন রাজা হওয়া তাঁহার জীবন-প্রভাতের একমাত্র ইচ্ছা ছিল, সমগ্র হিন্দুজাতিকে উদ্ধার বা রক্ষা করার ইচ্ছা অনেক পরে তাঁহার মনে স্থান পায়।

শিবাজী বড় হইলে কোন পথে চলিবেন—এই প্রশ্ন লইয়া অভিভাবকের সঙ্গে তাঁহার মতের অমিল হইল। দাদাজী কোণ্ডদেব বিচক্ষণ জমিদারী দেওয়ান ও ধার্ম্মিক গৃহস্থ; তাঁহার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ আদর্শ বা দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি ছিল না। তিনি শিবাজীকে বার বার বলিতে লাগিলেন যে, পিতৃ-পিতামহের মত কোন মুসলমান-রাজার মন্‌সব্‌দার হইয়া সৈন্য লইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনের দ্বারা জাগীর অর্থ ও উপাধি লাভ করাই ভাল; বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ডাকাতদের সঙ্গে মিশিলে, ইচ্ছা করিয়া বিপদ ও গোলমালের মধ্যে গেলে, অথবা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করিলে, পরিণাম শোচনীয় হইবে। শিবাজী শুনিলেন না; শাহজীর নিকট দাদাজী নালিশ করিলেন, কিন্তু পিতার নিষেধে কোনই ফল হইল না। দুশ্চিন্তায় ও মনঃকষ্টে বৃদ্ধ দাদাজী প্রাণত্যাগ করিলেন (১৬৪৭) এবং বিশ বৎসর বয়সে শিবাজী নিজেই নিজের কর্ত্তা হইলেন।

যুবক শিবাজীর প্রথম স্বাধীন কাজ

ইতিমধ্যে শিবাজী যুদ্ধবিদ্যা এবং জমিদারী-চালান সম্পূর্ণরূপে শিখিয়াছিলেন, এবং ঐ প্রদেশের প্রজা ও সৈন্যগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। নিজের বুদ্ধিতে কাজ করিতে এবং লোককে অধীনে রাখিতে ও খাটাইতে তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল। তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগুলি বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ, শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ রাঞ্জেকর ছিলেন পেশোয়া বা দেওয়ান, বালকৃষ্ণ দীক্ষিত ছিলেন মজমুয়াদার (হিসাব-লেখক), সোণাজী পন্ত দবীর (বা পত্রলেখক) এবং রঘুনাথ বল্লাল কোর্‌ডে সবনীস্ অর্থাৎ সৈন্যদের বেতন-কর্ত্তা। ইঁহাদের শাহজী আগে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

১৬৪৬ সালে বিজাপুর রাজ্যে দুর্দ্দিন দেখা দিল। রাজা মুহম্মদ আদিল শাহ অনেককাল গৌরবে রাজ্যশাসন এবং দেশবিজয় করিবার পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবনসংশয় হইল। তিনি ইহার পর আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অর্দ্ধমৃত জড় অবস্থায়। সাধারণ লোকেরা বলিত যে, সাধু ফকীর শাহ হাসিম উলুবী মন্ত্রবলে নিজ জীবনের দশ বৎসর পরমায়ু রাজাকে দান করেন, সেই ধার-করা প্রাণ লইয়া রাজা এই দশ বৎসর কোনক্রমে বাঁচিয়া ছিলেন। এই কয় বৎসর রাজা অচল, পুতুলের মত; রাণী বড়ি সাহিবা শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, রাজ্যের কেন্দ্রে জীবনীশক্তি রহিল না।

ইহাই ত শিবাজীর পরম সুযোগ। এই বৎসর তিনি বাজী পাসলকর যেসাজী কঙ্ক এবং তানজী মালুসরেকে কতকগুলি মাব্‌লে পদাতিকের সহিত পাঠাইয়া বিজাপুর-রাজার পক্ষের কিলাদার (দুর্গস্বামী)-কে ভুলাইয়া তোরণা[5] দুর্গ দখল করিলেন। এখানে দুই লক্ষ হোণ রাজার খাজনা জমা হইয়াছিল, তাহা শিবাজীর হাতে পড়িল। তোরণার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বতের অপর এক চূড়ায় তিনি রাজগড় নামক একটি নূতন দুর্গ গড়িলেন, এবং তাহার নীচে ক্রমান্বয়ে তিনটি স্থানে জমি সমান করিয়া দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া ‘মাচী', অর্থাৎ রক্ষিত গ্রাম নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রথম রাজ্য বিস্তার

দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর (১৬৪৭) শিবাজী সর্ব্বপ্রথমে পিতার ঐ প্রদেশস্থ সমস্ত জাগীর হস্তগত করিয়া একটি সংলগ্ন একচ্ছত্র রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। পুণার ১৮ মাইল উত্তরে চাকন দুর্গের অধ্যক্ষ ফিরঙ্গজী নরসালা শিবাজীকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেন; বারামতী ও ইন্দাপুর নামক দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের দুইটি ছোট থানার কর্ম্মচারিগণও শিবাজীর অধীনে আসিল।

তাহার পর শিবাজী বিজাপুর-রাজ্য হইতে দেশ কাড়িয়া লইয়া নিজ অধিকার-সীমা বাড়াইতে লাগিলেন। পুণার ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোণ্ডানা দুর্গ বিজাপুর-রাজার ছিল; ইহার কিলাদার ঘুষ লইয়া দুর্গটি শিবাজীর হাতে ছাড়িয়া দিল।

[5] পুণা হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

শাহজী বিজাপুরে বন্দী

১৬৪৮ সালের মাঝামাঝি শিবাজী এতদূর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় এক নূতন বিপদ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিল। ২৫ জুলাই তাঁহার পিতা শাহজী বিজাপুর-সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর আজ্ঞায় জিঞ্জি দুর্গের বাহিরে কারাবদ্ধ হইলেন; তাঁহার সম্পত্তি ও সৈন্য রাজসরকারে জব্‌ত করা হইল। অনেক পরে রচিত ইতিহাসে এই ঘটনার কারণ মিথ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে যে, বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করিবার জন্য শাহজীকে কয়েদ করেন, এবং শিবাজী বশ না মানিলে শাহজীর কারাদ্বার ইট গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে জীবন্ত গোর দেওয়া হইবে, এরূপ শাসান। কিন্তু সমসাময়িক সরকারী ফারসী-ইতিহাস (জহুর বিন্ জহুরীকৃত মহম্মদ আদিল শাহের রাজত্ব-বিবরণ) হইতে জানা যায়, বিজাপুরী সৈন্যগণ যখন বহুদিন যুদ্ধ করিয়াও জিঞ্জি দুর্গ লইতে পারিল না, তাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, তখন শাহজী প্রধান সেনাপতির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সসৈন্য রণত্যাগ করিয়া নিজ জাগীরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সর্ব্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ নবাব মুস্তাফা খাঁ দেখিলেন, দুর্গ-অবরোধ ত একেবারে পণ্ড হইয়া যায়, অথচ শাহজীর পলায়নে বাধা দিলে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি আরম্ভ হইবে। তখন তিনি বুদ্ধি করিয়া বিনাযুদ্ধে শাহজীকে বন্দী করিলেন; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জব্‌ত করিলেন,—এক কণামাত্র গোলমালে লুঠ হইতে পারিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত মারাঠী গ্রন্থে প্রকাশ মুদ্‌হোল গ্রামের জাগীরদার বাজী রাও ঘোরপড়ে মুস্তাফা খাঁর ইঙ্গিতে নিমন্ত্রিত শাহজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে কয়েদ করেন। এই অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য কয়েক বৎসর পরে শাহজী শিবাজীকে আজ্ঞা দিয়া এই মুদ্‌হোলের ঘোরপড়ে বংশ প্রায় উচ্ছেদ করান। কিন্তু বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য ফারসী-ইতিহাস "বুসাতীন্-ই-সলাতীন্" হইতে আমরা জানিতে পারি যে গল্পটি সত্য নহে; শাহজীকে কয়েদ করিবার প্রণালী এইরূপ—"শাহজীর অবাধ্যতায় নবাব মুস্তাফা খাঁ তাঁহাকে গেরেফ্‌তার করা স্থির করিয়া, একদিন বাজীরাও ঘোরপড়ে ও যশোবন্ত রাও (আসদ্‌খানী)-কে নিজ নিজ সৈন্য সজ্জিত করিয়া অতি প্রত্যুষে শাহজীর শিবিরের দিকে পাঠাইলেন। শাহজী সারা রাত্রি নাচগান উপভোগ করিয়া ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই রাও-এর আগমন ও উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া হতভম্ব হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া শিবির হইতে একাকী পলাইতে লাগিলেন। বাজী রাও পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া নবাবের সম্মুখে হাজির করিলেন। ...আদিল শাহ সংবাদ পাইয়া বন্দীকে রাজধানীতে আনিবার জন্য আফ্‌জল খাঁকে, এবং তাঁহার সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার জন্য একজন খোজাকে জিঞ্জিতে পাঠাইলেন।" বিজাপুরে শাহজীকে আনিয়া কিছুদিন সেনাপতি আহমদ খাঁর বাড়ীতে কারাবদ্ধ রাখা হইল।

শাহজীর কারামুক্তি

শিবাজী মহা বিপদে পড়িলেন; পিতাকে বাঁচাইতে হইলে তাঁহাকে বিজাপুর সুলতানের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, আর এই বশ্যতার ফলে নূতন জয়-করা সমস্ত রাজ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে,—এত পরিশ্রম সব পণ্ড হইবে। সুতরাং দুইদিক রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজনীতির কূট চাল চালিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী মুঘল-সম্রাট বিজাপুরের শত্রু, বিজাপুররাজ তাঁহার আজ্ঞা

অমান্য করিতে সাহস করেন না। অতএব শিবাজী নিকটবর্ত্তী মুঘল-শাসনাধীন দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা যুবরাজ মুরাদ বখ্‌শিকে দরখাস্ত করিলেন যে, যদি বাদশাহ শাহজীর পূর্ব্ব অপরাধ (অর্থাৎ ১৬৩৩-৩৬ পর্য্যন্ত বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা) ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতে শাহজী ও তাঁহার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে সম্মত হন, তবে যুবরাজ অভয়-পত্র পাঠাইলে শিবাজী গিয়া মুঘল-সৈন্যদলে চাকরি করিবেন। কয়েক-মাস ধরিয়া চিঠি লেখালেখি এবং দূত-প্রেরণের পর ১৬৪৯ সালের ৩০ নভেম্বর মুরাদ শিবাজীকে জানাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই বাদশাহর নিকট যাইবেন এবং তথায় সাক্ষাতে শিবাজীর প্রার্থনা নিবেদন করিয়া সম্রাটের হুকুম লইবেন। এইরূপে এক বৎসর নষ্ট হইল। ইতিহাস হইতে বোঝা যায় যে, বাদশাহ শিবাজীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। বিজাপুর-রাজ্যের সেনাপতি আহমদ খাঁর অনুরোধে এবং বাঙ্গালোর, কোণ্ডানা ও কন্দর্পী এই তিনটি দুর্গ সমর্পণ করিবার ফল স্বরূপ আদিল শাহ শাহজীকে মুক্ত করিলেন (১৬৪৯ সালের শেষে)। তাহার পর কিছুকাল তিনি মহীশূরের বিদ্রোহী জমিদার (পলিগর)-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পুনরায় বিজাপুরের অধীনে আনেন এবং তথায় ও মাদ্রাজ অঞ্চলে বিজাপুরের ওমরা-স্বরূপ জাগীর পান।

শাহজী জামিনে খালাস পান; সুতরাং পিতা পাছে আবার বিপদে পড়েন, এই ভাবিয়া শিবাজী ১৬৫০ হইতে ১৬৫৫ পর্য্যন্ত শান্তভাবে কাটান, বিজাপুর সরকারকে কোনমতে ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

কিন্তু এই সময়ে তিনি পুরন্দর দুর্গ হস্তগত করেন। এটি “নীলকণ্ঠ নায়ক” উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ পরিবারের জাগীর ছিল। এসময়ে নীলোজী, শঙ্করাজী ও পিলাজী নামক তিন ভাই একান্নভুক্ত শরিকরূপে উহার মালিক ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলোজী বড় কৃপণ ও স্বার্থপর, তিনি অপর দুই ভাইকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আয় ও ক্ষমতা দিতেন না। পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার জন্য তাহারা মনের দুঃখে শিবাজীকে ধরিয়া পড়িল। শিবাজীর সহিত এই পরিবারের দুই-তিন পুরুষের হৃদ্যতা ছিল, এবং পুরন্দর পুণা হইতে মাত্র নয় ক্রোশ দূর। শিবাজী দেওয়ালীর সময় অতিথিরূপে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তৃতীয় দিবসে কনিষ্ঠ দুই ভাই রাত্রে জ্যেষ্ঠকে বাঁধিয়া শিবাজীর নিকট আনিল, আর শিবাজী তিনজনকেই বন্দী করিয়া দুর্গটি নিজে দখল করিলেন ও তথায় মাব্‌লে-সৈন্য বসাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য চাম্‌লী নামক গ্রাম দান করিলেন, এবং পিলাজীকে নিজ সৈন্যদলে চাকরি দিলেন।

শিবাজীর জাবলী-অধিকার

সাতারা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে বিখ্যাত মহাবালেশ্বর পর্ব্বতের পাঁচ-ছয় মাইল পশ্চিমে জাবলী গ্রাম। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে মোরে নামক এক মারাঠা-বংশ বিজাপুরের প্রথম সুলতানের নিকট হইতে জাবলী পরগণা জাগীর স্বরূপ পান এবং ক্রমে পাশের জমি দখল করিয়া প্রায় সমগ্র সাতারা জেলা এবং কোঁকনের কিছু কিছু অংশে নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম মোরে স্বহস্তে বাঘ বধ করায় বিজাপুররাজ তাঁহার বীরত্বের জন্য “চন্দ্ররাও” উপাধি দেন; এই উপাধি পুরুষানুক্রমে মোরেদের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোগ করিতেন। কনিষ্ঠ ভাইগণকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম দেওয়া হইত।

আট পুরুষ ধরিয়া যুদ্ধ ও লুঠ করিবার ফলে মোরেদের ভাণ্ডারে অনেক ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীনে বারো হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল, ইহারা মাব্‌লেদের জাতভাই, বলবান সাহসী পার্ব্বতীয় সেনা। ফলতঃ তখন জাবলী-রাজ্য বলিতে প্রায় সমস্ত সাতারা জেলা বুঝাইত। ইহার পশ্চিম

দিকে থাকা সহ্যাদ্রি পর্ব্বত, সমুদ্র হইতে ৪,০০০ ফিট উঁচু, তাহার পূর্ব্ব পাশের উপত্যকাগুলি ঘন বনজঙ্গল ও বিক্ষিপ্ত পাথরে আচ্ছন্ন; এই বৃক্ষ-প্রস্তরময় প্রদেশ পশ্চিমে ৬০ মাইল বিস্তৃত, তাহা ভেদ করিয়া ওধারে কোঁকনে যাইবার পথে আটটি গিরিসঙ্কট আছে; দুইটি এমন প্রশস্ত যে তাহা দিয়া গরুরগাড়ী চলিতে পারে।

এই জাবলী দেশ দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শিবাজীর রাজ্য-বিস্তারের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি রঘুনাথ বল্লাল কোর্‌ডেকে বলিলেন, "চন্দ্ররাওকে না মারিলে রাজ্যলাভ হইবে না। তুমি ভিন্ন একাজ আর কেহ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দূতরূপে তাঁহার নিকট পাঠাইতেছি।" রঘুনাথ সম্মত হইলেন এবং শিবাজীর পক্ষ হইতে সন্ধি-প্রস্তাব বহনের ভাণ করিয়া ১২৫ জন বাছা বাছা সৈন্যসহ জাবলী গেলেন।

ইহার তিন-চারি বৎসর আগে কৃষ্ণাজী মোরে, চন্দ্ররাও উপাধি লইয়া রাজা হইয়াছিলেন। রঘুনাথ প্রথম দিন সাধারণ ভদ্রতা ও আলাপের পর বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং চন্দ্ররাও-এর অসতর্ক অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজ প্রভুকে সৈন্য লইয়া জাবলীর কাছে উপস্থিত থাকিতে লিখিলেন, যেন খুনের পরে জাবলী আক্রমণ করিতে বিলম্ব না হয়। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ গোপন-গৃহে হইল; রঘুনাথ আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়া, হঠাৎ ছোরা খুলিয়া চন্দ্ররাও এবং তাঁহার ভাই সূর্য্য রাওকে হত্যা করিয়া ছুটিয়া ফটক দিয়া বাহির হইলেন; দ্বারপালগণ ভীত ও হতভম্ব হইয়া বাধা দিতে পারিল না; সৈন্যদের যাহারা তাড়া করিল তাহা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। রঘুনাথ বনে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া লুকাইলেন।

শিবাজী কাছেই ছিলেন। মোরেদের হত্যার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি জাবলী আক্রমণ করিলেন। নেতাহীন সৈন্যগণ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে দুর্গ ছাড়িয়া দিল (১৫ জানুয়ারী ১৬৫৬)। চন্দ্ররাও-এর দুই পুত্র ও পরিবারবর্গ বন্দী হইল। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় ও কার্য্যাধ্যক্ষ হনুমন্ত রাও মোরে ঐ বংশের অনুচরদের একত্র করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। শিবাজী দেখিলেন, "হনুমন্তকে হত্যা না করিলে জাবলীর কণ্টক দূর হইবে না।" তিনি শম্ভুজী কাবজী নামক এক মারাঠা-যোদ্ধাকে দৌত্যের ভাণ করিয়া হনুমন্তের নিকট পাঠাইলেন। কাবজী সাক্ষাতের সময় হনুমন্তকে খুন করিল। এইরূপে সমস্ত জাবলীপ্রদেশ শিবাজীর করতলগত হইল। তিনি এইবার দক্ষিণে কোলাপুর ও পশ্চিমে রত্নগিরি জেলা অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেন। তাঁহার আরও এই একটি লাভ হইল যে, মাব্‌লে সৈন্য জুটাইবার ক্ষেত্র দ্বিগুণ বিস্তৃত হইল, কারণ এখন সাতারার পশ্চিম প্রান্তে ৬০ মাইল ব্যাপী পর্ব্বত ও উপত্যকা তাঁহার অধিকারে আসিল। মোরেদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত এবং আট পুরুষের সঞ্চিত অগাধ ধনরত্ন তাঁহার হাতে পড়িল।

মোরে বংশের কয়েকজন লোক ধরা পড়েন নাই, শিবাজীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা ১৬৬৫ সালে জয়সিংহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

শিবাজীর নূতন দুর্গ

জাবলী গ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে শিবাজী প্রতাপগড় নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভবানী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কারণ, আদি ভবানী দেবীর মন্দির ছিল তুলজাপুরে, বিজাপুর-রাজ্যের

মধ্যে। এই প্রতাপগড়ের ভবানীই শিবাজীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, তথায় তিনি অনেকবার তীর্থযাত্রা করেন এবং বহুমূল্য ধনরত্ন দান করেন।

জাবলী-জয়ের পর শিবাজী রায়গড়ের বিশাল গিরিদুর্গ মোরের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন (এপ্রিল, ১৬৫৬); ইহা পরে তাঁহার রাজধানী হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি বৈমাত্রেয় মাতুল শম্ভুজী মোহিতের নিকট দশহরা পর্ব্বের প্রীতিউপহার চাহিবার ভাণ করিয়া গিয়া, তাঁহাকে হঠাৎ বন্দী করিলেন। শম্ভুজী শাহজীর আজ্ঞায় সুপে পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি শিবাজীর অধীনে কার্য্য করিতে অস্বীকার করায় শিবাজী তাঁহাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া সুপে পরগণা দখল করিলেন।

৪ঠা নবেম্বর ১৬৫৬, বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহর মৃত্যুতে যে বিপ্লবের আরম্ভ হইল, তাহা শিবাজীর পক্ষে মহা লাভের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

তৃতীয় অধ্যায় : মুঘল ও বিজাপুরের সহিত প্রথম যুদ্ধ

প্রথম মুঘল-রাজ্য আক্রমণ

১৬৫৬ সালের ৪ঠা নবেম্বর বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহর মৃত্যু হইল, এবং অপরিণত-বুদ্ধি রাজকার্য্যে অনভ্যস্ত যুবক (দ্বিতীয়) আলী আদিল শাহ সিংহাসনে বসিলেন। তখন মুঘল-দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন আওরংজীব। তিনি বিজাপুর অধিকার করিবার এই সুযোগ ছাড়িলেন না। আলী মৃত সুলতানের পুত্র নহেন—এই অপবাদ রটাইয়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং অন্যান্য বিজাপুরী জায়গীরদারদের মত শিবাজীকেও লোভ দেখাইয়া মুঘল পক্ষে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। দুইজনের মধ্যে দেনা-পাওনা লইয়া চিঠিপত্র বিনিময় হইতে লাগিল। পরে শিবাজীর দূত সোনাজী পণ্ডিত বিদর-দুর্গের সামনে আওরংজীবের শিবিরে পৌঁছিলেন (মার্চ্চ ১৬৫৭), এবং তথায় দেনাপাওনার আলোচনায় এক মাস কাল কাটাইলেন। অবশেষে আওরংজীব শিবাজীর সব প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে মুঘল-সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য এক পত্র লিখিলেন (২৩ এপ্রিল)।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিবাজী মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে, তিনি নিজের হইয়া পড়িবেন, মুঘলের পক্ষ হইয়া নহে। মুঘল-রাজ্য লুটিলেই তাঁহার লাভের সম্ভাবনা বেশী। এই ফন্দী গোপন রাখিয়া, পরামর্শ করিবার ভাণ করিয়া সোনাজীকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নিজের নিকট ফিরাইয়া আনিলেন। আর তাহার কিছুদিন পরেই মুঘল-অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের অংশ) হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। সেখানে দিল্লীশ্বরের সৈন্যও কম ছিল, এবং সেনাপতিগণও অলস, অসতর্ক। মিনাজী ভোঁশলে ও কাশী-নামক দুইজন মারাঠাসর্দ্দার ভীমা নদী পার হইয়া মুঘলদের চামারগুণ্ডা ও রায়সীন্ পরগণায় গ্রাম লুটিয়া, আহমদনগর শহরের আশপাশে পর্য্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। আর, শিবাজী স্বয়ং ৩০এ এপ্রিল অন্ধকার রাত্রে দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া উত্তর-পুণা জেলায় জুন্নর নগরের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রক্ষীদের বধ করিলেন। এখান হইতে তিন লক্ষ হোণ (বারো লক্ষ টাকা), দুইশত ঘোড়া এবং অনেক মূল্যবান গহনা ও কাপড় লুটিয়া লইয়া শিবাজী সরিয়া পড়িলেন।

আওরংজীবের সহিত সন্ধি

এই সংবাদ পাইয়া আওরংজীব ঐ অঞ্চলে অনেক সৈন্য পাঠাইলেন এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদের খুব শাসাইয়া দিলেন। আহমদনগরের দুর্গাধ্যক্ষ মুল্‌তফৎ খাঁ বাহিরে আসিয়া কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর চামারগুণ্ডা থানা হইতে মিনাজীকে তাড়াইয়া দিলেন। এদিকে, রাও কর্ণ ও শায়েস্তা খাঁ আসিয়া পড়ায় শিবাজী জুন্নর পরগণায় আর বেশীদিন থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি সরিয়া পড়িয়া আহমনগর জেলায় ঢুকিলেন (মে মাসের শেষে)। কিন্তু এখানে আওরংজীব কর্ত্তৃক প্রেরিত সৈন্যদল লইয়া নসিরি খাঁ দ্রুত কুচ করিয়া আসিয়া শিবাজীকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া প্রায় ঘিরিয়া ফেলিলেন (৪ঠা জুন)। মারাঠারা অনেকে মারা গেল, বাকী সকলে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

তখন মুঘল-সেনানীরা নিজ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় স্থানে স্থানে সসৈন্য বসিয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন; আর মাঝে মাঝে দ্রুত মারাঠা-রাজ্যে ঢুকিয়া লুঠ করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, প্রজা ও গরুবাছুর ধরিয়া আনিয়া আবার নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। আওরংজীবের সুবন্দোবস্ত ও দৃঢ়শাসনে শিবাজী আর কোনই অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। বর্ষা আরম্ভ হইল, দুই পক্ষই জুন জুলাই আগষ্ট মাস আপন আপন সীমানার মধ্যে বসিয়া কাটাইলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বিজাপুর-রাজ আওরংজীবের সহিত সন্ধি করিলেন। তখন শিবাজী আর কাহার বলে লড়িবেন? তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া নসিরি খাঁর নিকট দূত পাঠাইলেন। খাঁ শিবাজীর প্রার্থনা যুবরাজকে জানাইলেন, কিন্তু কোনো সদুত্তর আসিল না। তাহার পর শিবাজী রঘুনাথ বল্লাল কোর্‌ডেকে সোজা আওরংজীবের নিকট পাঠাইলেন। যুবরাজ অবশেষে (জানুয়ারি ১৬৫৮) শিবাজীর বিদ্রোহ ক্ষমা করিয়া এবং মারাঠা প্রদেশে তাঁহার অধিকার স্বীকার করিয়া এক পত্র দিলেন; আর এদিকে শিবাজীও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি মুঘল-সীমানা রক্ষা করিবেন, নিজের পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য আওরংজীবের অধীনে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইবেন, এবং সোনাজী পণ্ডিতকে নিজ দূত করিয়া যুবরাজের দরবারে রাখিবেন।

কিন্তু আওরংজীব সত্যসত্যই শিবাজীকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য উত্তর-ভারতে যাইতেছেন। দাক্ষিণাত্যে নিজ সৈন্যদিগকে শিবাজীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেলেন। মির জুমলাকে লিখিলেন (ডিসেম্বর ১৬৫৭)—"নসিরি খাঁ চলিয়া আসায় ঐ প্রদেশটা খালি হইয়াছে। সাবধান, সেই কুত্তার বাচ্চা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।"

আদিল শাহকে লিখিলেন—"এই দেশ রক্ষা করিও। শিবাজী এ দেশের কতকগুলি দুর্গ চুরি করিয়া দখল করিয়াছে। তাহাকে সেগুলি হইতে দূর করিয়া দাও। আর যদি শিবাজীকে চাকর রাখিতে চাও, তবে তাহাকে কর্ণাটকে জাগীর দিও,—যেন সে বাদশাহী রাজ্য হইতে দূরে থাকে এবং উপদ্রব বাধাইতে না পারে।"

শিবাজীর উত্তর-কোঁকন জয়

কিন্তু ১৬৫৮ ও ১৬৫৯ এই দুই বৎসর ধরিয়া মুঘল-রাজকুমারগণ সিংহাসন লইয়া যুদ্ধে ব্যস্ত

থাকায়, শিবাজীর ঐদিক হইতে কোনই ভয়ের কারণ রহিল না। আর গত যুদ্ধে মুঘলদের কাছে পরাজয় হইল কাহার দোষে,—এই লইয়া বিজাপুরী মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। প্রধান মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ রাজধানীতে খুন হইলেন। এই গণ্ডগোলের সুযোগে শিবাজী স্বচ্ছন্দে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। পশ্চিমঘাট (অর্থাৎ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতমালা) পার হইয়া তিনি উত্তর-কোঁকন, অর্থাৎ বর্ত্তমান থানা জেলায় ঢুকিয়া বিজাপুরের হাত হইতে কল্যাণ এবং ভিবণ্ডী নগর দুটি কাড়িয়া লইলেন; তথায় তাঁহার অনেক ধনরত্ন লাভ হইল (২৪ অক্টোবর, ১৬৫৭)।

বিজাপুরের অধীনে মুল্লা আহমদ নামক একজন আরব ওম্‌রা এই কল্যাণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শিবাজীর সেনাপতি আবাজী সোনদেব ঐ দেশ অধিকার করিবার সময় মুল্লা আহমদের সুন্দরী তরুণী পুত্রবধূকে বন্দী করিলেন এবং শিবাজীর নিকট ভোগের উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু শিবাজী বন্দিনীর দিকে একবারমাত্র চাহিয়া বলিলেন, “আহা! আমার মা যদি এর মত হইতেন, তবে কি সুখের বিষয় হইত। আমার চেহারাও খুব সুন্দর হইত।” এইরূপে মেয়েটিকে মা বলিয়া ডাকিয়া আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কারসমেত বিজাপুরে তাহার শ্বশুরের নিকট সসম্মানে পাঠাইয়া দিলেন। সেই যুগে ইহা এক নূতন ঘটনা,—শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল।

ইহার পর শিবাজী কল্যাণ ও ভিবণ্ডীর উত্তরে মাহুলী-দুর্গ দখল করিলেন (৮ জানুয়ারি, ১৬৫৮)। এইরূপে উত্তর-কোঁকন দখল করিয়া ক্রমে দক্ষিণ দিকে কোলাবা জেলার কিয়দংশ অধিকারে আনিলেন। এবং তথায় অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। কল্যাণের উত্তরে পোর্তুগীজদের দামন প্রদেশের কয়েকটি গ্রাম লুঠ করিয়া শিবাজী আসিরি দুর্গে স্থায়িভাবে আড্ডা গাড়িলেন। আর, কল্যাণের নীচে সমুদ্রের খাড়ীতে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া মারাঠী নৌসেনার সূত্রপাত করিলেন।

শিবাজীর দমনে আফজল খাঁর অভিযান

১৬৫৮ সালের প্রথমভাগে আওরংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে চলিয়া গেলেন; তখন বিজাপুর-রাজ্য শান্তি ও নূতন বল পাইল। মন্ত্রী খাওয়াস্ খাঁ বেশ বিচক্ষণ লোক, আর রাজমাতা বড়ী সাহিবা অত্যন্ত তেজ ও দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। চারিদিকে অবাধ্য সামন্তদিগকে দমন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। শাহজীকে হুকুম করা হইল যে, তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রকে বশে আনুন। তিনি উত্তর দিলেন—“শিবা আমার ত্যাজ্য পুত্র। আপনারা তাহাকে সাজা দিতে পারেন, আমার জন্য সঙ্কোচ করিবেন না।”

তখন শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান সাব্যস্ত হইল। কিন্তু ভয়ে কোনো ওম্‌রাহ এই সমর-অভিযানের নেতা হইতে সম্মত হলেন না। সুলতান তখন দরবারের মধ্যে একটি পানের বিড়া রাখিয়া বলিলেন, “যিনি এই যুদ্ধের নেতা হইতে প্রস্তুত, কেবল তিনিই এই বিড়া তুলিয়া লইবেন এবং তাঁহাকে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হইবে।”

আবদুল্লা ভটারি (পাচক-বংশীয়), উপাধি আফজল খাঁ, বিজাপুর-রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর ওম্‌রা; মহীশূর-জয়ে, এবং মুঘলদের সহিত গত যুদ্ধে তিনি অনেকবার বীরত্ব ও প্রভুভক্তি দেখাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনিই পানের বিড়াটি খপ্ করিয়া উঠাইয়া লইলেন, এবং সগর্ব্বে বলিলেন যে, ঘোড়ার উপর বসিয়া থাকিয়াই শিবাজীকে পরাস্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিবেন।

কিন্তু গত যুদ্ধের ফলে রাজসরকারের অর্থ ও লোকবল বড়ই কমিয়া গিয়াছে। কাজেই আফজলের সঙ্গে দশ হাজার অশ্বারোহীর বেশী সৈন্য পাঠান সম্ভব হইল না। এদিকে শিবাজীর অশ্বারোহী-সৈন্যই ত দশ হাজারের বেশী, তাহার উপর লোকে বলিত, জাবলীজয়ের ফলে তাঁহার অধীনে ষাট হাজার মাব্‌লে পদাতিক জুটিয়াছে। এ ছাড়া একদল সাহসী, রণদক্ষ পাঠান বিজাপুরের চাকরি হারাইয়া তাঁহার বেতনভোগী হইয়াছিল। সুতরাং বিজাপুরের রাণী-মা আফজলকে বলিয়া দিলেন,—"বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া শিবাজীকে ভুলাইয়া বন্দী করিতে হইবে।" (তৎসাময়িক ইংরাজ-বণিকের চিঠিতে একথা স্পষ্ট লেখা আছে)।

আফজল খাঁর কার্য্যকলাপ

আফজল খাঁ বিজাপুর হইতে প্রথমে সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ তুলজাপুরে পৌঁছিয়া সেখানকার ভবানী-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া জাঁতায় পিষিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন।[6] তাহার পর পশ্চিম দিকে ফিরিয়া তিনি সাতারা শহরের ২০ মাইল উত্তরে বাই নামক নগরে পৌঁছিলেন (এপ্রিল ১৬৫৯)। এই নগরটি তাঁহার জাগীরের সদর ছিল। এখানে অনেক মাস থাকিয়া, কিরূপে শিবাজীকে পাহাড় হইতে খোলা জায়গায় আনা যায় অথবা স্থানীয় মারাঠা-জমিদারদের সাহায্যে বন্দী করা যায়, তাহার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। বিজাপুর-সরকার অধীনস্থ সমস্ত মাব্‌লে দেশমুখদিগকে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, যেন তাঁহারা সৈন্য দিয়া আফজলের সহায়তা করেন। ইহার কিছু ফলও হইয়াছিল। রোহিড়্‌খোরের দেশমুখী লইয়া খণ্ডোজী খোপ্‌ড়ে ও কান্‌হোজী জেধের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। কান্‌হোজী শিবাজীর পক্ষে ছিল। খণ্ডোজী আসিয়া আফজল খাঁর সহিত যোগ দিল এবং লিখিয়া অঙ্গীকার করিল যে, ঐ গ্রামের দেশমুখী তাহাকে দিলে সে শিবাজীকে ধরিয়া আনিয়া দিবে। খোপ্‌ড়েকে নিজ অনুচরসহ আফজলের সেনার অগ্রভাগের নেতা করা হইল।

বর্ষার শেষে অক্টোবর মাসে সৈন্যচালনা করিবার উপযুক্ত সময় আবার আসিবে। ইতিমধ্যে শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে পৌঁছিয়াছেন। এই দুর্গ বাই হইতে মাত্র ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আফজল খাঁ নিজ দেওয়ান কৃষ্ণাজী ভাস্করকে দিয়া শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"তোমার পিতা আমার বহুকালের বন্ধু, সুতরাং তুমি আমার নিকট অপরিচিত পর নহ। আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা কর, আমি বিজাপুরের সুলতানকে বলিয়া রাজী করাইব যাহাতে তোমার দুর্গগুলি ও কোঁকনপ্রদেশ তোমারই অধিকারে থাকে। আমি দরবার হইতে তোমাকে আরও মান এবং সৈন্যের সরঞ্জাম দেওয়াইব। যদি তুমি স্বয়ং দরবারে হাজির থাকিতে চাও, ভালই, উচ্চ সম্মান পাইবে। আর যদি তথায় উপস্থিত না হইয়া নিজ জাগীরে বাস করিতে চাও, তাহারও অনুমতি দিবার ব্যবস্থা করিব।"

আফজলের আক্রমণে শিবাজীর ভয় ও চিন্তা

ইতিমধ্যে আফজল খাঁর আগমন-সংবাদে শিবাজীর অনুচরগণের মধ্যে মহা ভয় ও ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা এ পর্য্যন্ত ছোটখাট লড়াই ও সামান্য পদের লোকজনের ধনসম্পত্তি

---

[6] মারাঠী গাথায় আছে, তিনি তুজাপুরের পর মানিকেশ্বর, পংঢারপুর, এবং মহাদেব পর্ব্বতেও দেবদ্বিজের প্রতি অত্যাচার অবমাননা করেন। শ্রীযুক্ত বিনায়ক লক্ষণ বাবে বলেন, এ কথা সত্য নহে।

লুটপাট করিয়াছে। এইবার একটি শিক্ষিত, সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী একজন বিখ্যাত বীর সেনাপতির অধীনে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে আসিয়াছে, বিজাপুর হইতে বাই পর্য্যন্ত অপ্রতিহত তেজে অগ্রসর হইয়াছে, মারাঠারা তাহাদের বাধা দিতে মোটেই সাহস পায় নাই। আফজল খাঁর অদম্য শক্তি ও নিষ্ঠুরতার গল্প দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেরা-দুর্গের জমিদার কস্তুরী রঙ্গ, বিজাপুরী সৈন্যের শিবিরে আফজল খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিলে, আফজল তাঁহাকে ধরিয়া খুন করেন। সুতরাং শিবাজী প্রথম যেদিন নিজ প্রধানদের ডাকিয়া তাহাদের মত জানিতে চাহিলেন, সকলেই ভয়ে তাঁহাকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিল, বলিল—যুদ্ধ করিলে বৃথা প্রাণনাশ হইবে, জয়লাভ অসম্ভব।

শিবাজী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। যদি তিনি এখন আদিল শাহর বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে;—তাঁহাকে হয় বিজাপুরের বন্দীশালায়, না হয় পুণায় সামান্য আজ্ঞাবাহী জাগীরদার হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে। আর যদি এখন বিজাপুর-রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন, তবে সুলতান আমরণ তাঁহার শত্রু হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহাকে অবশিষ্ট জীবন একেবারে অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় মুঘল ও অন্যান্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া কাটাইতে হইবে। সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে তাঁহার চিন্তা জর্জ্জরিত দেহে তন্দ্রা আসিল। প্রবাদ আছে, স্বপ্নে ভবানী দেবী তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "বৎস! ভয় নাই, আমি তোমায় রক্ষা করিব। আফজলকে আক্রমণ কর,—তোমারই জয় হইবে।"

আর সংশয় রহিল না। প্রাতঃকালে আবার মন্ত্রণা-সভা বসিল। শিবাজীর বীর-বাণী এবং দেবীর আশীর্ব্বাদের কথা শুনিয়া প্রধানগণ সকলেই উৎসাহে মাতিয়া যুদ্ধে মত দিল। মাতা জীজা বাঈও শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহারই জয় হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

যুদ্ধে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে কিরূপে রাজ্য চালাইতে হইবে, সে বিষয়ে শিবাজী তখন নিজ কর্ম্মচারীদিগকে বিস্তারিত উপদেশ দিলেন। অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সহিত আফজলকে আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত স্থির করা হইল। পেশোয়া ও সেনাপতি নেতাজী পালকরের অধীনে দুইটি বড় সৈন্যদল আনাইয়া তাহাদের প্রতাপগড়ের কাছে বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল।

আফজলের সহিত সন্ধি ও সাক্ষাতের আলোচনা

এমন সময় আফজলের দূত কৃষ্ণাজী ভাস্কর আসিয়া শিবাজীকে খাঁর সহিত দেখা করিতে আহ্বান করিলেন। শিবাজী এই ব্রাহ্মণকে খুব খাতির-যত্ন করিলেন; রাত্রে তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে ঢুকিয়া জানাইলেন, “আপনি হিন্দু ও পুরোহিত-জাতি। আমিও হিন্দু। সত্য করিয়া বলুন, আফজল খাঁর অভিসন্ধি কি?” পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণাজী উত্তর দিলেন যে, খাঁর অভিপ্রায় সাধু নহে।

পরদিন শিবাজী নিজ পক্ষের দূত পন্তাজী গোপীনাথকে কৃষ্ণাজী ভাস্করের সহিত আফজলের শিবিরে পাঠাইলেন। খাঁ পন্তাজীর নিকট শপথ করিলেন যে, দেখা করিবার সময় তিনি শিবাজীর কোনই অনিষ্ট করিবেন না। আর, শিবাজীর তরফ হইতে পন্তাজী অঙ্গীকার করিলেন যে, আফজলের প্রতি সে সময় কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে না। কিন্তু শিবাজীর দূত প্রচুর ঘুষ দিয়া সেখানকার বিজাপুরী-সর্দ্দারদের নিকট হইতে সন্ধান লইলেন, “খাঁ এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন

যে, সাক্ষাতের সময় তিনি শিবাজীকে বন্দী করিবেন, কারণ শিবাজীর মত ধূর্ত্তকে যুদ্ধে বশ করা অসম্ভব।" এই-সব কথা শুনিয়া শিবাজী যাহাতে আফজলকে বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তাহার পর শিবাজী জানাইলেন যে,খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সন্ধি স্থির করিতে সম্মত, কিন্তু বাই নগরে যাইতে ভয় পাইতেছেন; প্রথমে খাঁ তাঁহার বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখা করিয়া তাঁহাকে অভয় দিন, তাহার পর তিনি খাঁর শিবিরে যাইবেন।

সাক্ষাতের স্থানে আফজল ও শিবাজীর আগমন

আফজল রাজি হইলেন। উভয়ের সাক্ষাতের জন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিছু নীচে একটি পাহাড়ের মাথার উপর তাঁবু খাটান হইল, এবং বন কাটিয়া সেখানে যাইবার পথ প্রস্তুত করা হইল। আফজল খাঁ সসৈন্য বাই হইতে কুচ করিয়া মহাবালেশ্বর অধিত্যকার ভিতর দিয়া "পার" নামক গ্রামে আসিয়া ছাউনি করিলেন। গ্রামটি প্রতাপগড়ের এক মাইল দক্ষিণে, নীচের সমতলভূমিতে। তাঁহার সৈন্যগণ কয়না নদীর ধারে গভীর উপত্যকায় চারিদিকে আশ্রয় লইল।

সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিনে (১০ই নবেম্বর, ১৬৫৯) আফজল খাঁ প্রথমে পার গ্রামের শিবির হইতে এক হাজার বন্দুকধারী রক্ষী লইয়া, পালকীতে চড়িয়া প্রতাপগড়ের পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পন্তাজী গোপীনাথ বলিলেন যে এত সৈন্য দেখিয়া শিবাজী ভয় পাইবেন এবং সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন না, সুতরাং খাঁ আর-সকলকে বিদায় দিয়া মাত্র দুইজন রক্ষী লইয়া উপরে উঠুন। তাহাই করা হইল। আফজলের সঙ্গে চলিল—দুইজন সৈনিক, বিখ্যাত তলোয়ার-বাজ বীর সৈয়দ বান্দা, এবং দুই পক্ষের দুইজন ব্রাহ্মণ দূত, অর্থাৎ পন্তাজী ও কৃষ্ণাজী।

যে তাঁবুতে উভয়ের মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তথায় পৌঁছিয়া সেখানকার মহামূল্য সাজসজ্জা ও বিছানাপত্র দেখিয়া আফজল রাগিয়া বলিলেন, "কি! সামান্য জাগীরদারের ছেলের এত আড়ম্বর। কিন্তু পন্তাজী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এসব দ্রব্য সন্ধির উপহারস্বরূপ বিজাপুর-রাজকে দিবার জন্য আনা হইয়াছে।

তখন শিবাজীকে ডাকিবার জন্য প্রতাপগড়ে লোক পাঠান হইল। তিনি জামার নীচে লুকাইয়া লোহার জালের বর্ম্ম এবং মাথার পাগড়ীর নীচে ছোট কড়াইএর মত ইস্পাতের টুপী পরিলেন। বাহির হইতে দেখিলে বুঝিবার যো নাই যে, তাঁহার শরীরে কোন অস্ত্র লুকান আছে; কিন্তু তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলে কড়া দিয়া লাগান 'বাঘনখ' নামক তীক্ষ্ণ বাঁকা ইস্পাতের নখরগুলি মুঠির মধ্যে লুকান ছিল, আর ডান হাতের আস্তিনের নীচে 'বিছুয়া' নামক সরু ছোরা ঢাকা ছিল। তাঁহার সঙ্গে দুইজন শরীর-রক্ষক—জীব মহালা নামক নাপিত (তলোয়ার-খেলায় দক্ষ) এবং শম্ভুজী কাব্‌জী; উভয়েই অসমসাহসী, ক্ষিপ্রহস্ত ও তেজীয়ান পুরুষ। ইঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে দুইখানা তরবারি ছিল। প্রতাপগড় দুর্গ হইতে নামিবার সময় শিবাজী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন। শুক্লবসনা দেবী-প্রতিমা জীজা বাঈ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার জয় হউক",এবং শিবাজীর সঙ্গিগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, "আমার পুত্রকে রক্ষা করিও।" তাহারা উৎসাহে প্রতিজ্ঞা করিল—"তাহাই করিব।"

আফজল খাঁর সহিত কাটাকাটি

প্রতাপগড় দুর্গ শিখর হইতে নামিয়া শিবাজী তাঁহার তাঁবুর দিকে কিছু দূর ধীরে ধীরে যাইবার পর, হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, সৈয়দ বান্দাকে সাক্ষাতের স্থান হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। তাহাই করা হইল। অবশেষে শিবাজী মিলনের শামিয়ানাতে প্রবেশ করিলেন। এই বস্ত্রগৃহে উভয় পক্ষেই চারিজন করিয়া লোক উপস্থিত ছিল—স্বয়ং নেতা, দুইজন শরীর-রক্ষক, এবং একজন ব্রাহ্মণ দূত। শিবাজী দেখিতে নিরস্ত্র, কিন্তু আফজল খাঁর কোমরে তলোয়ার ঝুলিতেছে।

সঙ্গীরা সকলে নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। শামিয়ানার মধ্যস্থলে যে বেদীর মত অল্প উঁচু স্থানে আফজল খাঁ বসিয়াছিলেন, শিবাজী তাহার উপর চড়িলেন। খাঁ গদী হইতে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন। শিবাজী বেঁটে ও সরু, তিনি বিশালকায় আফজলের কাঁধ পর্য্যন্ত উঁচু। সুতরাং খাঁর বাহু দুটি শিবাজীর গলা ঘিরিল। তারপর হঠাৎ আফজল খাঁ শিবাজীর গলা নিজ বাম বাহু দিয়া লৌহবেষ্টনে চাপিয়া ধরিলেন, এবং ডান হাত দিয়া কোমর হইতে লম্বা সোজা ছোরা (যম্‌ধর) খুলিয়া শিবাজীর বাম পাঁজরে ঘা মারিলেন। কিন্তু অদৃশ্য বর্ম্মে বাধিয়া ছোরা দেহে প্রবেশ করিতে পারিল না। গলার চাপে শিবাজীর দমবন্ধ হইবার মত হইল। কিন্তু এক মুহূর্তে বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি বাম বাহু সজোরে ঘুরাইয়া আফজল খাঁর পেটে বাঘনখ বসাইয়া দিয়া তাঁহার পাকস্থলীর পর্দ্দা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, খাঁর ভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িল। আর, ডান হাতে 'বিছুয়া' লইয়া খাঁর বাম পাঁজরে মারিলেন। যন্ত্রণায় আফজল খাঁর বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল; এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে মুক্ত করিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজ সঙ্গীদের দিকে ছুটিলেন। এসব ঘটনা এক নিমেষে শেষ হইল।

ঘা খাইয়াই আফজল খাঁ চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"মারিল, মারিল, আমাকে প্রতারণা করিয়া মারিল!" দুই দিক হইতে অনুচরগণ নিজ নিজ প্রভুর দিকে ছুটিল। সৈয়দ বান্দা তাহার লম্বা সোজা তলোয়ার (পাট্টা) দিয়া এক কোপে শিবাজীর মাথার পাগড়ী কাটিয়া ফেলিল। তলোয়ারের ঘায়ে শিবাজীর পাগড়ীর নীচের লোহার টুপিটা পর্য্যন্ত টোল খাইয়া গেল, কিন্তু মস্তক রক্ষা পাইল। তিনি জীব মহালার হাত হইতে একখানি তলোয়ার লইয়া সৈয়দ বান্দাকে ঠেকাইতে লাগিলেন। জীব মহালা পাশ কাটাইয়া আসিয়া প্রথমে সৈয়দের ডান হাত ও পরে মাথা কাটিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে বাহকেরা আহত আফজলকে পালকীতে শোয়াইয়া তাহার শিবিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শম্ভুজী কাব্‌জী আসিয়া তাহাদের পায়ে কোপ মারায় তাহারা পালকী ফেলিয়া ছুট দিল। তখন শম্ভুজী আফজল খাঁর মাথা কাটিয়া বিজয়-গর্ব্বে তাহা শিবাজীর কাছে হাজির করিল।

আফজলের সৈন্য পরাজিত ও লুণ্ঠিত হইল

আফজলের মৃত্যুর পর অমনি শিবাজী তাঁহার রক্ষী দুইটির সহিত দৌড়াইয়া পাহাড় বাহিয়া প্রতাপগড় দুর্গে উঠিলেন এবং সেখান হইতে তোপধ্বনি করিলেন। এই সঙ্কেত আগে হইতেই স্থির করা ছিল। তোপের শব্দ শুনিবামাত্র পার গ্রামের নিকট ঝোপ ও পর্ব্বতের মধ্যে যেখানে শিবাজীর দুই দল সেনা লুকাইয়াছিল, সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া চারিদিক দিয়া বিজাপুরী সৈন্যদের আক্রমণ করিল। আফজলের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে তাঁহার শিবিরের কর্ম্মচারী সিপাহী

ও লোকজন একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের নেতা নাই, পথঘাট অপরিচিত, অথচ অগণিত শত্রু চারিদিক ঘিরিয়া আছে। পলাইবার পথ বন্ধ; সুতরাং, তাহারা হতাশ হইয়া যুদ্ধ করিল। কিন্তু মারাঠারা আজ বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত, দুইজন নামজাদা সেনাপতি তাহাদের চালনা করিতেছেন, যুদ্ধের স্থান তাহাদের সুপরিচিত। তাহারা অদম্য বেগে শত্রু বধ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিন ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হইল। তিন হাজার বিজাপুরী সৈন্য মারা গেল। মাব্‌লেরা সামনে যাহা পাইল তাহারই উপর তরবারি চালাইতে লাগিল; পলাতক হাতীর লেজ কাটিয়া ফেলিল, দাঁত ভাঙ্গিয়া দিল, পা ঘাল্ করিল; উটকে কাটিয়া ভূমিশায়ী করিল। যে-সব বিজাপুরী সৈন্য পরাজয় স্বীকার করিয়া দাঁতে তৃণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিল, তাহাদের প্রাণদান করা হইল। এই যুদ্ধে শিবাজী লুঠ করিয়া বিশেষ লাভবান হইলেন। আফজল খাঁর সমস্ত তোপ, গোলাগুলি ও বারুদ, তাম্বু ও বিছানাপত্র, ধনরত্ন, মালসমেত ভারবাহী পশু তাঁহার হাতে পড়িল; ইহার মধ্যে ছিল পঁয়ষট্টিটা হাতী, চারি হাজার ঘোড়া, বারো শ' উট, দু'হাজার কাপড়ের বস্তা, এবং নগদ ও গহনাতে দশ লক্ষ টাকা। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ বিজাপুরী সর্দ্দার, আফজলের দুই শিশুপুত্র, এবং দুজন সাহায্যকারী মারাঠা জমিদার। যে-সব স্ত্রীলোক শিশু ব্রাহ্মণ এবং শিবিরের চাকর ধরা পড়িল, শিবাজী তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু আফজলের স্ত্রীগণ ও জ্যেষ্ঠপুত্র ফজল্ খাঁ, কয়না নদীর তীর বাহিয়া খণ্ডোজী খোপ্‌ড়ে ও তাহার মাব্‌লে সৈন্যের সহায়তায় নিরাপদ স্থানে পলাইয়া গেলেন।

শিবাজী তাঁহার বিজয়ী সেনাদের একত্র করিয়া পরিদর্শন করিলেন। বন্দীদের অন্ন বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইল। যে-সব মারাঠা-সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল, তাহাদের বিধবাদের পেন্সন দেওয়া হইল এবং বয়স্ক পুত্র থাকিলে তাহারা পিতার পদে নিযুক্ত হইল। আহত সৈনিকগণ জখমের অবস্থা অনুসারে একশত হইতে আটশত টাকা পুরস্কার পাইল। উচ্চ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে হাতী, ঘোড়া, পোষাক ও মণিমুক্তা বক্‌শিশ দেওয়া হইল।

মারাঠাদের এই প্রথম কীর্ত্তি এখানেই থামিল না। বিজয়ী শিবাজী দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া কোলাপুর জেলা আক্রমণ করিলেন, পন্‌হালা দুর্গ হস্তগত করিয়া (২৮এ নবেম্বর), রুস্তম্-ই জমানের অধীনে অপর একটি বিজাপুরী সৈন্যদলকে পরাস্ত করিলেন (২৮এ ডিসেম্বর)। আর তাহার পর জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ-কোঁকনে রত্নগিরি জেলায় প্রবেশ করিয়া অনেক বন্দর ও গ্রাম লুটিলেন।

আফজল খাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে গান ও গল্প

আফজল খাঁর ভীষণ পরিণাম দেশময় আলোচনা ও গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল। "অজ্ঞানদাস" ছদ্মনাম বা ভণিতাধারী একজন কবি মারাঠী ভাষায় ঐ ঘটনা সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত তেজপূর্ণ পোবাড়া (ব্যালাড্) রচনা করেন, তাহা এখনও জনসাধারণের খুব প্রিয়। আউন্ধের রাজা বালাসাহেব পন্ত প্রতিনিধি ইদানীং ঐ ঘটনা লইয়া একটি গীতিকাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এই 'ব্যালাড' ঐতিহাসিক সত্য অনুসরণ করে নাই, শুধু সুখপাঠ্য কিংবদন্তী ও কাল্পনিক শাখাপল্লবে পূর্ণ,—যেন মহাভারতের একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

মারাঠা দেশে প্রবাদ আছে, যখন আফজল বিজাপুর হইতে শিবাজীর বিরুদ্ধে রওনা হন, তখন নানা অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাঁহার পতাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, বড় হাতীটা অগ্রসর হইতে চাহে নাই, ইত্যাদি। আর তিনি মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া রওনা হইবার পূর্ব্বেই নিজের ৬৩ জন স্ত্রীকে খুন

করিয়া একই চবুতরার নীচে সমান দূরে দূরে তাঁহাদের কবর দিয়া মনের শঙ্কা মিটাইয়াছিলেন। বিজাপুর শহরের কয়েক মাইল বাহিরে আফজলপুরা নামক স্থানে খাঁর বাড়ী ও চাকর-বাকরের বসতি ছিল। স্থানটি এখন জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; শুধু ভাঙ্গা দেওয়াল পরিখা ও বন-জঙ্গল ও দূরে চাষের ক্ষেত্র দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুর ১৪ বৎসর মাত্র পরে ফরাসী-পর্য্যটক আবে কারে ঐখানে আসিয়া দেখেন যে, কারিগরেরা খাঁর সমাধির পাথর কাটিতেছে এবং একখানা প্রস্তরফলকে খোদা আছে যে খাঁ তাঁহার হারেমের দুই শত স্ত্রীলোকের গলা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে তথায় যাই, এবং তেষট্টিটি কবর দেখিতে পাই। সেগুলি যে একই সময়ে এবং একই ধরনে গড়া তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এখনও স্থানীয় কৃষকগণ ঐ খুনের বিস্তারিত বিবরণ বলে এবং সেই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন স্থানগুলি দেখাইয়া দেয়।

চতুর্থ অধ্যায় : পাঁচ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ, ১৬৬০-১৬৬৪

শিবাজীর দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রে প্রবেশ

আফজল খাঁর মৃত্যু (১০ই নবেম্বর ১৬৫৯) এবং তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইবার পর, শিবাজী দক্ষিণে কোলাপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া দেশ লুঠিতে লাগিলেন। ২৮এ নবেম্বর তিনি পন্‌হালা নামক বিশাল গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য স্থানীয় শাসনকর্ত্তা রুস্তম-ই-জমান বিজাপুররাজের আদেশে অগ্রসর হইলেন; আফজলের পুত্র ফজল খাঁ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রুস্তমের সহিত সসৈন্য মিলিত হইলেন। কিন্তু রুস্তম জানিতেন, বিজাপুরের কর্ত্রী—রাণী বড়ী সাহিবা গোপনে তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টায় আহেন, এ অবস্থায় তাঁহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় শিবাজীর সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা;—বিশেষতঃ শিবাজীর বংশের সহিত তাঁহার দুই পুরুষ ধরিয়া বন্ধুত্ব। সুতরাং রুস্তম শিবাজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া শুধু লোক দেখাইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। কোলাপুর শহর হইতে কিছু দূরে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হইল। রুস্তম ঢিলা দিয়া পিছনে থাকিলেন; ক্রুদ্ধ ফজল খাঁ যুদ্ধের সমস্ত ভার নিজের উপর লইয়া প্রবল বেগে মারাঠাদের আক্রমণ করিলেন (২৮এ ডিসেম্বর)। তাঁহার অনেক লোক যুদ্ধে মারা গেল, দু'হাজার ঘোড়া ও বারোটি হাতী ধরা পড়িল; পরাস্ত হইয়া ফজল খাঁ বিজাপুরে ফিরিলেন। আর রুস্তম পিছু হটিয়া নিজ জাগীর দক্ষিণ-কানাড়ায় গিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

এই সুযোগে মারাঠারা সহ্যাদ্রি পার হইয়া পশ্চিম দিকে রত্নগিরি জেলায় ঢুকিয়া অবাধে দক্ষিণ-কোঁকনের শহর ও বন্দর লুঠিতে লাগিল। তাহাদের আর একদল পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিজাপুর শহরের কাছাকাছি পৌঁছিল।

পনহালায় শিবাজীকে অবরোধ

তখন আদিল শাহর চৈতন্য হইল—তিনি শিবাজীকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সিদ্দি জৌহর নামক একজন হাব্‌শী ওমরাকে 'সলাবৎ খাঁ' উপাধি দিয়া ফজল খাঁর সহিত পনহালা দুর্গ দখল করিতে পাঠান হইল। পনের হাজার সৈন্যসহ জৌহর আসিয়া কোলাপুর শহরে আড্ডা

গাড়িলেন এবং শিবাজীকে পনহালাতে অবরুদ্ধ করিলেন (২রা মার্চ্চ, ১৬৬০)। কিন্তু তাঁহার মনে ছিল দুরভিসন্ধি। প্রভুর কাজে মন না দিয়া, তিনি নিজের জন্য স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। চতুর মারাঠা-রাজ ভবিষ্যতে সহায়তা করিবার লোভ দেখাইয়া জৌহরকে হাত করিলেন। লোক দেখাইবার ছলে ছয় মাস ধরিয়া ধীরে ধীরে ঐ দুর্গের অবরোধ-কার্য্য চলিতে লাগিল।

কিন্তু ফজল খাঁ ভুলিবার পাত্র নন। প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি নিজ সৈন্যদল লইয়া ক্রমাগত মারাঠাদের আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পনহালার পাশেই পবনগড় দুর্গ। নিকটস্থ একটি গিরিশৃঙ্গে কামান বসাইয়া ফজল খাঁ পবনগড়ের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পবনগড় রক্ষা করা দুর্ঘট হইল, কিন্তু একবার ইহা বিজাপুরীদের হাতে পড়িলে পনহালার পতনও অবশ্যম্ভাবী।

শিবাজী দেখিলেন অবস্থা সাংঘাতিক, তিনি ফাঁদে পড়িয়াছেন, পলায়নের পথ রুদ্ধ। ১৩ই জুলাই, আষাঢ় কৃষ্ণ-প্রতিপদের রাত্রে পনহালায় কিছু সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট লোকজন-সমেত তিনি দুর্গ হইতে গোপনে নামিলেন, পবনগড়ের সম্মুখস্থ বিজাপুরী শিবির আক্রমণ করিলেন, এবং সেই গোলমালের সুযোগে বিশালগড় দুর্গের দিকে পলাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

পনহালা হইতে শিবাজীর পলায়ন

কিন্তু বিশালগড় ২৭ মাইল দূরে, পথও অতি দুর্গম, উঁচুনীচু, পাথর ছড়ান এবং সঙ্কীর্ণ। পরদিন প্রভাত-কিরণে দেখা গেল যে তথায় পৌঁছিতে আরও আট মাইল পথ বাকী আছে। এদিকে রাত্রেই শিবাজীর পলায়নের সংবাদ এবং তাঁহার পথের ঠিক সন্ধান পাইয়া ফজল খাঁ মাহতাব্ জ্বালাইয়া তাঁহার পিছু পিছু আসিয়াছেন। এখন দিনের আলোতে অসংখ্য শত্রুসেনা মারাঠাদের পিষিয়া মারিবে।

এই মহাবিপদে বাজীপ্রভু নামক কায়স্থ-জাতীয় মাব্‌লে জমিদার নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া শিবাজীকে রক্ষা করিলেন। গজপুরের নিকট পথটি অতি সঙ্কীর্ণ, দুদিকেই উঁচু পাহাড় উঠিয়াছে। বাজীপ্রভু বলিলেন, "মহারাজ! আমি অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া এই স্থানটিতে মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুসেনাকে দাবাইয়া রাখি। আপনি সেই সুযোগে অবশিষ্ট রক্ষী লইয়া বিশালগড়ে দ্রুত প্রস্থান করুন। তথায় নিরাপদে পৌঁছিলে তোপের আওয়াজ করিয়া আমাকে সে সুসংবাদ দিবেন।"

গজপুরের গিরিসঙ্কট মারাঠা-ইতিহাসের থার্মোপলি। সকাল হইতে পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বারেবারে প্রবল বিজাপুরী সৈন্যদল বন্যার মত আসিয়া সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর মুষ্টিমেয় মারাঠারা প্রাণপণে লড়িয়া তাহাদের হটাইয়া দিতেছে। সাত শত মারাঠা-সৈন্য সেখানে প্রাণ দিল, বাজীপ্রভুও মরণাহত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেলেন, তবু যুদ্ধের বিরাম নাই। দ্বিপ্রহর বেলায় পশ্চাতে আট মাইল দূর হইতে তোপধ্বনি শোনা গেল। শিবাজী বিশালগড়ে আশ্রয় পাইয়াছেন। বাজীপ্রভু প্রাণ দিয়া পণ রক্ষা করিলেন। তখন বিজাপুর-পক্ষের কর্ণাটকী বন্দুকচীরা গুলির পর গুলি চালাইয়া ঐ গিরিসঙ্কট জয় করিল, অবশিষ্ট মাব্‌লেরা মৃত সেনানীর দেহ লইয়া পাহাড়ে পলাইয়া গেল।

সুলতান আলি আদিল শাহ জৌহরের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া "দুই বিদ্রোহীকেই" দমন করিবার জন্য স্বয়ং রাজধানী হইতে পনহালার দিকে অগ্রসর হইলেন। জৌহর দেখিলেন আর ত

ফাঁকি দেওয়া চলে না; তখন তিনি ২২এ সেপ্টেম্বর মারাঠাদের হাত হইতে পনহালা দুর্গ ফিরাইয়া লইয়া সুলতানকে অর্পণ করিলেন।

শায়েস্তা খাঁর পুণা ও চাকন অধিকার

যখন শিবাজীর রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহার এই পরাজয় ও ক্ষতি হইতেছিল, ঠিক সেই সময় উত্তর সীমানায় আর এক মহাবিপদ ঘটিল। ২৫ আগষ্ট ১৬৬০ মুঘলেরা তাঁহার হাত হইতে বিখ্যাত চাকন-দুর্গ কাড়িয়া লইল।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আওরংজীবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল, ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণের আর কোন ভয় রহিল না, কারণ সর্ব্বত্রই তাঁহার জয় হইয়াছে। এইবার তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার অবকাশ পাইলেন। নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

শায়েস্তা খাঁ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বীর; নেতৃত্বে ও দেশ-শাসনে সমান দক্ষ; বহু যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ধনে-মানে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এক মীরজুমলা ভিন্ন কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি অতি চতুর প্রণালীতে আহমদনগর হইতে (২৫এ ফেব্রুয়ারি, ১৬৬০) কুচ করিয়া পুণা জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া, সম্মুখ হইতে মারাঠাদের ক্রমাগত তাড়াইয়া, এবং নিজের পশ্চাতের পথ নিরাপদ রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে থানা বসাইয়া, অবশেষে পুণা শহরে আসিয়া পৌঁছিলেন (৯ই মে)। পথে তাঁহার কোন সৈন্য ক্ষয় হয় নাই বলিলেই চলে; মারাঠারা ভয়ে পিছাইয়া গেল, আর যদি-বা যুদ্ধ করিল এমন সুনিপুণভাবে চালিত ও দলবদ্ধ সৈন্যদলের সামনে দাঁড়াইতে পারিল না।

পুণার ১৮ মাইল উত্তরে চাকন-দুর্গ। ইহা হস্তগত করিতে পারিলে মুঘলরাজ্য হইতে দক্ষিণমুখী পথ দিয়া অতি সহজে পুণায় রসদ আনা সম্ভব হইবে। শায়েস্তা খাঁ ২৯এ জুন চাকনের বাহিরে পৌঁছিয়া দুর্গ-অবরোধ সুরু করিলেন। দুর্গস্বামী ফিরঙ্গজী নরসালা প্রাণপণে লড়িলেন। কিন্তু মুঘলেরা আজ অজেয়। জল-কাদা অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা দুর্গের চারিদিক খুঁড়িয়া মুর্চা বাঁধিতে লাগিল, মাটির নীচ দিয়া দুর্গের দেওয়ালের তলা পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ করিয়া তাহাতে বারুদ ভরিয়া আগুন দিল (১৪ই আগষ্ট)। সশব্দে চাকন-দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের বুরুজ ফাটিয়া উড়িয়া গেল। আর সেই সুযোগে মুঘলেরা দুর্গপ্রাকার আক্রমণ করিয়া দুইদিন ধরিয়া মারামারি কাটাকাটির পর সমস্ত চাকন অধিকার করিল (১৫ই আগষ্ট)। শায়েস্তা খাঁ নিজে বীর, কাজেই বীরের আদর করিতে জানিতেন। তিনি ফিরঙ্গজীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাদশাহী সৈন্যদলে উচ্চপদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত মারাঠা নিমকহারাম হইতে অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহাকে সসম্মানে সৈন্যসহ শিবাজীর নিকট ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইল।

দক্ষিণ-কোঁকনে শিবাজীর রাজ্য-বিস্তার

প্রায় দু'মাস ধরিয়া অবিরাম পরিশ্রমের পর চাকন অধিকার করিতে মুঘলদের ২৬৮ জন সৈন্য

হত ও ৬০০ জন আহত হয়। সুতরাং ইহার পর তাহারা আর মারাঠী দুর্গ আক্রমণ করিতে একেবারেই ইচ্ছুক হইল না। শায়েস্তা খাঁ শীঘ্রই পুণায় ফিরিয়া আসিয়া ছাউনি করিলেন।

১৬৬১ সালের প্রথমে তিনি উত্তর কোঁকন অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাদের নেতা–চার হাজারী মনসবদার কার্‌তলব্‌ খাঁ উজবক্‌ যখন উম্বখিণ্ড নামক স্থানে পথহীন পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে তোপ মালপত্র ও রসদ লইয়া বিব্রত, শিবাজী সেই সময় দ্রুতবেগে গুপ্তপথে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিলেন, এবং জলাশয়ে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন শিবির ও সম্পত্তি সমস্তই শিবাজীকে সমর্পণ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা লইয়া সৈন্যসহ ফিরিয়া আসিলেন (৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৬৬১)।

পনহালা ও চাকন হারাইয়া যে ক্ষতি হইয়াছিল, বিজয়ী শিবাজী এখন তাহা পূরণ করিবার জন্য দক্ষিণ-কোঁকনে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি নেতাজী পালকরের অধীনে একদল মারাঠা মুঘলদিগের বিরুদ্ধে উত্তর দিকে মোতায়েন রহিল। অপরদল লইয়া শিবাজী স্বয়ং বিজাপুরের অধীন দক্ষিণ-কোঁকন (বর্ত্তমান রত্নগিরি জেলা) অধিকার করিলেন। সেখানে শুধু খণ্ডরাজ্যের পর খণ্ডরাজ্য; এমন কোন একজন প্রবল প্রতাপশালী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিল না যে শিবাজীর গতি রোধ করিতে পারে। শিবাজী এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন যে অনেক স্থানীয় রাজা জমিদার আত্মরক্ষার আয়োজনের অবসর পাইল না,— তাড়াতাড়ি সব ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। আর-সকলে কর দিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

এইরূপে জঞ্জিরা হইতে খারেপটন পর্য্যন্ত পশ্চিম-সমুদ্রের কূলবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল তাঁহার হাতে পড়িল। সর্ব্বত্রই তাঁহার পক্ষ হইতে লুটপাট অথবা চৌথ আদায় চলিতে লাগিল। এই প্রদেশটি তীর্থবহুল, তাহার মধ্যে পরশুরামক্ষেত্র অতি বিখ্যাত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাত্রীরা এখানে তীর্থ-পর্য্যটনে আসে। এদেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বাসই অধিক। শিবাজীর সৈন্যগণের দ্রুত গতি, অজেয় শক্তি, লুটপাট এবং কঠোর পীড়নের সংবাদে ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার, গরিব গৃহস্থ ও প্রজা সকলেই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। চাষবাস বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইল। তখন শিবাজী তীর্থক্ষেত্রে গিয়া অনেক পূজা করিলেন, ব্রাহ্মণদের দান দিলেন, এবং প্রজাদের আশ্বাস দিয়া নিজ নিজ গৃহে ও কার্য্যে ফিরাইয়া আনিলেন। এই নূতন শাসন-স্থাপনে সাহায্য পাইবার আশায় শিবাজী শৃঙ্গারপুর-রাজ্য অধিকার করিবার পর তথাকার প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং (কার্য্যতঃ সর্ব্বেসর্ব্বা) পিলাজী শির্কেকে অর্থ ও ক্ষমতা দিয়া স্বপক্ষে আনিলেন, এমন কি তাঁহার সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধও স্থাপন করিলেন। এইরূপে পল্লীবন ও শৃঙ্গারপুর-রাজ্য এবং দাভোল, সঙ্গমেশ্বর, রাজাপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী শহর-বন্দর স্থায়িভাবে শিবাজীর হাতে আসিল। ঐ প্রদেশের অন্যান্য অগণিত নগর হইতে চৌথ আদায় হইল।

কিন্তু মে মাসে মুঘলেরা উত্তর-কোঁকনে কল্যাণ শহর (রাজধানী) অধিকার করিল এবং তাহা নয় বৎসর পর্য্যন্ত নিজের দখলে রাখিল। ইহার পর প্রায় দুই বৎসর কাল (মে ১৬৬৯-মার্চ্চ ১৬৬৩) মুঘল-মারাঠা যুদ্ধ মন্দবেগে চলিতে লাগিল, কোন পক্ষেই বিশেষ কোন কীর্ত্তি অথবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর জয়-পরাজয় হইল না। দ্রুতগামী মারাঠা-অশ্বারোহিগণ মাঝে মাঝে মুঘল-রাজ্য লুট করিতে লাগিল বটে, কিন্তু মোটের উপর মুঘলেরা নিজ অধিকার বজায় রাখিতে এবং কখন কখন পাল্‌টিয়া মারাঠা গ্রামের উপর চড়াও হইতে সমর্থ হইল।

রাত্রে শায়েস্তা খাঁর উপর আক্রমণ

কিন্তু ইহার পরেই শিবাজী এমন একটি কাণ্ড করিলেন যাহাতে মুঘল-রাজদরবারে হাহাকার উঠিল এবং তাঁহার যাদুবিদ্যার খ্যাতি ও অমানুষিক ক্ষমতার আতঙ্ক সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি রাত্রে শায়েস্তা খাঁর অগণিত সৈন্য-বেষ্টিত তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া খুন-জখম করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন (৫ই এপ্রিল, ১৬৬৩)।

চাকন-দুর্গ জয় করিবার পর শায়েস্তা খাঁ পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহার আবাস হইল শিবাজীর বাল্যকালের বাড়ী "লালমহল"। তাহার চারিদিকে তাঁবু খাটাইয়া এবং কানাৎ, অর্থাৎ পর্দ্দার বেড়া দিয়া, পরিবারবর্গ ও চাকর-বাকরের থাকিবার স্থান করা হইল। রক্ষিগণের ঘর তাহার নিকটেই। সৈন্য-সামন্তেরা পুণা গ্রামের নানা অংশে আশ্রয় লইল। কিছু দূরে দক্ষিণে সিংহগড়ে যাইবার পথের ধারে শায়েস্তা খাঁর সর্বোচ্চ কর্ম্মচারী মহারাজা যশোবন্ত সিংহ দশ হাজার সৈন্য লইয়া আড্ডা গাড়িলেন।

এমন সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিতে হইলে অত্যন্ত সাহস বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন। শিবাজীর যে পূর্ণমাত্রায় এই-সকল গুণ ছিল, তাহা তাঁহার পাকা বন্দোবস্ত হইতে বেশ বুঝা যায়। এক সহস্র সাহসী রণদক্ষ সেনা নিজের সঙ্গে লইলেন, আর পেশোয়া সেনাপতির অধীনে এক এক হাজার করিয়া মাব্‌লে পদাতিক ও অশ্বারোহীর দুইটি দলকে মুঘল-শিবিরের দক্ষিণে ও বামে আধ ক্রোশ দূরে লুকাইয়া রাখিলেন।

এরূপই বন্দোবস্ত করিয়া শিবাজী সিংহগড় হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার সময় পুণার নিকট পৌঁছিলেন। বাহিরে নিজ দলের ছয় শত সৈন্য রাখিয়া, পেশোয়া মোরো পন্ত ও সেনাপতি নেতাজীকে অপর দুইপাশে মোতায়েন করিয়া, অবশিষ্ট চারিশত বীরের সহিত তিনি মুঘল-শিবিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুসলমান প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা?" শিবাজী উত্তর দিলেন, "আমরা বাদশাহর দক্ষিণী সৈন্য, নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকিবার জন্য যাইতেছি।" প্রহরী আর দ্বিরুক্তি করিল না। তাহার পর পুণার এক নির্জ্জন কোণে চুপ করিয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া, শিবাজী মধ্যরাত্রে শায়েস্তা খাঁর বাসগৃহের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্যকাল হইতেই এখানকার পথঘাট তাঁহার সুপরিচিত।

তখন রমজান মাস। এই মাসে মুসলমানেরা দিবাভাগ উপবাসে কাটাইয়া রাত্রে আহার করে। সারা দিন উপবাসের পর প্রথম রাত্রে গুরু ভোজন করিয়া নবাবের বাড়ীর সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শুধু জনকয়েক পাচক জাগিয়া—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাইবার খানা রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কোন শব্দ করিবার পূর্ব্বেই মারাঠারা গিয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিল। এই রান্নাঘরটি বাহিরে, ইহার গায়েই অন্দরমহলের চাকরদিগের থাকিবার ঘর, মধ্যে একটি দেওয়াল খাড়া। পূর্ব্বে এই দেওয়ালে একটি ছোট দরজা ছিল, শায়েস্তা খাঁ সেই দরজার ফাঁক ইট দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শিবাজীর সঙ্গীরা শাবল্ দিয়া দরজার ইটগুলি খুলিতে লাগিল। সেই শব্দে ওপাশের, অর্থাৎ অন্দরমহলের, চাকরেরা জাগিয়া উঠিল এবং খাঁকে জানাইল যে বোধ হয় চোরেরা সিঁধ কাটিতেছে। এই সামান্য কারণে নিদ্রার ব্যাঘাত করায় খাঁ চটিয়া, ধমক দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন।

ইট সরাইয়া ক্রমে দেওয়ালের ছিদ্র মানুষ ঢুকিবার মত বড় করা হইল। প্রথমেই শিবাজী নিজে তাঁহার রক্ষী চিম্‌নাজী বাপুজীকে লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, পিছু পিছু চলিল তাঁহার দুই

শত সৈন্য। বাকী দুইশত বীর বাবাজী বাপুজীর অধীনে ছিদ্রের বাহিরে খাড়া রহিল। তরবারি ও ছোরা দিয়া কানাৎ কাটিয়া পথ করিয়া সদলে শিবাজী তাঁবুর পর তাঁবু পার হইয়া শেষে শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে গিয়া হাজির। তাহাদের দেখিয়া অন্দরের স্ত্রীলোকেরা ভয়ে খাঁকে জাগাইল। কিন্তু খাঁ তরবারি ধরিবার আগেই শিবাজী তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া এক কোপে তাঁহার হাতের আঙ্গুল কাটিয়া দিলেন। এই সময় অন্দরের এক চতুর দাসী বুদ্ধি করিয়া ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিল; মারাঠারা অন্ধকারেই তলোয়ার চালাইতে লাগিল। দু'জন মারাঠা অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া জলের চৌবাচ্চায় পড়িয়া গেল। এই গোলমালের সুযোগে দাসীরা খাঁ-সাহেবকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া ফেলিল। কিন্তু অন্দরমহলে শিবাজীর লোকজন পুরাদমে সংহার-কার্য্য চালাইতে লাগিল, ছয়জন বাঁদী হত এবং আটজন আহত হইল।

এদিকে শিবাজীর অপর দুইশত সঙ্গী বাহিরের রক্ষীগৃহে ঢুকিয়া নিদ্রিত ও অর্দ্ধনিদ্রিত প্রহরীদের হত্যা করিল, আর বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, "তোরা বুঝি এমনি করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পাহারা দিস্?" তাহার পর নহবতের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "খাঁ-সাহেবের হুকুম, খুব জোরে বাজাও।" তখন জয়ঢাক, তুরী ভেরী ও করতালের শব্দের সহিত মারাঠাদের চীৎকার মিশিয়া এক তাণ্ডব ব্যাপার সৃষ্টি করিল। অন্দর হইতে আর্ত্তনাদ এবং মারাঠাদের হুঙ্কার শুনিয়া মুঘল-সৈন্যগণ বুঝিতে পারিল তাহাদের সেনাপতিকে শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। অমনি চারিদিকে "সাজ সাজ" রব উঠিল।

শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফৎ সকলের আগে পিতাকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিলেন। কিন্তু একাকী কি করিবেন? তিনিও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। একজন মুঘল-সেনানীর বাসা ছিল অন্দরমহলের পাশেই। মারাঠারা অন্দরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে দেখিয়া, তিনি দড়ি বাহিয়া অন্দরের আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িলেন; শত্রুরা অবিলম্বে তাঁহাকেও হত্যা করিল। এইরূপে শায়েস্তা খাঁর এক পুত্র, ছয়জন বাঁদী ও চল্লিশজন রক্ষী হত এবং নিজে, দুই পুত্র ও আটজন বাঁদী আহত হইল। মারাঠাদের পক্ষে শুধু ছয়জন লোক মারা যায় এবং চল্লিশজন জখম হয়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এত-সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এদিকে শিবাজী দেখিলেন, শত্রু এখন সজাগ—রণসজ্জা করিতেছে, তাঁহার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। তিনি নিজ অনুচরদের একত্র করিয়া শিবির হইতে দ্রুত বাহির হইয়া পড়িলেন এবং যশোবন্তের তাঁবুগুলির পাশ দিয়া সোজা দক্ষিণে সিংহগড়ে চলিয়া গেলেন। মুঘলেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য সমস্ত শিবিরের মধ্যে অন্ধকারে এদিক-ওদিক বৃথা খুঁজিতে লাগিল। তাহারা স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিল যে মারাঠারা সংখ্যায় অন্তত দশ-বিশ হাজার হইবে।

শায়েস্তা খাঁর দুঃখ ও শাস্তি

১৬৬৩ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে এই ঘটনা ঘটে। পরদিন এতে সমস্ত মুঘল-কর্ম্মচারীরা সেনাপতির শোকে সমবেদনা জানাইবার জন্য তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে যশোবন্ত সিংহ ছিলেন, তাঁহার অধীনে দশ হাজার সৈন্য এবং তাঁহার শিবির শিবাজীর পথে, অথচ তিনি শত্রুর আসা-যাওয়ার সময় কোন বাধাই দেন নাই এবং পশ্চাদ্ধাবনও করেন নাই। তাঁহার কপট দুঃখের কথাগুলি শুনিয়া শায়েস্তা খাঁ বলিলেন, "আঁ! আপনি বাঁচিয়া আছেন দেখিতেছি। কাল রাত্রে যখন শত্রু আমাকে আক্রমণ করে, আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি তাহাদের বাধা দিতে গিয়া

প্রাণ হারাইয়াছেন, তবেই ত তাহারা আমার কাছে পৌঁছিতে পারিয়াছে।"

ফলতঃ, দেশের সর্ব্বত্র লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে, শিবাজী যশোবন্তের সহিত যুক্তি করিয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। ইংরাজ-বণিকেরাও এই দুর্নামের কথা লিখিয়া গিয়াছে। কিন্তু শিবাজী নিজের অনুচরদিগকে বলিতেন, "আমি যশোবন্তের কথায় এ কাজ করি নাই, আমার পরমেশ্বর আমাকে ইহা করাইয়াছেন।"

মহারাষ্ট্রে থাকা মোটেই নিরাপদ নহে দেখিয়া, লজ্জা ও শোকে অভিভূত শায়েস্তা খাঁ আওরঙ্গাবাদে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার অসাবধানতা ও অকর্ম্মণ্যতার ফলেই এই বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া বাদশাহ শাস্তিস্বরূপ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাঙ্গলায় বদলি করিলেন, কারণ তখন বাঙ্গলার নাম ছিল “রুটিপূর্ণ নরক”। বাঙ্গলা যাইবার পথে বাদশাহের সহিত দেখা করিতে পর্য্যন্ত শায়েস্তা খাঁকে নিষেধ করা হইল। ১৬৬৪ সালের জানুয়ারীর প্রথমে কুমার মুয়জ্জম্ (শাহ আলম্) দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া রাজধানী আওরঙ্গাবাদে পৌঁছিলেন এবং শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার দিকে রওনা হইলেন। এই বদলির সুযোগে শিবাজী অবাধে মনের সুখে সুরত বন্দর লুঠ করিলেন (৬-১০ই জানুয়ারী)।

সুরত বন্দরের বর্ণনা

ভারতের পশ্চিমে সাগর-কূল হইতে বারো মাইল দূরে তাপ্তী নদীর তীরে সুরত নগর। অনেক আগে এখানে বড় বড় জাহাজের যাতায়াত ছিল, কিন্তু এখন নদীর মুখ এই শহর হইতে ছয় সাত ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে, কাজেই সমুদ্রগামী জাহাজগুলি সেই মুখের কাছে, সুহায়িলী (ইংরাজী Swally Hole) নামক স্থানে নোঙ্গর করিয়া থাকে, আর অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ ও নৌকা নদী উজাইয়া সুরতে আসে। তবুও, সুরত মুঘল-ভারতে সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল। বাণিজ্যের মাশুলের আয়ে এবং ধনরত্নে এক দিল্লী ভিন্ন আর কোন নগর ইহার সমকক্ষ ছিল না। প্রাচীন হিন্দুযুগে ইহার কিছু উত্তরে নর্ম্মদার মুখের কাছে ভারুকচ্ছ (বর্ত্তমান ভরোচ, প্রাচীন গ্রীক নাম বার্‌গজা) শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিন চলিয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন সুরত হইতে মক্কা-মদিনার যাত্রী লইয়া জাহাজ ছাড়িত; এজন্য ইহার নাম ছিল “ইসলামের পুণ্য তীর্থের দ্বার”। এখান হইতেই ভারতীয় মুসলমানগণ আরব দেশের জন্য তীর্থযাত্রা করিতেন।

সুরতের দুই অংশ, একটি দুর্গ ও অপরটি শহর। দুর্গটি ছোট ও সুরক্ষিত। কিন্তু শহরটি চারি বর্গমাইল বিস্তৃত, ধনেজনে পরিপূর্ণ। লোকসংখ্যা দুই লক্ষ; বাণিজ্য-দ্রব্যের মাশুল হইতে রাজকোষে বৎসরে বারো লক্ষ টাকা আয় হইত, অর্থাৎ আমদানী জিনিসের মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ছিল। এ সময়ে শহরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল না, তা স্থানে স্থানে বাহির হইতে আসিবার রাস্তার মুখে সামান্য রকমের ফটক এবং কোথাও কোথাও শুষ্ক পরিখা ছিল, তা সহজেই পার হওয়া যাইত।

সুরত শহরের ধনরত্নের তুলনা ভারতের অন্যত্র পাওয়া কঠিন। এই নগরে এক বহরজী বোরার সম্পত্তির পরিমাণই আশী লক্ষ টাকা, তাহার পর হাজী সাইদ্ বেগ ও অন্য বণিকদের ত কথাই নাই। অথচ শহর-রক্ষার বন্দোবস্ত মোটেই ছিল না। শহরের শাসনকর্ত্তা পাঁচশত রক্ষী-সৈন্যের বেতন রাজদরবার হইতে পাইতেন বটে, কিন্তু লোকজন রাখিতেন না,—টাকাটা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতেন। নগরবাসিগণও শান্তিপ্রিয়, দুর্ব্বল এবং ভীরু, অধিকাংশই অহিংস জৈন, শুচিবাইগ্রস্ত অগ্নি-উপাসক পারসী, অথবা অর্থপ্রিয় দোকানী এবং নিরীহ গুজরাতী কারিগর। ইহারা আত্মরক্ষার

জন্য কি যুদ্ধ করিবে? মহাধনী ভারতীয় বণিকগণও নিজ সম্পত্তির সহস্রাংশ ব্যয় করিয়া চৌকিদার এবং সিপাহী রাখার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহর পক্ষে ইনাএৎ খাঁ সুরত বন্দরের শাসনকর্ত্তা ছিল; লোকটি যেমন অর্থলোভী তেমনই কাপুরুষ ও অকর্ম্মণ্য। কিন্তু দুর্গটি একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর হাতে ছিল, সে ইনাএৎ-এর অধীনতা স্বীকার করিত না।

ইংরাজ কুঠীর আশ্চর্য্য আত্মরক্ষা

মঙ্গলবার, ৫ই জানুয়ারি, প্রাতে সুরতবাসিগণ সভয়ে শুনিল দুইদিন পূর্ব্বে শিবাজী সসৈন্য আটাশ মাইল দক্ষিণে পৌঁছিয়াছেন, এবং সুরতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। অমনি শহরময় শোরগোল উঠিল; আতঙ্কে লোকজন পলাইতে সুরু করিল। যে পারিল স্ত্রীপুত্র লইয়া নদী পার হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে আশ্রয় লইল। ধনী লোকেরা দুর্গের অধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়া সপরিবারে তথায় স্থান পাইলেন; তাহাদের মধ্যে শহরের রক্ষক ইনাএৎ খাঁ সর্ব্বপ্রথম।

অথচ মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় দোকানদার এই সময়ে আশ্চর্য্য সাহস দেখাইয়া নিজ ধন প্রাণ মান বাঁচাইতে সক্ষম হইল। সুরতের ইংরাজ ও ডচ্ বণিকগণ নিজ নিজ কুঠীতে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া শিবাজীর সমস্ত সৈন্যদলকে হটাইয়া দিল। তাহাদের কুঠীগুলি সাধারণ খোলাবাড়ী,—দুর্গ নহে, চারিদিকে সীমানা-ঘেরা দেওয়াল পর্য্যন্ত ছিল না। ইংরাজ-কুঠীর প্রধান, স্যার জর্জ অকসিণ্ডেন, ইচ্ছা করিলে সহজেই সুহায়িলীতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া স্বয়ং সুরতে থাকিয়া যুদ্ধের নেতৃত্ব লইলেন। সত্বর ছয়টি ছোট ছোট কামান সংগ্রহ করিয়া, সুহায়িলী হইতে জাহাজী গোরা আনিয়া, মোট একশত পঞ্চাশ জন ইংরাজ এবং ষাটজন পিয়নকে সুরতের কুঠী রক্ষা করিবার জন্য সজ্জিত করা হইল। চারিটি কামান ছাদের উপর বসান হইল, তাহার গোলা পাশের দুটি রাস্তা এবং নিকটবর্ত্তী হাজী সাইদ বেগের বাড়ীর উপর পড়িতে পারিত। আর দুইটি তোপ সদর-দরজার পিছনে বসান হইল, এবং ঐ দরজায় এমন করিয়া দুটি ছিদ্র করা হইল যাহাতে তাহার মধ্য দিয়া কামানের মুখ বাহির হইতে পারে এবং রাস্তা হইতে কুঠীতে আসিবার পথে যে ঢুকিবে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায়। তাড়াতাড়ি কয়েক দিনের জন্য খাদ্য ও জল আনিয়া মজুত করা হইল। ইংরাজদের কেহ সীসা দিয়া গুলি প্রস্তত করিতে সুরু করিল, কেহ অপর যুদ্ধ-সামগ্রী তৈয়ারে মন দিল, কেহ বা কুঠীর দেওয়াল মেরামত করিয়া দৃঢ়তর করিল। প্রত্যেক লোককে নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থান চিনাইয়া দেওয়া হইল, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নেতা (কাপ্তেন) নিযুক্ত হইল। সব কাজের জন্য শৃঙ্খলা, সুন্দর ব্যবস্থা, এবং আগে হইতেই ভাবিয়া উপায় ঠিক করিয়া রাখা হইল। বুধবার প্রাতে অক্সিণ্ডেন তাঁহার দুইশত অনুচর লইয়া ঢাক তুরী বাজাইয়া শহরের মধ্য দিয়া কুচ করিয়া আসিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে বলিতে লাগিলেন, “এই কয়টি লোক লইয়াই আমি শিবাজীর গতি রোধ করিব।" ডচেরাও তাহাদের কুঠী রক্ষার জন্য সজ্জিত হইল; এবং এই-সব আয়োজন দেখিয়া কতকগুলি তুর্কী ও আরমানী-বণিক নিজ নিজ সম্পত্তি একটি সরাই-এ লইয়া গিয়া তাহাকে দুর্গে পরিণত করিল। আর "ভারত? শুধু ঘুমাইয়া" রহিল।

শিবাজীর প্রথম সুরত লুণ্ঠন

বাছা বাছা দ্রুতগামী অশ্বে চারি হাজার সৈন্য চড়াইয়া শিবাজী বম্বের কাছ হইতে গোপনে বেগে অগ্রসর হইয়া সুরতের নিকট পৌঁছিলেন, পথে দুইজন কোলী রাজা লুঠের ভাগ পাইবার লোভে ছয় হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুধবার (৬ই জানুয়ারি ১৬৬৪) দুপুর বেলা শিবাজী সুরত শহরের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং "বুর্হানপুর দরজার" সিকি মাইল দূরে একটি বাগানে নিজ তাম্বু খাটাইলেন। মারাঠা অশ্বারোহিগণ অমনি অরক্ষিত অর্দ্ধজনশূন্য শহরে ঢুকিয়া বাড়ীঘর লুঠ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। একদল শহরের মধ্য হইতে দুর্গের দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল, ভয়ে দুর্গরক্ষী বীরগণ কেহই মাথা তুলিল না, বা শহর-লুঠে বাধা দিল না।

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই চারিদিন ধরিয়া শহর অবাধে লুণ্ঠিত হইল। মারাঠারা প্রত্যহ নূতন নূতন পাড়ায় ঘর জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। সে সময় সুরতে পাকা বাড়ী দশ-বিশটার অধিক ছিল না, বাকী হাজার হাজার বাড়ীতে কাঠের খুঁটি, বাঁশের দেওয়াল, খড় বা খোলার চাল, এবং মাটির মেঝে। এ হেন স্থানে মারাঠাদের অগ্নিকাণ্ড সহজেই "রাত্রিকে দিনের মত উজ্জ্বল এবং ধূমবৃষ্টি দিনকে রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া তুলিল—সূর্য্যের মুখ ঢাকিয়া দিল।" [ইংরাজ পুরোহিতের বিবরণ]

ডচ্ কুঠীর কাছে সুরতের—সুরতের কেন, সমস্ত এশিয়াখণ্ডের—সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বহরজী বোরার প্রাসাদ অরক্ষিত জনশূন্য দেখিয়া, মারাঠার তিনদিন তিনরাত্রি ধরিয়া তাহার মেঝে খুঁড়িয়া লুঠ করিল, সমস্ত ধনরত্ন এবং আটাশ সের মোতির বোঝ লইয়া অবশেষে ঘরে আগুন দিয়া প্রস্থান করিল। ইংরাজ-কুঠীর নিকটে আরও একজন মহাধনী হাজী সাইদ বেগের বাড়ীতে ঢুকিয়া, তাহারা সারা দিনরাত্রি দরজা-বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া যত পারিল টাকা সরাইল। গুদামে ঢুকিয়া পারদের পিপা ভাঙ্গিয়া তাহা মাটিতে ছড়াইয়া দিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার বৈকালে যখন পঁচিশজন মারাঠা-সৈন্য ইংরাজ কুঠীর নিকটস্থ একটি ঘরে আগুন লাগাইতে উদ্যত, সেই সময় ইংরাজেরা কুঠী হইতে বাহির হইয়া মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায়, সাইদ বেগের বাড়ীর মারাঠা দলও ভয়ে সরিয়া পড়িল। পরদিন ইংরাজেরা কয়েকজন নিজের লোক পাঠাইয়া ঐ বণিকের বাড়ী রক্ষার ভার লইল। এইরূপ ধনের খনি হাত-ছাড়া হওয়াতে শিবাজী চটিয়া ইংরাজ-কুঠিতে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় আমাকে তিন লক্ষ টাকা দাও, না হয় হাজী সাইদের বাড়ী লুঠিতে দাও। নতুবা আমি স্বয়ং আসিয়া, তোমাদের সকলের গলা কাটিব এবং কুঠী ভূমিসাৎ করি দিব।" সুচতুর ইংরাজ-নেতা উত্তর দিবার জন্য কিছু সময় চাহিয়া লইয়া শনিবার প্রাতঃকাল (অর্থাৎ চতুর্থ দিন) পর্য্যন্ত কাটাইলেন, তাহার পর শিবাজীকে খবর পাঠাইলেন—"আমরা দুইটি শর্ত্তের কোনটিতেই রাজি নহি; আপনি যাহা করিতে পারেন করুন; আমরা প্রস্তুত আছি, পলাইব না। যে সময় ইচ্ছা এই কুঠী আক্রমণ করুন। আর, এই কুঠী লইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বলিতেছেন; বেশ ত, যখন আসিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার এক প্রহর আগেই আসিবেন।" শিবাজী আর কিছুই করিলেন না; তিনি সুরত হইতে অবাধে এক কোটির অধিক টাকা পাইয়াছেন, তবে আর কেন দুই-এক লাখের জন্য স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইংরাজদের তোপের মুখে নিজ সৈন্য নষ্ট করিবেন?

মারাঠাদের সুরতে অত্যাচার ও খুন

সুরত-লুণ্ঠনের ফলে অগণিত ধন লাভ হইল। বহু বৎসরেও এই সময়ের মত অর্থ রত্ন ইত্যাদি শহরে সংগৃহীত হয় নাই। মারাঠারা সোনা, রূপা, মোতি হীরা ও রত্ন ভিন্ন আর কিছুই ছুঁইল না।

মারাঠারা সুরতবাসীদের ধরিয়া আনিয়া কোথায় তাহারা নিজ নিজ ধন-সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার সন্ধানের জন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুর পীড়নই বাকী রাখিল না; চাবুক মারা হইল, প্রাণ বধের ভয় দেখান হইল, কাহারও এক হাত কাহারও বা দুই হাত কাটিয়া ফেলা হইল, এবং কতক লোকের প্রাণ পর্য্যন্ত লওয়া হইল। "মিষ্টার এণ্টনি স্মিথ (ইংরাজ-বণিক) স্বচক্ষে দেখিলেন যে, শিবাজীর শিবিরে একদিনে ছাব্বিশজনের মাথা এবং ত্রিশজনের হাত কাটিয়া ফেলা হইল; বন্দীদের যে-কেহ যথেষ্ট টাকা দিতে পারিল না তাহার অঙ্গহানি বা প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। শিবাজীর লুঠের প্রণালী এইরূপ, প্রত্যেক বাড়ী হইতে যাহা সম্ভব লইয়া, গৃহস্বামীকে বলা হইল যে যদি বাড়ী বাঁচাইতে চাও ত তাহার জন্য আরও কিছু দাও। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সেই টাকা আদায় হইল, অমনি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ঘরগুলি পুড়াইয়া দিলেন!"

[সুরত কুঠীর পত্র] একজন বুড়া বণিক আগ্রা হইতে চল্লিশটি বলদ বোঝাই করিয়া কাপড় আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা বিক্রয় না হওয়ায়, নগদ টাকা দিতে না পারিয়া সে ঐ সমস্ত মাল শিবাজীকে দিতে চাহিল; তবুও তাহার ডান হাত কাটিয়া তাহার কাপড়গুলি পুড়াইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। অথচ একজন ইহুদী মণি-বিক্রেতা বেশ বাঁচিয়া গেল; সে 'আমার কিছু নাই' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল; মারাঠারাও ছাড়িবে না, তাহাকে বধ করিবার হুকুম হইল; তিন তিনবার তরবারি তাহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘাড়ে ছোঁয়ান হইল, কিন্তু সে কিছুই দিতে না পারিয়া যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে এরূপ ভাণ করিল; অবশেষে আশা নাই দেখিয়া শিবাজী তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ইংরাজ কুঠীর কর্ম্মচারী এণ্টনি স্মিথ ডচ্ ঘাটে নামামাত্র বন্দী হইয়া তিন দিন শিবাজীর শিবিরে আবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বন্দীর সহিত তাঁহারও ডান হাত কাটার হুকুম হইল; কিন্তু তিনি উর্দ্দু ভাষায় চেঁচাইয়া শিবাজীকে বলিলেন, "কাটিতে হয় আমায় মাথা কাট, হাত কাটিও না।" তখন মারাঠারা তাঁহার মাথায় টুপী খুলিয়া দেখিল যে, তিনি ইংরাজ; দণ্ডাজ্ঞা রদ হইল। পরে তিনশত পঞ্চাশ টাকা দিয়া তিনি মুক্ত হন। স্মিথ চোখে দেখিয়া শিবাজী-সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন।

শিবাজীকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র

ভীরু ইনাএৎ খাঁ দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া শিবাজীকে খুন করিবার এক ফন্দী আঁটিল। বৃহস্পতিবারে সন্ধির প্রস্তাবের ভাণ করিয়া সে একজন বলিষ্ঠ যুবক কর্ম্মচারীকে শিবাজীর নিকট পাঠাইল। সে যাহা দিতে চাহিল তাহা এত অসম্ভবরূপে কম যে, শিবাজী ঘৃণার সঙ্গে বলিলেন, "তোমার প্রভু স্ত্রীলোকের মত ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। সে কি মনে করে আমিও স্ত্রীলোক যে তাহার এই হাস্যকর প্রস্তাবে সম্মত হইব?" যুবকটি উত্তর দিল, "আমরা স্ত্রীলোক নহি। আপনাকে আরও কিছু বলিবার আছে।" এই বলিয়াই সে কাপড়ের মধ্য হইতে লুকান ছোরা বাহির করিয়া সবেগে শিবাজীর দিকে ছুটিয়া গেল। একজন মারাঠা শরীর-রক্ষক তরবারির এক কোপে তাহার হাত কাটিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু যুবক বেগ থামাইতে পারিল না, হাতের সেই রক্তাক্ত কাটা

কব্জা দিয়া শিবাজীকে আঘাত করিয়া দুজনে মাটিতে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। শিবাজীর দেহে রক্তের দাগ দেখিয়া মারাঠারা চেঁচাইল—"সব বন্দীদের প্রাণ বধ কর।" কিন্তু শীঘ্রই খুনী যুবককে হত্যা করা হইল, শিবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্দীদের নিজের সামনে আনিতে বলিলেন। তাহার পর তাহাদের মধ্যে চারিজনকে বধ করিয়া এবং চব্বিশজনের হাত কাটিয়া ফেলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

ইংরাজদের প্রশংসা ও পুরস্কার

রবিবার ১০ই জানুয়ারি প্রাতে দশটার পর মারাঠারা হঠাৎ সুরত হইতে চলিয়া গেল, এবং সন্ধ্যার মধ্যেই বারো মাইল দূরে পৌঁছিল, কারণ শিবাজী খবর পাইয়াছিলেন যে, একদল মুঘল-সৈন্য সুরতে আসিতেছে। এই দল ১৭ই তারিখে পৌঁছিলে, তবে ইনাএৎ খাঁ দুর্গের বাহিরে আসিতে সাহস পাইল। নগরবাসিগণ তাহাকে দেখিয়া ছি ছি করিতে লাগিল, কেহ বা কাদামাটি ছুঁড়িতে লাগিল। ইহাতে ইনাএতের পুত্র রাগিয়া একজন নির্দ্দোষ হিন্দু বানিয়াকে হত্যা করিল।

মুঘল-সৈন্যদল পৌঁছিবার পর ইংরাজ-বণিকগণ তাহার নেতাদের সঙ্গে দেখা করিলেন। শহরবাসীদের মুখে আর ইংরাজদের প্রশংসা ধরে না, তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "এই সাহেবেরা নিজের কুঠীর আশপাশে আমাদের অনেকের বাড়ী রক্ষা করিয়াছেন। বাদশাহ ইহাদের পুরস্কার দিন!" নবাগত সেনাপতিও ইংরাজদের খুব ধন্যবাদ দিলেন। অক্সিণ্ডেন সাহেবের হাতে একটা পিস্তল ছিল, তিনি অমনি তাহা সেনাপতির সামনে রাখিয়া বলিলেন, "আমরা এখন অস্ত্র ছাড়িয়া দিতেছি, কারণ ভবিষ্যতে আপনিই শহর রক্ষা করিবেন।" সেনাপতি শুনিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ইহা লইলাম, কিন্তু আপনাকে এক খেলাৎ, অশ্ব ও তরবারি উপহার দিব।" চতুর বণিকরাজ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, না। ওসব জিনিস সৈন্যদের সাজে; আমরা বণিক মাত্র, বাণিজ্যের সুবিধা ভিন্ন আর কোন পুরস্কার আমরা চাহি না।"

বাদশাহ সুরতের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া এক বৎসরের জন্য সকলেরই মাশুল মাফ করিলেন, এবং তাহার উপর ইংরাজ ও ডচ্‌দের পুরস্কারস্বরূপ তাহাদের আমদানী দ্রব্যের মাশুল শতকরা এক টাকা কমাইয়া দিলেন। [এই অনুগ্রহ নবেম্বর ১৬৭৯ অবধি চলিয়াছিল।]

পঞ্চম অধ্যায় : জয়সিংহ ও শিবাজী

১৬৬৪ সালের যুদ্ধ ইত্যাদি

সুরত-লুঠের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত মুঘল পক্ষে আর কিছুই কাজ হইল না। সুবাদার কুমার মুয়জ্জম্ (শাহ আলম্) আওরঙ্গাবাদে থাকিয়া আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ... মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর, সিংহগড় দুর্গ অবরোধ করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিলেন (২৮ মে ১৬৬৪)। শিবাজীর দল নানা স্থানে লুঠতরাজ করিতে লাগিল; আজ মহারাষ্ট্র, কাল কানাড়ায়, পরশু পশ্চিম তীরদেশে। লোকে ভয়ে বিস্ময়ে বলিতে লাগিল, "শিবাজী মানুষ নহেন, তাঁহার বায়বীয় শরীর আছে, ডানা আছে। নচেৎ, তিনি কিরূপে একই সময়ে এত দুর দূর বিভিন্ন স্থানে যাইতে পারিতেছেন?" "তিনি সর্বদাই অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া দ্রুত কুচ করিতেছেন, এবং তাহার কর্ম্মচারীদেরও সেইমত চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। সমস্ত দেশময় রাজারা তাঁহার ত্রাসে কম্পমান। দিন দিন তাঁহার শক্তি বাড়িতেছে।" [ইংরাজ-কুঠির চিঠি]

এই সময়, ২৩এ জানুয়ারি ১৬৬৪, ঘোড়া হইতে পড়িয়া শাহজীর মৃত্যু হইল। তাঁহার যত অস্থাবর সম্পত্তি এবং মহীশূর ও পূর্ব্ব-কর্ণাটকের জাগীর শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যঙ্কাজী (অথবা একোজী) অধিকার করিলেন।

উপর্য্যুপরি এই-সব ক্ষতি ও লজ্জাকর পরাজয় ভোগ করিয়া, আওরংজীব অনেক ভাবিয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য মীর্জা রাজা জয়সিংহ কাছোয়া (আম্বের, অর্থাৎ বর্ত্তমান জয়পুর-রাজ্যের অধিপতি)-কে নিযুক্ত করিলেন (৩০ সেপ্টেম্বর ১৬৬৪)। তাঁহার সঙ্গে বিখ্যাত পাঠানবীর দিলির খাঁ, আরব সেনানী দাউদ খাঁ, সুজন সিংহ বুন্দেলা ও অন্যান্য সেনাপতি এবং চৌদ্দ হাজার সৈন্য দেওয়া হইল।

জয়সিংহের চরিত্র

জয়সিংহ মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের একটি অদ্বিতীয় পুরুষ। রাজপুত বলিলে আমরা সচরাচর বুঝি, কোন অসীমসাহসী, মান্যপ্রিয়, ধন ও স্বার্থে নিস্পৃহ, গোঁয়ারগোবিন্দ বীর ও ত্যাগী। জয়সিংহ যুদ্ধপটু ভয়হীন তেজী পুরুষ হইলেও সেই সঙ্গে কূটনীতিতে, সভ্যতা-ভব্যতায়, লোকজনকে হাত

করিয়া কাজ হাসিল করিবার ক্ষমতাতেও কম পরিপক্ক ছিলেন না। ফলতঃ সম্ভ্রান্ত রাজপুত ও মুঘল— এই দুই শ্রেণীরই সব গুণগুলি তাঁহার মধ্যে একাধারে ছিল। বারো বৎসর বয়সে এই পিতৃহীন বালক মুঘল-সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন (১৬১৭); তাহার পর জাহাঙ্গীরের শেষকাল এবং শাহজাহানের সমগ্র রাজত্বের ইতিহাস তাঁহার কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল। সুদূর আফঘানিস্থানের কান্দাহার হইতে পূর্ব্ব প্রান্তে মুঙ্গের পর্য্যন্ত, আর উত্তরে অক্‌শশ্ নদীর তীর হইতে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই মুঘল-সৈন্য লইয়া তিনি লড়িয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই যশ লাভ করিয়াছেন। রাজনীতির চাল চালিতেও কম দক্ষ ছিলেন না। বাদশাহ সব বিপদে, সব কঠিন কাজে জয়সিংহের উপর নির্ভর করিতেন।

এই ষাট বৎসর বয়সের প্রবীণ নেতা আজ দাক্ষিণাত্যের এক জাগীরদারের পুত্রকে দমন করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবনার অন্ত ছিল না। কি মুঘল, কি বিজাপুরী সেনানী, কেহই শিবাজীকে এ পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে পারেন নাই; শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত পর্য্যন্ত হারিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, উত্তর-ভারত হইতে প্রবল সৈন্যদল আসিলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয় মুঘলের ভয়ে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, সুতরাং জয়সিংহকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তিনি সত্য কথাই বাদশাহকে লিখিলেন, "আমি দিনরাতের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম ভোগ করি না, অথবা যে-কাজ হাতে লইয়াছি তাহার জন্য না ভাবিয়া থাকি না।"

মারাঠা-যুদ্ধের জন্য জয়সিংহের বন্দোবস্ত ও ফন্দী

কিন্তু বাধা-বিপত্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরীক্ষা করে। জয়সিংহ অতিশয় চাতুরী ও দক্ষতার সহিত ভাবী যুদ্ধের সব বন্দোবস্ত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি নিজ পক্ষে যথাসম্ভব লোক আনিতে এবং শিবাজীর শত্রুদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পুণায় পৌঁছিবার আগেই জানুয়ারি মাসে তিনি মুঘল-রাজ্যের বাসিন্দা দুইজন পোর্তুগীজ কাপ্তেন ফ্রান্সিকো এবং ডিওগো ডি মেলো'কে গোয়ার পোর্তুগাল-রাজপ্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া শিবাজীর নৌবল আক্রমণ করিবার জন্য সাহায্য চাহিলেন। জঞ্জিরার হাব্‌শী সর্দ্দার সিদ্দিকেও সেই মর্ম্মে পত্র লেখা হইল। বিদনুর, বাসবপটন, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দু রাজাদের নিকট জয়সিংহের ব্রাহ্মণ-দূতগণ গিয়া অনুরোধ করিল যে, এই সুযোগে তাঁহারা পুরাতন শত্রু বিজাপুর-রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা আক্রমণ করুন। কোঁকনের উত্তরে কোলী-দেশের ছোট ছোট সামন্তদিগকে মুঘলপক্ষে আনিবার জন্য জয়সিংহের তোপখানার ফিরিঙ্গী সেনানী নিকোলো মানুশীকে পাঠান হইল।

দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের সঙ্গে শিবাজীর কোন সময়ে শত্রুতা ছিল, জয়সিংহ তাহাদের ডাকিয়া নিজ সৈন্যদলে স্থান দিলেন। মৃত আফজল খাঁর পুত্র ফজল খাঁ এবং চন্দ্র রাও মোরের পুত্র বাজী চন্দ্ররাও পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার এই সুযোগ ছাড়িল না। সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা এবং মুঘল-রাজ্যে উচ্চ পদলোভের লোভ দেখাইয়া শিবাজীর কোন কোন কর্ম্মচারীকে ভাঙ্গাইয়া আনা হইল।

তাহার পর বিজাপুররাজকে লোভ ও ভয় দেখান হইল; যদি তিনি সত্যসত্যই মুঘলদের সাহায্য করেন তবে বাদশাহ আর তাঁহাকে শিবাজীর গোপন সহায়ক বলিয়া সন্দেহ করিবেন না এবং বার্ষিক করের টাকাও কিছু মাফ করিতে পারেন, এই আশ্বাস দেওয়া হইল। কিন্তু জয়সিংহের কৃতিত্বের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি নিজে যে প্রণালীতে যুদ্ধ চালাইবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে বাদশাহর প্রথম আপত্তি কাটাইয়া দিয়া অনুমোদন লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি। তাঁহার পুণায় পৌঁছিতে মার্চ্চ মাস আসিল, আর জুলাই হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে

যুদ্ধ চালান অসম্ভব হইবে; সুতরাং শিবাজীকে পরাস্ত করিতে হইলে ইহার মধ্যবর্ত্তী তিন মাসেই সে-কাজটি সম্পূর্ণ করা দরকার, নচেৎ আবার আটমাস বসিয়া থাকিতে হইবে। এজন্য জয়সিংহ স্থির করিলেন, সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া সবেগে মারাঠারাজ্যের কেন্দ্রে প্রচণ্ড আঘাত করিবেন, অন্যত্র যাইবেন না, বা সৈন্য চারিদিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তি হানি করিবেন না। বাদশাহ তাঁহাকে ধনশালী উর্ব্বর কোঁকন প্রদেশ আক্রমণ করিতে বারবার বলেন, কিন্তু জয়সিংহ দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করেন এবং এই যুক্তি দেন যে, মহারাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড পুণা অঞ্চল নিষ্কণ্টক করিয়া হাত করিতে পারিলেই কোঁকন প্রভৃতি দূরের অঙ্গগুলি আপনা হইতে বশে আসিবে।

সর্ব্বশেষে জয়সিংহ বলিলেন যে, যুদ্ধে দুই-তিনজন প্রধানের হাতে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিলে, একমাত্র সর্ব্বোচ্চ সেনাপতির কর্তৃত্বে সকলকে না রাখিলে, জয়লাভ অসম্ভব। বাদশাহ এই সৎ যুক্তি মানিয়া লইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, সৈন্য-বিভাগের সমস্ত নিয়োগ, কর্ম্মচ্যুতি, উন্নতি অবনতি, রসদ ও তোপ, সন্ধি করা ও ঘুষ দেওয়া,—সকল কাজেই একমাত্র জয়সিংহের হুকুম চলিবে, আওরঙ্গাবাদের সুবাদার কুমার মুয়জ্জমের নিকট কোন বিষয়ে মঞ্জুরী লওয়া বা আপিল করার প্রয়োজন হইবে না।

পুরন্দর-দুর্গ অবরোধ

দিল্লী হইতে বিদায় লইয়া, সৈন্যসহ দ্রুত কুচ করিয়া, পথের কোথাও অনাবশ্যক একদিনের জন্যও বিশ্রাম না করিয়া জয়সিংহ ৩রা মার্চ্চ পুণায় পৌঁছিলেন। প্রথমেই পুরন্দর আক্রমণ করা সাব্যস্ত করিলেন।

পুণা শহরের চব্বিশ মাইল দক্ষিণে পুরন্দর-দুর্গ। ইহাকে দুর্গ না বলিয়া সুরক্ষিত মহান্ গিরিসমষ্টি বলিলেই ঠিক হয়। নিজ পুরন্দরের চূড়া সমভূমি হইতে দুই হাজার পাঁচশত ফীট উঁচু; ইহাই বালা-কেল্লা বা উপরের দুর্গ, চারিপাশ খাড়া পাথর কাটা। আর ইহার তিনশত ফীট নীচে পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচের দুর্গ (মারাঠা ভাষায় মাচী বলা হয়)। এই মাচীতে সৈন্যদের থাকিবার ঘর ও কার্য্যালয়, কারণ এটি বেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বদিকে মাচীর কোণ হইতে এক মাইল লম্বা একটি সরু পাহাড়, তাহার শেষভাগ দেওয়ালে ঘেরা রুদ্রমালা বা বজ্রগড় নামে অপর একটি দুর্গ। এই বজ্রগড় হইতে মাচীর উপর গোলা বর্ষণ করিয়া সহজেই সেখান হইতে শত্রুদের তাড়াইয়া দেওয়া যায়।

পুণায় থাকিবার সময় আবশ্যক মত নানা স্থানে অল্প অল্প সৈন্য দিয়া থানা বসাইয়া জয়সিংহ নিজ পথঘাট রক্ষা করিলেন; তাহার পর ২৩এ মার্চ্চ রওনা হইয়া ৩০এ তারিখে পুরন্দরের সামনে আসিয়া পৌঁছিলেন। পরদিন হইতে রীতিমত দুর্গ অবরোধ আরম্ভ হইল। বিভিন্ন বাদশাহী সেনাপতিরা নিজ দলবল সহিত পুরন্দরের নানা দিকে আড্ডা করিয়া মুর্চা খুঁড়িয়া দুর্গের উপর তোপ দাগিবার চেষ্টা করিলেন। দিন-দশের মধ্যেই সৈন্যদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং জয়সিংহের নিয়ত তত্ত্বাবধান এবং উৎসাহদানের ফলে তিনটি খুব বড় কামান একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর টানিয়া তোলা হইল এবং রুদ্রমালের বুরুজের উপর ভারি ভারি গোলাবর্ষণ শুরু হইল। তাহার ফলে বুরুজের সামনের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়া একটি প্রবেশের পথ দেখা দিল।

রুদ্রমাল ও বুরুজ জয় হইল

১৩ই এপ্রিল দুপুর বেলা দিলির খাঁ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া এই বুরুজটি দখল করিলেন; মারাঠারা হটিয়া গিয়া মধ্যের একটি দেওয়াল-ঘেরা স্থানে আশ্রয় হইল। পরদিন বৈকালে মুঘল ও রাজপুতদের বন্দুকের গুলিতে অতিষ্ঠ হইয়া মারাঠারা সমস্ত রুদ্রমাল ছাড়িয়া দিল। জয়সিংহ তাহাদের প্রাণদান করিলেন। এবং তাহাদের নেতাদের সম্মানসূচক পোষাক দিয়া বাড়ী ফিরিতে অনুমতি দিলেন।

তাহার পর (২৫ এপ্রিল) দায়ুদ খাঁর অধীনে ছয় হাজার সৈন্য দিয়া তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে গ্রাম লুটিতে পাঠাইলেন। আর কুতবুদ্দীন খাঁ এবং লোদী খাঁকেও নিজ নিজ থানা হইতে বাহির হইয়া নিকটের গ্রাম লুটিতে এবং গরুবাছুর কৃষক বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহার ফলে শিবাজীর প্রজাদের সমূহ ক্ষতি ও তাঁহার দেশের স্থায়ী অনিষ্ট হইল।

সম্মুখে এবং চারি পাশে এইরূপ বিপদ দেখিয়া মারাঠারা পুরন্দর-অবরোধকারীদের তাড়াইয়া দিবার নানা চেষ্টা করিল। মুঘল-প্রদেশের স্থানে স্থানে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু জয়সিংহ পুরন্দর হইতে নড়িলেন না, দূরে আক্রান্ত স্থানগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু অশ্বারোহী পাঠাইলেন মাত্র। মুঘলদের অনেক ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু আসল কাজ পুরন্দর-অবরোধের কোন বাধা হইল না, সেখানে রসদ আসিতে লাগিল এবং শিবির ও সৈন্যদল নিরাপদ রহিল।

বজ্রগড় জিতিবার পরই দিলির খাঁ সেখান হইতে ঐ লম্বা পর্ব্বত বাহিয়া পশ্চিম দিকে আসিয়া পুরন্দরের উত্তর পূর্ব্ব কোণের উচ্চ বুরুজের (নাম 'খড়কালা'র) কাছে পৌঁছিয়া নীচের দুর্গের (মাচীর) উপর গোলা ফেলিতে লাগিলেন। মারাঠারা দুই দুইবার রাত্রে বাহির হইয়া আসিয়া এইখানের মুর্চাগুলি আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের পরাস্ত হইয়া ফিরিতে হইল।

ক্রমে ক্রমে মুঘলদের মুর্চা পুরন্দরের "সাদা বুরুজ" দুটির নিকটে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু তখনও দেওয়াল খাড়া ছিল, তাহার উপর হইতে মারাঠারা নীচে জ্বলন্ত আলকাতরা, বারুদের থলি, বোমা এবং পাথর ফেলিয়া অবরোধকারীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। তখন জয়সিংহ একটি উঁচু কাঠের রথ প্রস্তুত করিয়া সাদা বুরুজের সামনে খাড়া করিলেন (৩০এ মে); তাহার উপর হইতে কামান দাগা হইবে, এবং বন্দুক ছুঁড়িয়া দেওয়াল হইতে রক্ষাকারীদের হটাইয়া দেওয়া হইবে, আর শত্রুদের গুলি রোধ করিবার জন্য রথের সম্মুখে কাঠের আবরণ থাকিবে।

এই রথ সম্পূর্ণ হইবার আগেই, সন্ধ্যার দুঘণ্টা মাত্র বাকী আছে এমন সময়, দিলির খাঁকে না জানাইয়াই রুহিলা সৈন্যদল "সাদা বুরুজ" আক্রমণ করিল। শত্রুরা তাহাদের মারিতে আসিল, কিন্তু শীঘ্রই মুঘলপক্ষ হইতে আরও লোক আসায় ভীষণ যুদ্ধের পর মুঘলদের জয় হইল, তাহারা সাদা বুরুজ দখল করিল, মারাঠারা "কাল বুরুজের" পিছনে হটিয়া গিয়া বোমা, পাথর ইত্যাদি ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু মুঘলেরা নড়িল না। তাহার দুইদিন পরে, মুঘল-তোপের আওয়াজ সহ্য করিতে না পারিয়া মারাঠারা কাল বুরুজও ছাড়িয়া দিল। এইরূপে ক্রমে পাঁচটি বুরুজ এবং একটি কাঠগড়া (ষ্টকেড্) বাদশাহী সৈন্যদের হাতে পড়িল।

পুরন্দরে মারাঠাদের লোকনাশ ও বিপদ

এখন আর পুরন্দর রক্ষা করা অসম্ভব। ইহার পূর্ব্বেই একদিন দুর্গস্বামী মুরার বাজী প্রভু (কায়স্থ) নিজ মাব্‌লে পদাতিক লইয়া দিলির খাঁর পাঠানদের উপর মরিয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই পক্ষে অনেকে হতাহত হইল; মুরার বাজীর তরবারির সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না,অবশেষে ষাটজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া তিনি দিলির খাঁকে আক্রমণ করিলেন। দিলির তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, “সৈন্যগণ! উহাকে কেহ মারিও না। আর মুরার! তুমি ধরা দাও, তোমাকে উচ্চ পদ দিব।” কিন্তু মুরার থামিলেন না, তখন দিলির তাঁহাকে তীর দিয়া বধ করিলেন। মুরারের সঙ্গে তিনশত মাব্‌লে ধরাশায়ী হইল; পাঠানপক্ষে পাঁচশতজন। কিন্তু তবুও মারাঠাদের সাহস কমিল না; তাহারা বলিতে লাগিল, “এক মুরার বাজী মারা গিয়েছে ত কি হইল? আমরাও তাহার সমান, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে যুদ্ধ চালাইব।”

কিন্তু জয়সিংহের অধ্যবসায় এবং দুইমাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ফলে পুরন্দর-রক্ষীদের অনেক বলক্ষয় হইল। যখন রুদ্রমাল গেল, পাঁচটি বুরুজ ও একটি কাঠগড়া গেল, তখন সমগ্র দুর্গটি হস্তচ্যুত হইবার দিন ঘনাইয়া আসিল। শিবাজী দেখিলেন, এখন সন্ধি না করিলে মুঘলেরা বলে পুরন্দর অধিকার করিবে এবং সেখানে যেসমস্ত মারাঠা কর্ম্মচারী আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের বধ এবং তাহাদের স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মনাশ করিবে। আর বাহিরেও দায়ুদ খাঁ প্রতিদিন তাঁহার গ্রাম ধ্বংস করিতেছেন।

জয়সিংহ পুণায় পৌঁছিবার আগেই শিবাজী ক্রমাগত তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ-দূত ও চিঠি পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু জয়সিংহ তাহার কোন উত্তর দেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে, যতক্ষণ শিবাজীকে বাহুবলে জব্দ করা না যাইবে ততক্ষণ তিনি সত্যসত্যই বশ মানিবেন না। কিন্তু ২০এ মে শিবাজীর পণ্ডিত রাও (অর্থাৎ দানাধ্যক্ষ) রঘুনাথ বল্লাল আসিয়া গোপনে জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি পাইলে সন্ধি করিতে প্রস্তুত?” মুঘল-প্রতিনিধি উত্তর করিলেন, “শিবাজী স্বয়ং আসিয়া বিনা শর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাহার পর তাঁহার প্রতি বাদশাহর অনুগ্রহ দেখান হইবে।”

শিবাজী-জয়সিংহের সাক্ষাৎ

এই কথা শুনিয়া শিবাজী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পুত্র শম্ভুজী আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে চলিবে কি? জয়সিংহ উত্তর দিলেন, “না, শিবাজীকে নিজে আসিতে হইবে।” অবশেষে শিবাজী চাহিলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পর সন্ধি হউক বা না হউক, তাঁহাকে নিরাপদে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে বলিয়া জয়সিংহ ধর্ম্ম-শপথ করুন। জয়সিংহ তাহাই করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, শিবাজী যেন অতি গোপনে আসেন, কারণ বাদশাহ রাগিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত সন্ধির কোন কথাবার্তা না বলিয়া নির্ম্মম যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

এই বন্দোবস্ত করিয়া ৯ই জুন রঘুনাথ পণ্ডিত নিজ প্রভুর নিকট ফিরিলেন। ১১ই তারিখে বেলা এক প্রহর হইয়াছে, জয়সিংহ নিজ শিবিরে দরবার করিতেছেন, এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শিবাজী শুধু ছয়জন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া পালকী করিয়া অতি নিকটে পৌঁছিয়াছেন। জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুন্সী উদয়রাজ এবং জ্ঞাতি উগ্রসেন কাছোয়াকে শিবাজীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন, “যদি আপনার সব দুর্গগুলি সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আসুন, নচেৎ

ঐখান হইতেই ফিরিয়া যান।” শিবাজী “আচ্ছা! আচ্ছা!” বলিয়া উহাদের সঙ্গে আসিলেন। শিবির-দ্বারে পৌঁছিলে, জয়সিংহের সর্ব্বপ্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী বখ্‌শী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিলেন। রাজপুত রাজা স্বয়ং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হাতে ধরিয়া নিজের পাশে গদীর উপর বসাইলেন। তাঁহার রাজপুত রক্ষিগণ তরবার ও বল্লম হাতে করিয়া চারিদিকে সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কি জানি যদি বা আবার আফজল খাঁর মত কাণ্ড হয়!

চতুর জয়সিংহ শিবাজীকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন তিনি দিলির খাঁ ও কীরত সিংহকে হুকুম দিয়াছিলেন যে, তাঁহার তাম্বু হইতে সঙ্কেত-চিহ্ন দেখিলেই তাঁহারা মুর্চা হইতে ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া পুরন্দরের খড়কালা নামক অংশ দখল করিবেন। শিবাজী পৌঁছামাত্র জয়সিংহ সেই সঙ্কেত করিলেন, আর মুঘলেরা লড়িয়া ঐ স্থানটি দখল করিল, আশীজন মারাঠা মারা গেল, আরও অনেক জখম হইল। এই যুদ্ধটি জয়সিংহের তাম্বুর ভিতর হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। শিবাজী ঘটনাটা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়া বলিলেন, “আর বৃথা আমার লোকহত্যা করিবেন না, যুদ্ধ বন্ধ করুন, আমি এখনই পুরন্দর ছাড়িয়া দিতেছি।” তখন জয়সিংহ তাঁহার মীরতুজুক ঘাজীবেগকে পাঠাইয়া দিলির খাঁকে রণে ক্ষান্ত হইতে হুকুম দিলেন; সেই সঙ্গে শিবাজী নিজ কর্ম্মচারী পাঠাইয়া মারাঠা দুর্গস্বামীকে পুরন্দর সমর্পণ করিতে বলিলেন। দুর্গবাসীরা জিনিসপত্র গুছাইতে একদিন সময় চাহিল।

পুরন্দরের সন্ধির শর্ত্ত

শিবাজী বিছানা আসবাবপত্র কিছুই সঙ্গে না লইয়া একেবারে খালি হাতে আসিয়াছিলেন। সেজন্য জয়সিংহ তাঁহাকে অতিথি করিয়া নিজ দরবার-তাম্বুতে বাসা দিলেন। দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধির শর্ত্ত লইয়া দর কষাকষি চলিতে লাগিল। জয়সিংহ প্রথমে কিছুই ছাড়িবেন না, অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, শিবাজীর তেইশটি দুর্গ এবং তদসংলগ্ন সমস্ত জমি (যাহার বার্ষিক খাজনা চারিলক্ষ হোণ অর্থাৎ বিশ লক্ষ টাকা) বাদশাহ পাইবেন, আর বারোটি দুর্গ (এবং তদসংলগ্ন এক লক্ষ হোণের জমি) শিবাজীর থাকিবে। কিন্তু শিবাজী বাদশাহর প্রজা বলিয়া নিজেকে মানিবেন এবং তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবেন।

তবে এক বিষয়ে শিবাজীকে অপমান হইতে রক্ষা করা হইল। তাঁহাকে নিজে মন্‌সবদার হইয়া সৈন্য লইয়া বাদশাহর বা দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির দরবারে হাজির হইতে হইবে না, তাঁহার পুত্র পাঁচ হাজারী জাগীরের অনুযায়ী (প্রকৃতপক্ষে দুই হাজার) সৈন্য লইয়া উপস্থিত থাকিবেন। উদয়পুরের মহারাণাকেও এই অনুগ্রহ দেখান হইত। জয়সিংহ জানিতেন যে, বেশী কড়াকড়ি করিলে শিবাজী হতাশ হইয়া বিজাপুরের সঙ্গে যোগ দিবেন।

পুরন্দরের সন্ধিতে আর একটি গোপনীয় শর্ত্ত ছিল। কোঁকন অর্থাৎ পশ্চিমঘাট এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী অতি লম্বা সরু কিন্তু ধনজনপূর্ণ প্রদেশটি বিজাপুরের অধীন ছিল। শীঘ্রই বাদশাহ বিজাপুর-রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তখন শিবাজী বিজাপুরের হাত হইতে তলভূমি (তল্‌-কোঁকন বা বিজাপুরী পাইন্‌-ঘাট)-র চারি লক্ষ হোণ আয়ের জমি এবং অধিত্যকা (অর্থাৎ বিজাপুরী বালাঘাট)-এর পাঁচলক্ষ হোণ আয়ের জমি নিজ সৈন্য দ্বারা কাড়িয়া লইবেন, এবং বাদশাহ ইহাতে তাঁহার অধিকার স্বীকার করিবেন, কিন্তু তজ্জন্য শিবাজী তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ হোণ (অর্থাৎ দুই কোটি টাকা) তের কিস্তিতে

সেলামী দিবেন। এইরূপে জয়সিংহের কূটনীতির ফলে শিবাজী ও আদিল শাহর মধ্যে স্থায়ী কলহের বীজ রোপিত হইল।

শিবাজী মুঘলরাজের বাধ্যতা স্বীকার করিলেন

দিলির খাঁ প্রাণপণ পরিশ্রম এবং রক্তপাত করিয়া পুরন্দরের অনেক অংশ দখল করিয়াছেন, আর এদিকে শিবাজী আসিয়া চুপ করিয়া দুর্গটি জয়সিংহের হাতে ছাড়িয়া দিয়া খাঁকে গৌরব হইতে বঞ্চিত করিলেন। তিনি রাগিয়া বলিলেন যে, সন্ধিতে রাজি হইবেন না, শেষ অবধি মারাঠাদের ধ্বংস করিবেন। সুতরাং জয়সিংহ পরদিন (১২ই জুন) শিবাজীকে হাতীতে চড়াইয়া নিজ কর্ম্মচারী রাজা রায়সিংহ শিশোদিয়ার সহিত দিলির খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই নম্রতায় দিলির খাঁ আপ্যায়িত হইলেন। তিনি শিবাজীকে নানা উপহার দিয়া সঙ্গে করিয়া জয়সিংহের তাঁবুতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া রাজপুত রাজার হাতে সঁপিয়া দিলেন। মুঘল সৈন্যগণ হাতীর উপর শিবাজীকে দেখিয়া বুঝিল যে, সত্যসত্যই তাহাদের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে।

তাহার পর জয়সিংহ শিবাজীকে খেলাৎ পরাইয়া তাঁহার কোমরে নিজের তরবারি বাঁধিয়া দিলেন, কারণ শিবাজী সন্ধি করিবার জন্য নিরস্ত্র হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ তরবারিটা পরিয়া পরে কোমর হইতে খুলিয়া জয়সিংহের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'আমি বাদশাহর বাধ্য কিন্তু অস্ত্রহীন দাস হইয়া তাঁহার কাজ করিব।"

এইদিন মারাঠারা পুরন্দর-দুর্গ ছাড়িয়া দিল; তাহাদের চারি হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার স্ত্রীলোক বালক ও চাকর বাহির হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সমস্ত অস্ত্র গোলা বারুদ ও সম্পত্তি বাদশাহর জব্‌ৎ হইল। অপরাপর দুর্গ সমর্পণ করিবার জন্য শিবাজী মুঘল-কর্ম্মচারীদের সহিত নিজ চাকর পাঠাইয়া দিলেন। ১৪ই জুন, জয়সিংহের নিকট হইতে একটি হাতী ও দুইটি ঘোড়া উপহার পাইয়া শিবাজী বিদায় লইলেন। ১৮ই তারিখে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী রাজগড় হইতে আসিয়া জয়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন।

এইরূপে জয়সিংহ আশ্চর্য্য জয়লাভ করিলেন।

বিজাপুর-আক্রমণে শিবাজীর সহায়তা ও কীর্ত্তি

পুরন্দরের সন্ধির শর্ত্তগুলি জানিয়া এবং শিবাজী নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ মাত্রায় পালন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া, বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া সব প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং নিজ পাঞ্জা-অঙ্কিত (অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলগুলি সিন্দুরে ডুবাইয়া কাগজের উপর ছাপ দেওয়া) এক ফর্ম্মান (বা বাদশাহর নিজের জবানীতে লিখিত ও সহি করা পত্র) এবং একপ্রস্থ খেলাৎ শিবাজীর জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এগুলি ৩০এ সেপ্টেম্বর জয়সিংহের শিবিরের নিকট পৌঁছিল। শিবাজী জয়সিংহের আহ্বানে কয়েক মাইল হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বাদশাহী ফর্ম্মানকে পথে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পত্রখানি মাথার উপর ধরিলেন। (ইহাই সে যুগের প্রথা ছিল।) সন্ধির পর হইতে এই সাড়ে তিন মাস শিবাজী অস্ত্রধারণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অপরাধী হইয়াছেন, যতক্ষণ

পর্য্যন্ত বাদশাহর ক্ষমা না পাওয়া যায় ততক্ষণ জেলখানার কয়েদীর মত তাঁহাকে নিরস্ত্র থাকিতে হইবে। এখন ফর্ম্মান পাইবামাত্র জয়সিংহ তাঁহাকে জোর করিয়া নিজের একখানি মণিখচিত তরবারি এবং ছোরা পরাইয়া দিলেন।—যেন শিবাজীর বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইল!

ইহার পর জয়সিংহ নিজ বিজয়ী সেনা লইয়া বিজাপুর-রাজ্য আক্রমণ করিবেন। কথা ছিল, শিবাজী নিজ পুত্রের মন্‌সবের দুই হাজার অশ্বারোহী এবং অতিরিক্ত সাত হাজার মাব্‌লে পদাতিক লইয়া স্বয়ং জয়সিংহের সহায়তা করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইল। অবশেষে ২০এ নবেম্বর ১৬৬৫ জয়সিংহ বিজাপুর-অভিযানে রওনা হইলেন। শিবাজী এবং তাঁহার সেনাপতি নেতাজী পালকরের অধীনে নয় হাজার মারাঠা-সৈন্য মুঘলদলের মধ্যবিভাগের বাম পাশে স্থান পাইল।

যাইতে যাইতে শিবাজীর ডাকে বিনাযুদ্ধে, বিজাপুরের অধীন কয়েকটি দুর্গ পাওয়া গেল (যথা—ফল্‌টন্‌, থাথ্‌বড়া, খাটাব এবং মঙ্গলভিড়ে)। এই শেষ স্থান হইতে বিজাপুর শহর বাহান্ন মাইল দক্ষিণে। ইহার অর্দ্ধেক পথ পার হইতেই বিজাপুরী সৈন্যদল মুঘলদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কয়েক বার অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিবাজী ও নেতাজী প্রাণপণে মুঘলপক্ষে লড়িলেন, আর শত্রুদের দলে শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যঙ্কাজী বীরত্ব দেখাইলেন। একদিন শিবাজী ও জয়সিংহের পুত্র কীরত সিংহ এক হাতীতে চড়িয়া মুঘল-অগ্রবাহিনী সৈন্য লইয়া বিজাপুরীদল ভেদ করিলেন, আর একদিন নেতাজী অদম্য সাহসে মুঘল-সৈন্যের ফিরিবার সময় পশ্চাদ্ভাগ শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপে অগ্রসর হইয়া ২৯এ ডিসেম্বর জয়সিংহ বিজাপুর-দুর্গের দশ মাইল উত্তরে পৌঁছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার গতিরোধ হইল, এবং এখান হইতে সাত দিন পরে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। বিজাপুর-রাজসভার কর্ম্মচারী ও ওমরাহদের মধ্যে ঝগড়ার সুযোগে তিনি তাহাদের অনেককে ঘুষ দিয়া হাত করিয়াছিলেন, সুতরাং এই সময় রাজধানী হঠাৎ আক্রমণ করিলে মদ্যপায়ী অকর্ম্মণ্য যুবক রাজা কোনই বাধা দিতে পারিবেন না, বিনা অবরোধে বিজাপুর-দুর্গ অধিকার করা যাইবে এই আশায় জয়সিংহ বড় বড় তোপ এবং দুর্গজয়ের অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে আনেন নাই। কিন্তু কাছে পৌঁছিয়া তিনি শুনিলেন যে, আদিল শাহর বীর সেনানীগণ দুর্গরক্ষার সমস্ত জোগাড় করিয়া, বিজাপুরের চারিদিকে সাত মাইল পর্য্যন্ত গাছ কাটিয়া জলাশয় শুকাইয়া গ্রাম ক্ষেত উৎসন্ন করিয়া মুঘলদের অগ্রসর হইবার পথ রোধ করিয়াছেন। আর একদল বিজাপুরী সৈন্য তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বাদশাহী প্রদেশে প্রবেশ করিয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন জয়সিংহ হতাশ হইয়া ৫ই জানুয়ারি ১৬৬৬, পশ্চাৎ ফিরিলেন, এবং ক্রমে নিজ সীমানায় পরেণ্ডা দুর্গের কাছে পৌঁছিলেন। এইরূপে বিজাপুর-অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হইল।

শিবাজীর উপর মুসলমান সৈন্যদের আক্রোশ

এই আশাভঙ্গ হওয়াতে মুঘল-সৈন্যদলের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সকলেই এই পরাজয় ও ক্ষতির জন্য জয়সিংহকে দোষ দিতে লাগিল। দিলির খাঁ আগে হইতেই জয়সিংহকে অমান্য করিতেন। এখন তিনি বলিতে লাগিলেন যে, শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিজাপুর জয় করা ঘটিল না, শিবাজীকে মারিয়া ফেলিতে হইবে; শিবাজী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, দ্রুত কুচ্‌ করিয়া অগ্রসর হইলে দশ দিনের মধ্যেই ঐ দুর্গ মুঘলদের হাতে আসিবে, এখন কেন তাহা হইল না?

ইহার পূর্ব্বেও পুরন্দরের সন্ধির পর দিলির খাঁ অনেকবার জয়সিংহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, “এই সুযোগে শিবাজীকে খুন করিয়া ফেলুন; অন্ততঃ আমাকে সে কাজটা করিতে অনুমতি দিন; আমি এই পাপের সমস্ত ভার নিজের উপর লইব, কেহই আপনাকে দোষী করিবে না।”

জয়সিংহ দেখিলেন যে, উন্মত্ত মুসলমান সেনানীদের হাত হইতে শিবাজীর প্রাণ রক্ষা করা কঠিন। অমনি পথ হইতে ১১ই জানুয়ারি শিবাজীকে নিজ সৈন্যসহ বিজাপুর-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশটি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন, মুখে বলিলেন যে এইরূপে শত্রুসেনা ভাগ হইয়া যাইবে, মুঘলদিগের উপর তাহাদের সমস্ত আক্রমণটা পড়িবে না। জয়সিংহের পাশ হইতে রওনা হইবার পাঁচদিন পরে শিবাজী পনহালা-দুর্গের কাছে পৌঁছিলেন, এবং রাত্রি এক প্রহর থাকিতে হঠাৎ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্গের সৈন্যগণ আগেই টের পাইয়া সজাগ ছিল, তাহারা মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিল। শিবাজীর পক্ষে এক হাজার মারাঠা হতাহত হইয়া পড়িল। তাহার পর সূর্য্য উঠিল; পর্ব্বতের গা বাহিয়া যে মারাঠারা চড়িতেছিল তাহাদের স্পষ্ট দেখা গেল, এবং তাহাদের উপর ঠিক গুলি ও পাথর আসিয়া পড়িতে লাগিল (১৬ জানুয়ারি)। তখন শিবাজী হার মানিয়া চৌদ্দ ক্রোশ দুরে নিজ দুর্গ খেল্‌নায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে তাঁহার লোকদের লুটপাট বন্ধ করিবার জন্য ছয় হাজার বিজাপুরী সৈন্য এবং দুইজন বড় সেনাপতি সেখানে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

মারাঠা সৈন্যদলে শিবাজীর পরেই নেতাজী পালকর সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ। তাঁহার উপাধি “সেনাপতি” এবং তিনি শিবাজীর বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। লোকমুখে তাঁহাকে “দ্বিতীয় শিবাজী” বলা হইত। বিজাপুর হইতে চার লক্ষ হোণ ঘুষ পাইয়া তিনি এই সময় হঠাৎ মুঘলপক্ষ ছাড়িয়া আদিল শাহর সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং মুঘল অধীন গ্রাম শহর লুটিতে লাগিলেন। জয়সিংহ আর কি করেন? তিনি পাঁচ হাজারী মনসব, বিস্তৃত জাগীর, এবং নগদ আটত্রিশ হাজার টাকা দিয়া নেতাজীকে আবার নিজের দলে ফিরাইয়া আনিলেন (২০ মার্চ্চ ১৬৬৬)।

ইহার পূর্ব্বে চারিদিকে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া জয়সিংহ বাদশাহকে লিখিয়াছিলেন যে, এই সময়ে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিলে শিবাজীকে মুঘল-রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়া, তিনি দাক্ষিণাত্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আওরংজীব সম্মত হইলেন। তখন জয়সিংহ অনেক আশা-ভরসা ও স্তোকবাক্য দিয়া শিবাজীকে বাদশাহর দরবারে যাইবার জন্য রাজি করাইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : শিবাজী ও আওরংজীবের সাক্ষাৎ

শিবাজীর আগ্রা যাইবার উদ্দেশ্য

পুরন্দরের সন্ধিতে (জুন ১৬৬৫) শিবাজী এই একটি শর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য করদ-রাজার মত, তাঁহাকে স্বয়ং গিয়া বাদশাহর দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে না। তবে দাক্ষিণাত্যে কোন যুদ্ধ বাধিলে তিনি বাদশাহী পক্ষকে সসৈন্য সাহায্য করিবেন। কিন্তু বিজাপুর-আক্রমণের পর (জানুয়ারি ১৬৬৬) জয়সিংহ নানা যুক্তি দেখাইয়া শিবাজীকে বুঝাইলেন যে, বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার অনেক প্রকার লাভ হইবে। ফন্দিবাজ রাজপুত-রাজা শিবাজীর খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এরূপ চতুর ও কর্ম্মক্ষম বীরের সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া বাদশাহ হয়ত তাঁহাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ে নিযুক্ত করিবেন, এবং সেই অবসরে শিবাজী নিজামশাহী অর্থাৎ আহমদ-নগরের লুপ্ত রাজ্যের বাকী প্রদেশগুলি দখল করিয়া তথায় তাঁহার অধিকার নিষ্কণ্টক ও স্থায়ী করিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত কোন মুঘল সেনাপতিই বিজাপুরকে কাবু করিতে পারেন নাই, এমন কি স্বয়ং আওরংজীব যখন যুবরাজ, তখন তিনিও বিফল হইয়াছিলেন। এ কাজ কেবল শিবাজীর পক্ষেই সম্ভব।

শিবাজীরও কয়েকটি প্রার্থনা ছিল; বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হাত করিতে না পারিলে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, জঞ্জিরার জলবেষ্টিত দুর্গ দখলে না আসিলে শিবাজীর কোঁকন-রাজ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হয় না; অথচ উহার হাব্‌শী মালিক সিদ্দি শিবাজীর হস্তে দুর্গটি সমর্পণ করিতে একেবারে অসম্মত; শিবাজীও তাহা অধিকার করিতে গিয়া বার-বার পরাস্ত হইয়াছেন। সিদ্দি এখন বাদশাহর অধীন হইয়াছে, তাঁহার ভয়-ভরসা রাখে; সুতরাং বাদশাহ্‌র হুকুম পাইলে সে ঐ দুর্গ শিবাজীকে দিতে বাধ্য হইবে। এ বিষয়ে দিল্লীতে দরখাস্ত পাঠাইয়া শিবাজী কোনই ফল পান নাই। স্বয়ং সাক্ষাৎ করিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা।

কিন্তু দিল্লীতে যাইবার কথায় প্রথমে শিবাজীর ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মনে মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। একে ত তিনি বনজঙ্গলে ও গ্রামে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত, কখন নগর বা রাজসভা দেখেন নাই। তাহার উপর, তাঁহাদের চক্ষে যবন বাদশাহ রাবণের অবতার, হাতে পাইয়া আওরংজীব যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে বন্দী করেন বা মারিয়া ফেলিবার হুকুম দেন, তখন কি হইবে? কিন্তু জয়সিংহ কঠিন শপথ করিয়া বলিলেন যে, বাদশাহ সত্যবাদী, এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার

জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রামসিংহ দরবারে থাকিয়া শিবাজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। শিবাজী দেখিলেন, দিল্লীতে গেলে মোটের উপর ভয় অপেক্ষা লাভের আশাই বেশী।

শিবাজীর আগ্রাযাত্রা—দেশে বন্দোবস্ত ও পথের কথা

যাহা হউক, পাছে মুঘল রাজধানীতে যাইবার পর কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় শিবাজী রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্যের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন যে, স্বদেশে তাঁহার অনুপস্থিতির সময়েও মারাঠাদের কোন ক্ষতি হইবে না; সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কাজ চালাইবে, অভ্যস্ত নিয়ম-মত রাজ্যরক্ষা করিবে,—কোনও বিষয়ে নূতন হুকুমের প্রতীক্ষায় প্রভুর মুখ চাহিয়া অসহায় অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। শিবাজীর মাতা জীজা বাঈ রাজপ্রতিনিধি হইয়া সকলের উপরে রহিলেন। তাঁহার সহকারী হইলেন তিনজন—মোরেশ্বর ত্র্যম্বক পিংলে পেশোয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী, নিলো সোনদেব মজমুয়াদার অর্থাৎ হিসাব পরীক্ষক, এবং নেতাজী পালকর সেনাপতি। রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, প্রত্যেক দুর্গ পরীক্ষা করিয়া, সর্ব্বত্র রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া, কর্ম্মচারিগণকে দিবারাত্র সতর্ক ও কার্য্যতৎপর থাকিতে এবং তাঁহার নিয়মাবলী পূর্ণমাত্রায় পালন করিতে বারবার বলিয়া দিয়া, শিবাজী ৫ই মার্চ্চ ১৬৬৩ তারিখে মাতা ও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া রাজগড় হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে চলিল—পুত্র শম্ভুজী, কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী, এবং এক হাজার শরীর-রক্ষী সৈন্য। তাঁহার পথ-খরচের জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজকোষ হইতে একলক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইল। ইহার আগেই শিবাজীর দূতস্বরূপ রঘুনাথ বল্লাল কোর্ডে এবং সোনাজী পন্ত দবীর্ বাদশাহর দরবারে যাত্রা করিয়াছিলেন।

উত্তর-ভারতে যাইবার পথে শিবাজী প্রথমে আওরঙ্গাবাদ শহরে পৌঁছিলেন। তাঁহার খ্যাতি এবং সৈন্যদের জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জার কথা শুনিয়া নগরবাসীরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের দর্শনলাভের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু স্থানীয় মুঘল শাসনকর্ত্তা সফ্‌শিকন্ খাঁ ভাবিলেন যে, শিবাজী সামান্য জমিদার এবং বুনো মারাঠামাত্র; তিনি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন যে শিবাজী যেন তাঁহার কাছারীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই অপমানসূচক ব্যবহারে শিবাজী অত্যন্ত রাগিয়া, সফ্‌শিকন্ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় একেবারেই কাণ না দিয়া, সোজা শহরের মধ্যে নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; ভাবটা দেখাইলেন যেন ঐ শহরের শাসনকর্ত্তা মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত নয়। সফ্‌শিকন্ বুঝিলেন, এ বড় শক্ত লোক; তিনি অমনি নরম হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত গিয়া শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপে নিজ মর্য্যাদা সকলের সামনে রক্ষা করিবার পর, শিবাজীর আর রাগ রহিল না। তিনি পরদিন গিয়া সফ্‌শিকনের আগমনের প্রতিদান, এবং মুঘল কর্ম্মচারিদিগকে ভদ্রতার জন্য আপ্যায়িত করিলেন।

কয়েক দিন তথায় থাকিয়া, শিবাজী আবার উত্তর-মুখে চলিলেন। বাদশাহর হুকুম অনুসারে পথে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে রসদ ও নানা উপহার আনিয়া দিল। এইরূপে তিনি ১ই মে আগ্রার নিকট পৌঁছিলেন। বাদশাহ তখন আগ্রা শহরে বাস করিতেছেন। যে আট বৎসর শাহজাহান আগ্রা-দুর্গে বন্দীভাবে ছিলেন, আওরংজীব আগ্রায় কখন নিজ মুখ দেখান নাই,—দিল্লীতেই থাকিতেন। ১৬৬৬ সালে ২২এ জানুয়ারি শাহজাহানের মৃত্যুর পরেই তিনি আগ্রার রাজবাড়ীতে প্রথমবার আসিয়া তথায় সমারোহে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

আওরংজীবের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ

শিবাজী আগ্রায় পৌঁছিবার তিনদিন পরেই চান্দ্র বৎসরের হিসাবে বাদশাহর পঞ্চাশত্তম জন্মদিন; স্থির হইল, জন্মদিনের উৎসব ও আড়ম্বরের মধ্যে শিবাজী বাদশাহকে দর্শন করিবেন, কারণ সেকালে শুভ দিনক্ষণ না দেখিয়া কোন কাজই করা হইত না।

আগ্রা-দুর্গের মধ্যে সারি সারি স্তম্ভ-গঠিত দরবার-গৃহ দেওয়ান-ই-আম, আজ জন্মদিনের উৎসবে পরিপাটিরূপে সাজান হইয়াছে। দেওয়াল ও থামগুলি বহুমূল্য রঙীন কিংখাব ও শালে জড়ান, মেঝেতে উৎকৃষ্ট গালিচা বিছান। এখানে সব উচ্চশ্রেণীর আমীরওম্রা ও রাজারা খুব জমকাল পোষাক পরিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া আছেন। দেওয়ান-ই-আমের সামনে ও দুইপাশে ঘাসে-ঢাকা নীচু আঙ্গিনায় লাল শালু-মোড়া কাঠের ডাণ্ডার সাহায্যে শামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছে। সারা আঙ্গিনাটি শতরঞ্চ ও চাদর দিয়া ঢাকা—এখানে নিম্নশ্রেণীর হাজার হাজার মনসবদার ও সাধারণ অনুচর দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছে। দেওয়ান-ই-আম গৃহের সম্মুখভাগ ও দুই পাশ খোলা, পিছন দিকটায় দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুরের দেওয়াল। এই দেওয়ালের মাঝখানে মানুষের চেয়ে উঁচু একটি ছোট বারান্দা বাহির হইয়াছে; তাহাতে বাদশাহর সিংহাসন, পশ্চাতে অন্তঃপুর হইতে আসিবার দরজা—পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। আর তাঁহার সামনে দরবার-গৃহের মেঝেতে থাম হইতে থামে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া তিনটি কাটরা বা প্রকোষ্ঠ করা হইয়াছে। প্রথমেই সোনার রেলিং, এখানে মাত্র সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ওমরার প্রবেশের অধিকার; তাহার পিছনে রূপার রেলিং, এখানে মধ্যম শ্রেণীর মনসবদারদের স্থান; সর্ব্ব-পশ্চাতে রং করা কাঠের রেলিং, তাহার মধ্যে সামান্য কর্ম্মচারীদের দাঁড়াইবার ব্যবস্থা। প্রত্যেক কাটরায় একটি স্থানে রেলিং খুলিয়া লোকের যাতায়াতের পথ করা ছিল। হিন্দী-কবি ভূষণ সত্যই বলিয়াছেন, এই জন্মদিন-উৎসবের দরবারে অমরাপুরীতে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ-বেষ্টিত ইন্দ্রের মত আওরংজীব বিরাজ করিতেছিলেন।

রাজসভা লোকে গম্‌গম্ করিতেছে। সভাসদ্‌গণের নানাবর্ণের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বিস্তৃত গালিচা ও কিংখাব দেখিয়া স্থানটাকে রঙ্গীন ফুলের বাগান বলিয়া ভ্রম হয়। চারিদিকে ওমরা ও করদ-রাজাদের গা হইতে হীরা মোতি ও নানাপ্রকার মণির আলো ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়াছেন।

রামসিংহ এহেন সভায় শিবাজী ও তাঁহার দশজন প্রধান কর্ম্মচারীকে উপস্থিত করিলেন। মারাঠা-রাজার পক্ষ হইতে বাদশাহর পায়ের নিকট থালায় করিয়া দেড় হাজার মোহর নজর, এবং ছয় হাজার টাকা নিসার[7] স্বরূপ উপহার দেওয়া হইল। আওরংজীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আও, শিবাজী রাজা!" শিবাজীকে হাত ধরিয়া বাদশাহর সামনে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি তিনবার সালাম করিলেন, বাদশাহ তাহার প্রতিদান করিলেন। তাহার পর বাদশাহর ইঙ্গিতে শিবাজীকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া দাঁড় করান হইল। দরবারের কাজ চলিতে লাগিল, যেন সকলেই শিবাজীর কথা ভুলিয়া গেল।

কত আদর-অভ্যর্থনার আশা বুকে ধরিয়া শিবাজী আগ্রা আসিয়াছিলেন, ইহাই কি তাহার পরিণাম? দরবারে আসিবার আগে হইতেই তাঁহার মনে দুঃখ ও সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথমতঃ, আগ্রার বাহিরে গিয়া কোন বড় ওমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন নাই, কেবল রামসিংহ

[7]বাদশাহর দেহ হইতে অশুভ দৃষ্টির প্রভাব দূর করিবার জন্য যে টাকা বা রত্ন থালায় করিয়া তাঁহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে লোকজনদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল নিসার।

(আড়াই হাজারী) এবং মুখলিস্ খাঁ (দেড় হাজারী)-র মত দুইজন মধ্যম শ্রেণীর ওমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে আনেন। আর, আজ বাদশাহর দর্শন মিলিবার পর তাঁহার কোন উচ্চ উপাধি, বা মূল্যবান উপহার, এমন কি প্রশংসা-বাক্যও লাভ হইল না। শিবাজী দেখিলেন, যেখানে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন সেখান হইতে বাদশাহ অনেক দূরে—সম্মুখে সারির পর সারি ওমরার দল দাঁড়াইয়া। তিনি রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার স্থানটি পাঁচ হাজারী মনসবদারদের মধ্যে। তখন তিনি উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কি? আমার সাত বৎসরের বালক পুত্র শম্ভুজী দরবারে না আসিয়াই পাঁচ হাজারী হইয়াছিল। আমার চাকর নেতাজীও পাঁচ হাজারী। আর আমি, এত বিজয়-গৌরবের পর স্বয়ং আগ্রায় আসিয়া শেষে কেবলমাত্র সেই পাঁচ হাজারীই হইলাম।"

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার সামনের ওমরাটি কে? রামসিংহ উত্তর দিলেন—'মহারাজা যশোবন্ত সিংহ।' শুনিয়া শিবাজী রাগে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "যশোবন্ত! যাহার পিঠ আমার সৈন্যেরা কতবার রণক্ষেত্রে দেখিয়াছে। আমার স্থান তাহারও নীচে? ইহার অর্থ কি?"

সকলের সামনে এইরূপ তীব্র অপমানে জ্বলিয়া উঠিয়া শিবাজী উঁচু গলায় রামসিংহের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলেন; বলিলেন—"তরবারি দাও, আমি আত্মহত্যা করিব। এ অপমান সহ্য করা যায় না।" শিবাজীর কড়া কথা এবং উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গীতে রাজসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; রামসিংহ মহা ভাবনায় পড়িয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। চারিদিকেই বিদেশী ও অজানা মুখ, কোন বন্ধু বা স্বজন নাই—রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে শিবাজী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। দরবারে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? চতুর রামসিংহ উত্তর দিলেন,—"বাঘ জঙ্গলী জানোয়ার। তার এখানে গরম লাগিয়া অসুখ হইয়াছে।" পরে বলিলেন,—"মারাঠা-রাজা দক্ষিণী লোক, বাদশাহী সভার আদব-কায়দা জানেন না।"

সদয় আওরংজীব হুকুম দিলেন, পীড়িত রাজাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া মুখে গোলাপজল ছিটাইয়া দেওয়া হউক; জ্ঞান হইলে তিনি বাসাবাড়ীতে চলিয়া যাইবেন,—দরবার শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

শিবাজী আগ্রায় নজরবন্দী হইলেন

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শিবাজী প্রকাশ্যভাবে বলিতে সুরু করিলেন যে, বাদশাহ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা তিনি বরং শিবাজীকে মারিয়া ফেলুন। চরের সাহায্যে সব কথাই আওরংজীবের কাণে পৌঁছিল; শুনিয়া তাঁহার রাগ ও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। তিনি রামসিংহকে হুকুম দিলেন যে, আগ্রা শহরের দেওয়ালের বাহিরে, জয়পুর-রাজের জমিতে (অর্থাৎ দুর্গ হইতে তাজমহলে যাইবার পথের ডান পাশে) শিবাজীকে রাখা হউক এবং যাহাতে তিনি পলাইতে না পারেন, সেজন্য রামসিংহকে দায়ী থাকিতে হইবে। বাদশাহর অসন্তোষের চিহ্ন-স্বরূপ শিবাজীকে পুনরায় দরবারে আসিতে নিষেধ করা হইল; তবে বালক শম্ভুজীকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

শিবাজীর সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, বাদশাহকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া তিনি নিজে মুক্তিলাভের চেষ্টা দেখুন। সেই-মত দরখাস্ত করা হইল; কিন্তু পড়িয়া বাদশাহ উত্তর দিলেন—"অপেক্ষা কর, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিব।" তাহার পর শিবাজী প্রার্থনা

করিলেন যে, বাদশাহ যদি তাঁহাকে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে দেন তবে রাজ্য-জয়ের একটি সুন্দর উপায় বলিয়া দিবেন। একথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ (শায়েস্তা খাঁর ভগ্নীপতি) বলিলেন,— "হুজুর, সর্ব্বনাশ। এমন কাজ করিবেন না। শিবাজী পাকা যাদুকর, আকাশে লাফ দিয়া চল্লিশ গজ জমি পার হইয়া শায়েস্তা খাঁর শিবিরে ঢুকিয়াছিল। এখানেও সেইরূপ দাঘাবাজী করিবে।" শিবাজীর আর বাদশাহর সঙ্গে দেখা হইল না।

শিবাজী তখন জাফর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দাক্ষিণাত্যজয়ের বন্দোবস্তের আলোচনা করিলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, “বেশ ভাল।” কিন্তু তাঁহার স্ত্রী (শায়েস্তা খাঁর ভগিনী) অন্তঃপুর হইতে গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন,—“শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছে, শায়েস্তা খাঁর আঙ্গুল কাটিয়া দিয়াছে, তোমাকেও বধ করিবে। শীঘ্র তাহাকে বিদায় কর।” মন্ত্রী তখন “আচ্ছা, আচ্ছা, বাদশাহকে বলিয়া সব সরঞ্জাম দিব”—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা শেষ করিলেন। শিবাজী বুঝিলেন, তিনি কিছুই করিবেন না।

পরদিন বাদশাহর হুকুমে আগ্রার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ শিবাজীর বাসার চারিদিকে পাহারা ও তোপ বসাইল; মারাঠারাজ সত্য সত্যই বন্দী হইলেন; তাঁহার বাসা হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

শিবাজী পলায়নের অদ্ভুত পথ বাহির করিলেন

সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শিবাজী পুত্রকে বুকে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিবার অনেক চেষ্টা করিল।

কিন্তু বেশীদিন এইভাবে গেল না। শিবাজীর অদম্য সাহস ও প্রখর বুদ্ধি শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। তিনি নিজের মুক্তির পথ নিজেই বাহির করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সকলের কাছে লোক পাঠাইয়া জানাইতে লাগিলেন যে, তিনি বাদশাহর ভক্ত প্রজা, তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে কাঁপিতেছেন। অপরাধ-মার্জ্জনালাভের আশায়, বাদশাহর নিকট সুপারিশ করিবার জন্য শিবাজী দরবারের অনেক সভাসদকে অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজ রক্ষী-সৈন্যদলকে দেশে পাঠাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; বাদশাহ ভাবিলেন, ভালই ত, আগ্রায় যত শত্রু কমে। সৈন্যেরা মহারাষ্ট্রে গেল, সেই সঙ্গে শিবাজীর সঙ্গীরাও অনেকে দেশে ফিরিল। শিবাজী এখন একা—তিনি নিজের পলায়নের পথ নিজেই দেখিলেন।

অসুখের ভাণ করিয়া তিনি শয্যায় আশ্রয় লইলেন; ঘর হইতে আর বাহির হন না। ব্যাধি দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সাধুসজ্জন ও সভাসদদিগের মধ্যে তিনি প্রত্যহ বড় বড় ঝুড়ি ভরিয়া ফল ও মিঠাই বিতরণ করিতে সুরু করিলেন। প্রত্যেক ঝুড়ি বাঁশের বাঁকে ঝুলাইয়া দুইজন করিয়া বাহক বৈকালে বাসাবাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। কোতোয়ালের প্রহরীরা প্রথমে দিনকতক ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তাহার পর বিনা পরীক্ষায় যাইতে দিতে লাগিল।

শিবাজী এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৯এ আগষ্ট বৈকালে তিনি প্রহরীদের বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার অসুখ বাড়িয়াছে, তাহারা যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। এদিকে ঘরের মধ্যে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (শাহজীর দাসীপুত্র) হিরাজী ফর্জন্দ,—দেখিতে কতকটা শিবাজীর মতই—

শিবাজীর খাটিয়ায় শুইয়া, চাদরে গা-মুখ ঢাকিয়া, শুধু ডান হাত বাহির করিয়া রাখিলেন; তাঁহার এই হাতে শিবাজীর সোনার বালা দেখা যাইতেছিল। আর সন্ধ্যার সময় শিবাজী ও শম্ভুজী দুইটি ঝুড়ির মধ্যে জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিলেন, তাঁহাদের উপর বেশ করিয়া পাতা ঢাকা দেওয়া হইল; আর তাঁহাদের বাঁকের সামনে ও পিছনে কয়েক ঝুড়ি সত্যকার ফল মিঠাই ভরিয়া সারিবন্দী হইয়া বাহকগণ বাসা হইতে বাহির হইল; বাদশাহর প্রহরীরা কোনই উচ্চবাচ্য করিল না,—কেন না ইহা ত নিত্যকার ঘটনা।

আগ্রা শহরের বাহিরে পৌঁছিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে ঝুড়ি নামাইয়া বাহকগণ মজুরি লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর শিবাজী ও শম্ভুজী ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া সঙ্গে যে দুইটি মারাঠা-অনুচর আসিয়াছিল তাহাদের সাহায্যে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একটি ছোট গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার ন্যায়াধীশ নিরাজী রাবজী ঘোড়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে মারাঠাদের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পুত্র শম্ভুজী, নিরাজী, দত্তাজী ত্র্যম্বক (ওয়াকিয়ানবিস্) ও রাঘবমিত্রকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া সারা অঙ্গে ছাই মাখিয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন, বাকী সকলে দাক্ষিণাত্যের পথ ধরিল।

আগ্রায় শিবাজীর পলায়ন প্রকাশ হইল

এদিকে আগ্রায় ১৯ আগষ্টের সারারাত্রি এবং পরদিন তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত হিরাজী শিবাজীর বিছানায় শুইয়া রহিলেন। প্রাতে প্রহরীরা আসিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, সোনার বালা পরিয়া বন্দী শুইয়া আছেন, চাকরেরা তাঁহার পা টিপিতেছে। বৈকাল তিনটার সময় হিরাজী উঠিয়া নিজ বেশ পরিয়া চাকরটিকে সঙ্গে লইয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলেন; দরজায় প্রহরীদের বলিলেন, "শিবাজীর মাথার বেদনা; কাহাকেও তাঁহার ঘরে যাইতে দিও না, আমি ঔষধ আনিতে যাইতেছি।" এইরূপে দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রহরীরা দেখিল, বাড়ীটা যেন কেমন খালি খালি ঠেকিতেছে; ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন নড়াচড়ার চিহ্ন দেখা যাইতেছে না; অন্যদিনের মত বাহিরের লোকজনও কেহ দেখা করিতে আসিতেছে না। ক্রমে তাহাদের সন্দেহ বাড়িল, তাহারা ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের চক্ষুস্থির,—পাখী উড়িয়াছে, ঘরে জনমানব নাই !!!

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তাহারা ছুটিয়া গিয়া কোতোয়ালকে সংবাদ দিল। ফুলাদ খাঁ কয়েদীর বাসায় খোঁজ করিয়া দেখিয়া বাদশাহকে নাইল,—"হুজুর! শিবাজী পলাইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য আমাদের কোনই দোষ নাই। রাজা কুঠুরীর মধ্যেই ছিলেন। আমরা ঠিক-মত গিয়া দেখিতেছিলাম; তথাপি একেলা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি মাটির মধ্যে ঢুকিলেন, অথবা আকাশে উড়িয়া গেলেন, বা হাঁটিয়া পলাইলেন তাহা জানা গেল না। আমরা কাছেই ছিলাম; দেখিতে দেখিতে তিনি আর নাই। কি যাদুবিদ্যায় এমনটা হইল বলিতে পারি না।"

কিন্তু আওরংজীব এসব বাজে কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। অমনি চারিদিকে "ধর ধর" শব্দ উঠিল, রাজ্যমধ্যে পথঘাটের সব চৌকি, পার-ঘাট এবং পর্ব্বতের ঘাটিতে হুকুম পাঠান হইল যেন দাক্ষিণাত্যযাত্রীদের সকলকে ধরিয়া দেখা হয় তাহাদের মধ্যে শিবাজী আছে কি না। এই হুকুম লইয়া দক্ষিণ দিকে কত সওয়ার ছুটিল। আর আগ্রা বা তাহার নিকটে শিবাজীর যত অনুচর ছিল (যেমন ত্র্যম্বক সোনদেব দবীর এবং রঘুনাথ বল্লাল কোর্‌ডে), তাহাদের ধরিয়া কয়েদ করা হইল। মারের

চোটে তাহারা বলিল যে, রামসিংহের সাহায্যে শিবাজী পলাইয়াছেন। বাদশাহ রাগিয়া রামসিংহের দরবারে আসা বন্ধ করিলেন এবং তাঁহার মনসব ও বেতন কাড়িয়া লইলেন।

শিবাজীর পলায়নের সময়ের নানা আশ্চর্য্য ঘটনা

চতুর-চুড়ামণি শিবাজী দেখিলেন, আগ্রা হইতে মহারাষ্ট্রের পথ দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে গিয়াছে, সুতরাং সেদিকে সর্ব্বত্রই শত্রু সজাগ হইয়া পাহারা দিবে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পথে কোন পথিকের উপরই সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। সেইজন্য তিনি আগ্রা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে উত্তরে, পরে পূর্ব্বদিকে—অর্থাৎ ক্রমেই মহারাষ্ট্র হইতে অধিক দূরে চলিতে লাগিলেন। প্রথম রাত্রিতে ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহারা দ্রুতগতি মথুরায় পৌঁছিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে বালক শম্ভুজী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; পথ চলিতে একেবারে অক্ষম। অথচ আগ্রার এত নিকটে থাকা শিবাজীর পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। নিরাজী পণ্ডিত তখন পেশোয়ার শ্যালক তিনজন মথুরাবাসী মারাঠা ব্রাহ্মণকে শিবাজীর আগমন ও দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া, সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহারাও দেশ ও ধর্ম্মের নামে বাদশাহর শাস্তির ভয় তুচ্ছ করিয়া শম্ভুজীকে নিজ পরিবারমধ্যে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। আর তাঁহাদের এক ভাই শিবাজীকে সঙ্গে লইয়া কাশী পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া চলিলেন।

এই দীর্ঘপথের খরচের জন্য শিবাজী প্রস্তুত হইলেন। সন্ন্যাসীর লাঠির মধ্যে ফুটা করিয়া, তাহা মণি ও মোহর দিয়া পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; জুতার মধ্যে কিছু টাকা রাখিলেন, আর একটা বহুমূল্য হীরক এবং অনেকগুলি পদ্মরাগমণি মোম দিয়া ঢাকিয়া তাঁহার অনুচরদের জামার ভিতরে সেলাই করিয়া দিলেন, কিছু কিছু তাহারা মুখে পূরিয়া রাখিল।

মথুরায় পৌঁছিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া, গায়ে ছাই মাখিয়া, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে শিবাজী পথ চলিতে লাগিলেন। নিরাজী ভাল হিন্দী বলিতে পারিতেন। তিনি মোহান্ত সাজিয়া দলের আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তিনিই পথের লোকজনদের উত্তর দেন, শিবাজী সামান্য চেলা হইয়া নীরবে তাঁহার পিছু পিছু চলেন। তাঁহারা প্রায়ই রাত্রে পথ চলেন, দিনে নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করেন, প্রত্যহই এক ছদ্মবেশ বদলাইয়া আর এক রকম বেশ ধরেন। তাঁহার চল্লিশ পঞ্চাশজন অনুচর তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া দূরে দূরে পশ্চাতে আসিতে লাগিল, প্রত্যেক দলেরই ভিন্ন ভিন্ন বেশ।

একবার তিনি ধরা পড়িয়াছিলেন। আলী কুলী নামে বাদশাহর এক ফৌজদার সরকারী হুকুম পাইবার আগেই আগ্রা হইতে নিজ সংবাদ-লেখকের পত্রে শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়া তাহার সীমানার মধ্যে সমস্ত পথিকদের ধরিয়া তল্লাস আরম্ভ করিয়া দিল। শিবাজীও সদলে আটক হইলেন। তিনি দুপুর রাত্রে গোপনে ফৌজদারের কাছে গিয়া বলিলেন,—"আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে এখনি লক্ষ টাকা দামের হীরা ও মণি দিব। আর যদি আমাকে বাদশাহর নিকট ধরাইয়া দাও, তবে এসব রত্ন তিনি পাইবেন,—তোমার কোনই লাভ হইবে না।" ফৌজদার এই ঘুষ লইয়া তখনি তাঁহাদের ছাড়িয়া দিল।

তারপর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—এলাহাবাদের পুণ্যক্ষেত্রে স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে শিবাজী কাশীধামে পৌঁছিলেন। অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান, কেশচ্ছেদ প্রভৃতি তীর্থের ক্রিয়াকলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রওনা হইবার পরই আগ্রা হইতে অশ্বারোহী দূত আসিয়া শিবাজীকে ধরিবার জন্য বাদশাহর আদেশ চারিদিকে প্রচার করিল। অনেক বৎসর

পরে সুরতের নাভাজী নামে এক গুজরাতী ব্রাহ্মণ কবিরাজ গল্প করিতেন,—"কাশীতে পাঠ্যাবস্থায় আমি এক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলাম, গুরু আমাকে বড়ই খাবার কষ্ট দিতেন। একদিন ভোরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই অন্যদিনের মত নদীর ঘাটে গিয়াছি, এমন সময় একজন লোক আমার হাতের মধ্যে মোহর ও মণি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, 'মুঠি খুলিও না, কিন্তু আমার স্নানাদি তীর্থক্রিয়া যত শীঘ্র পার শেষ করাইয়া দাও।' আমি তাহার মাথা মুড়াইয়া স্নান করাইয়া দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলাম; এমন সময় একদিকে শোরগোল উঠিল যে, পলাতক শিবাজীর খোঁজে আগ্রা হইতে বাদশাহী পুলিশ আসিয়া ঢোল পিটিয়া দিতেছে। তাহার পর পূজার কাজে মন দিয়া যাত্রীটির দিকে ফিরিতেই দেখি, সে ইতিমধ্যে অন্তর্ধান করিয়াছে। মুঠির মধ্যে নয়টি মোহর, নয়টি হোণ, ও নয়টি মণি পাইলাম। গুরুকে কিছু না বলিয়া সটান দেশে ফিরিলাম। ঐ টাকা দিয়া এই বড় বাড়ী কিনিয়াছি।"

কাশী হইতে গয়া পূর্ব্বদিকে; এই তীর্থ করিয়া শিবাজী দক্ষিণ মুখে চলিলেন। পরে গোণ্ডওয়ানা ও গোলকুণ্ডা-রাজ্য পার হইয়া পশ্চিম দিকে ফিরিয়া, বিজাপুরের মধ্য দিয়া নিজ দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। দীর্ঘ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া তিনি একটি টাট্টু (ছোট ঘোড়া) কিনিলেন; দাম দিবার সময় দেখেন, রূপার টাকা নাই, তখন ঘোড়াওয়ালাকে একটি মোহর দিলেন। সে বলিল— "তুমি বুঝি শিবাজী, নহিলে এই টাট্টুর জন্য এত বেশী দাম দিতেছ কেন?" শিবাজী থলি খালি করিয়া সব মোহরগুলি তাহাকে দিয়া বলিলেন,—"চুপ। কথাটি কহিও না।" আর ঘোড়ায় চাপিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পলাতক শিবাজী স্বদেশে পৌঁছিলেন

ক্রমে দাক্ষিণাত্য গোদাবরী-তীরে ইন্দুর-প্রদেশ পার হইয়া এই সন্ন্যাসীর দল মহারাষ্ট্রের সীমানার কাছে এক গ্রামে সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা গ্রামের মোড়লের স্ত্রী (পাটেলিন্)-এর বাড়ীতে রাত্রির জন্য আশ্রয় চাহিল। ইহার কিছুদিন আগেই আনন্দ রাও-এর অধীনে শিবাজীর সৈন্যেরা আসিয়া এই গ্রামের সব শস্য ও ধন লুট করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পাটেলিন্ উত্তর করিল,— "বাড়ী খালি পড়িয়া আছে। শিবাজীর সওয়ার আসিয়া সব শস্য লইয়া গিয়াছে। শিবাজী কয়েদ আছে। সেইখানেই পচিয়া মরুক," এবং তাহার উদ্দেশে কত অভিসম্পাত করিতে লাগিল। শিবাজী হাসিয়া নিরাজীকে ঐ গ্রামের ও তাহার পাটেলিনের নাম লিখিয়া লইতে বলিলেন। নিজ রাজধানীতে পৌঁছিবার পর পাটেলিনকে ডাকাইয়া, লুটে যাহা ক্ষতি হইয়াছিল তাহার বহুগুণ অধিক ধন দান করিলেন।

ক্রমে ভীমা নদী পার হইয়া, আগ্রা হইতে রওনা হইবার পূর্ণ তিনমাস পরে, নিজ রাজধানী রাজগড়ে পৌঁছিলেন (২০এ নবেম্বর)। দুর্গের দ্বারে গিয়া জীজা বাঈকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, উত্তর দেশ হইতে একদল বৈরাগী আসিয়াছে—তাহারা সাক্ষাৎ করিতে চায়। জীজা বাঈ অনুমতি দিলেন। অগ্রগামী মোহন্ত (অর্থাৎ নিরাজী) হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু পশ্চাতের চেলা বৈরাগীটি জীজা বাঈ-এর পায়ের উপর মাথা রাখিল। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, সন্ন্যাসী কেন তাঁহাকে প্রণাম করে? তখন ছদ্মবেশী শিবাজী টুপি খুলিয়া নিজ মাথা মাতার কোলে রাখিলেন, এতদিনের হারাধনকে মাতা চিনিতে পারিলেন! অমনি চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইল। মহা হর্ষে সমগ্র মহারাষ্ট্র জানিল—দেশের রাজা নিরাপদে দেশে ফিরিয়াছেন।

শিবাজী দেশে ফিরিলেন, কিন্তু সঙ্গে পুত্রটি নাই। তিনি রটাইয়া দিলেন যে, পথে শম্ভুজীর মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের পথের যত মুঘল-প্রহরীদের মন নিশ্চিন্ত হইলে, তিনি গোপনে মথুরার সেই তিন ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিলেন। তাহারা পরিবারবর্গ লইয়া শম্ভুজীকে ব্রাহ্মণের বেশ পরাইয়া, কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিয়া, মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে এক মুঘল-কর্ম্মচারী তাহাদের গেরেফ্‌তার করে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহার সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ শম্ভুজীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিল,—যেন শম্ভুজী শূদ্র নহেন, তাহাদের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণাজী কাশীজী ও বিশাজী—এই তিন ভাইকে শিবাজী "বিশ্বাস রাও" উপাধি, এক লক্ষ মোহর এবং বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার জাগীর পুরস্কার দিলেন।

শিবাজীর পলায়নে আওরংজীবের মনে আমরণ আপশোষ হইয়াছিল। তিনি ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় নিজ উইলে লিখিয়াছিলেন, "শাসনের প্রধান স্তম্ভ রাজ্যে যাহা ঘটে তাহার খবর রাখা; এক মুহূর্ত্তের অবহেলা দীর্ঘকাল লজ্জার কারণ হয়। এই দেখ, হতভাগা শিবাজী আমার কর্ম্মচারীদের অসাবধানতায় পলাইয়া গেল, আর তাহার জন্য আমাকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই-সব কষ্টকর যুদ্ধে লাগিয়া থাকিতে হইল।"

শিবাজী সম্বন্ধে আওরংজীব এবং জয়সিংহের মনের অভিপ্রায় কি?

জয়সিংহের পত্রাবলী হইতে শিবাজীর বন্দীদশায় মুঘল-রাজনীতির হেরফের অতি স্পষ্ট বুঝা যায়। বাদশাহর প্রথমে অভিপ্রায় ছিল, প্রথম দিন দর্শনের পর শিবাজীকে একটি হাতী, খেলাৎ এবং কিছু মণিমুক্তা উপহার দিবেন। কিন্তু দরবারে শিবাজীর অসভ্য ব্যবহারে চটিয়া গিয়া তিনি এই দান স্থগিত রাখিলেন। এদিকে শিবাজী বাসায় ফিরিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, মুঘল-রাজসরকার তাঁহার সম্বন্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। তখন আওরংজীব জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি বাদশাহর পক্ষ হইতে শিবাজীকে কি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উত্তরে জয়সিংহ পুরন্দর-সন্ধির শর্ত্তগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে, শিবাজীকে ইহার অতিরিক্ত কোন কথা দেওয়া হয় নাই।

এদিকে আগ্রায় যখন শিবাজী কঠোরভাবে নজরবন্দী হইলেন, জয়সিংহ তখন মহাসঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে দাক্ষিণাত্যের আশু বিপদ লাঘব করিবার জন্য শিবাজীকে উত্তর-ভারতে সরাইয়া দিয়াছেন; অপরদিকে তিনি ধর্ম্ম-শপথ করিয়াছেন যে, আগ্রায় গেলে শিবাজীর কোন অনিষ্ট বা স্বাধীনতা-লোপ হইবে না। তিনি আওরংজীবের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না, ক্রমাগত বাদশাহকে লিখিতে লাগিলেন যে শিবাজীকে বন্দী বা বধ করিলে কোন লাভই হইবে না। কারণ তিনি দেশে এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মারাঠারা পূর্ব্বের মতই রাজ্য চালাইতে থাকিবে; আর শিবাজী যদি নিরাপদে দেশে ফিরিতে না পারেন তবে ভবিষ্যতে কেহই বাদশাহী ওমরাদের কথা বিশ্বাস করিবে না। জয়সিংহ সেইসঙ্গে পুত্র রামসিংহকে বার বার লিখিলেন,—"দেখিও, শিবাজীর রক্ষার জন্য তোমার ও আমার আশ্বাস-বাণী যেন কোনমতে মিথ্যা না হয়, আমরা যেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দুর্নামে না পড়ি।"

এদিকে শিবাজীকে লইয়া কি করিবেন তাহা আওরংজীব ভাল বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার কোনই একটা নীতি স্থির হইল না। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, জয়সিংহ বিজাপুর-রাজকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলে, দাক্ষিণাত্য-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শিবাজীকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু সে জয়ের আশা ক্রমেই

ক্ষীণ হইয়া আসিল। তখন বাদশাহ একবার বলিলেন যে, রামসিংহ শিবাজীর দায়িত্ব লইয়া আগ্রায় থাকুক, তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাইবেন। আবার বলিলেন, শিবাজীকে আফঘানিস্থানে মুঘল-সৈন্যের সহিত কাজ করিতে পাঠাইবেন; নেতাজীকে এবং পরে যশোবন্তকেও এইরূপ আফঘানিস্থানে পাঠান হইয়াছিল,—ইহা এক প্রকার দ্বীপান্তর দেওয়া। কিন্তু এ দুটির কিছুই হইল না। জয়সিংহ ও তাঁহার পুত্র একবাক্যে শিবাজীকে আগ্রায় রাখিবার ভার লইতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে শিবাজী একমাত্র কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর জিম্মায় রহিলেন।

সেই অবস্থায় শিবাজী পলাইলেন। তাঁহার পলায়নের তিন মাসকাল এবং দেশে ফিরিবার পর প্রথম কিছুদিন ধরিয়া জয়সিংহের ভয় ও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। একে তাঁহার বিজাপুর-আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে; তাহাতে বাদশাহর এবং নিজের অগাধ টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। ইহার উপর রুষ্ট শিবাজী দেশে ফিরিয়া না জানি মুঘলদের উপর কি প্রতিহিংসা লন। এ সকলের উপর, নিজের বংশের আশা-ভরসা কুমার রামসিংহ বাদশাহর সন্দেহে পড়িয়া অপমানিত ও দণ্ডিত হইয়া আছেন। জয়সিংহের প্রথমবারকার এত যুদ্ধজয়, সরকারী কাজে নিজ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়, দীর্ঘজীবন ধরিয়া রাজসেবায় রক্তপাত,—সবই বিফল হইল। তাঁহার দাক্ষিণাত্য-শাসন, চারিদিকে পরাজয় ও লজ্জায় পরিসমাপ্ত হইল। বাদশাহ তাঁহাকে ঐ পদ হইতে সরাইয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রম, ক্ষতি, চিন্তা ও অপমানে জর্জ্জরিত বৃদ্ধ রাজপুতবীর পথে বুর্হানপুর নগরে মরিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন (২রা জুলাই, ১৬৬৭)।

বাদশাহ অবাধ্য পলাতক শিবাজীকে শাস্তি দিবার অবসর পাইলেন না। ১৬৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই পারস্যরাজের আক্রমণের ভয়ে একদল প্রবল মুঘল-সৈন্য পঞ্জাবে পাঠান হইল, আর তাহার পর বৎসর মার্চ্চ মাসে পেশোয়ার প্রদেশে যে ইউসুফজাই-জাতির বিদ্রোহ বাধিল তাহাতে বাদশাহর সমস্ত শক্তি বহুদিন ধরিয়া সেখানে আবদ্ধ রহিল।

বাদশাহ ও শিবাজীর মধ্যে আবার সন্ধি হইল কেন?

দেশে ফিরিয়া, শিবাজীও মুঘলদের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহিলেন না; তিন বৎসর পর্য্যন্ত শান্তভাবে রহিলেন, নিজ রাজ্যের শাসনপ্রণালী গঠন এবং সুচারুরূপে জমির বন্দোবস্ত করিলেন; কোঁকন-প্রদেশে নিজ অধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিলেন।

এ অবস্থায় বাদশাহর সঙ্গে সন্ধি করায় তাঁহার লাভ। তিনি মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে লিখিলেন,— "বাদশাহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। নচেৎ আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজবলে কান্দাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দিই। আমি শুধু প্রাণের ভয়ে আগ্রা হইতে পলাইয়াছি। মির্জা রাজা জয়সিংহ আমার মুরুব্বি ছিলেন, তিনি আর নাই। এখন আপনার মধ্যস্থতায় যদি আমি বাদশাহর ক্ষমা লাভ করি, তবে আমি আমার পুত্রের সহিত সৈন্যদলকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা মুয়জ্জমের অধীনে কাজ করিতে পাঠাইয়া দিতে পারি।"

যুবরাজ ও যশোবন্ত এই প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া বাদশাহকে লিখিলেন। আওরংজীব সম্মত হইয়া শিবাজীর 'রাজা' উপাধি মঞ্জুর করিলেন। ১৬৬৭ সালের ৪ঠা নবেম্বর শম্ভুজী আসিয়া আওরঙ্গাবাদে যুবরাজ মুয়জ্জমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে প্রতাপরাও (নূতন সেনাপতি) এবং নিরাজীর অধীনে শিবাজীর একদল সৈন্য আসিয়া বাদশাহর কাজ করিতে লাগিল।

তজ্জন্য শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মনসবের উপযুক্ত জাগীর বেরার প্রদেশে দেওয়া হইল। এইরূপে "দুই বৎসর পর্য্যন্ত মারাঠা-সৈন্য মুঘল-রাজ্যের জমি হইতে পেট ভরাইল, শাহজাদাকে বন্ধু করিল।" [সভাসদ]

১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯ এই তিন বৎসর শিবাজী শান্তিতে কাটাইলেন,—বিজাপুর বা মুঘলরাজ্যে কোন উপদ্রব করিলেন না। তাহার পর ১৬৭০ সালের প্রথমেই আবার বাদশাহর সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। ইহার কারণ নানা লোকে নানা রকম বলে। এক গ্রন্থে আছে, নিন্দুকেরা আওরংজীবকে জানাইল যে শাহজাদা মুয়জ্জম শিবাজীর সহিত গাঢ় বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সাহায্যে স্বাধীন হইবার চেষ্টায় আছেন, এবং এই কথা শুনিয়া বাদশাহ শিবাজীর পুত্র ও সেনাপতিদের হঠাৎ বন্দী করিবার জন্য মুয়জ্জমকে হুকুম পাঠাইলেন; কিন্তু কুমার বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া গোপনে মারাঠাদের ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা আওরঙ্গাবাদ হইতে দলবল লইয়া রাত্রে পলাইয়া গেল।

অপর এক বিবরণ এই যে, বাদশাহ ১৬৬৬ সালে আগ্রা যাইবার জন্য শিবাজীকে যে একলক্ষ টাকা অগ্রিম দেন, এখন আয়বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় তাহা তাঁহার বেরারের নূতন জাগীর জব্‌ৎ করিয়া আদায় করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে শিবাজী চটিয়া বিদ্রোহী হইলেন।

আসল কথা, এই তিন বৎসরে শিবাজী বলবৃদ্ধি ও এবং রাজ্যের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন; এখন দেখিতে চাহিলেন যুদ্ধ করিলে কত লাভ হয়।

সপ্তম অধ্যায় : শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন

মুঘলদের হাত হইতে দুর্গ-উদ্ধার

আওরংজীবের দরবার হইতে পলাইয়া আসিয়া শিবাজী তিন বৎসর (১৬৬৭-১৬৬৯) চুপচাপ ছিলেন। তাহার পর, ১৬৭০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল কর্ম্মচারীরা কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। শিবাজী দ্রুতগতিতে চারিদিকে সতেজ আক্রমণ করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করায় তাহারা একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহাদের অধীন কত গ্রাম লুঠ হইল, পুরন্দর-সন্ধিতে পাওয়া সাতাইশটি দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি বাদশাহর হাতছাড়া হইল। মুঘল-কর্ম্মচারীদের অনেকে নিজ নিজ দুর্গে বা থানায় যুদ্ধ করিয়া মরিল, অপরে হতাশ হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল।

ইহার মধ্যে কোণ্ডনা-জয়ের কাহিনী এখনও মারাঠা-দেশে লোকেরা মুখে মুখে গান করে। শিবাজী তাঁহার মহাকায় মাব্‌লে সেনাপতি ও বাল্যবন্ধু তানাজী মাল্‌সরেকে এই দুর্গ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে তিনশত বাছা বাছা মাব্‌লে পদাতিক লইয়া তানাজী অন্ধকার রাত্রে দড়ির সিঁড়ি লাগাইয়া পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিম গা বাহিয়া উপরে উঠিলেন; অসভ্য কোলী-জাতীয় কয়েকজন স্থানীয় লোক তাঁহাকে গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। দুর্গপ্রাচীরে পৌঁছিয়াই সেখানকার বাদশাহী প্রহরীদের নিহত করিয়া তাঁহারা ভিতরে ঢুকিলেন। কিলাদার উদয়ভান এবং তাঁহার রাজপুত সেনারা দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। 'শত্রু আসিয়াছে' এই চীৎকার শুনিয়া তাহারা সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু শীতের রাত্রে আফিংখোর রাজপুতরা তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে মারাঠারা দুর্গ-প্রাচীরের এক অংশ বেশ দখল করিয়া বসিয়াছে। যখন রাজপুতগণ আসিয়া পৌঁছিল, মারাঠারা "হর হর মহাদেব" শব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উদয়ভান তানাজীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পরস্পরের তরবারির আঘাতে দুই সেনানীই মারা গেলেন। কিন্তু তানাজীর ভাই সূর্য্যাজী সামনে আসিয়া বলিলেন, “সৈন্যগণ! ভাই মারা পড়িয়াছেন, কিন্তু ভয় নাই। আমি তোমাদের নেতা হইব।” নেতার পতনে রাজপুতেরা কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। আর অমনি মারাঠারা আবার রুখিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। ইতিমধ্যে তাহারা দুর্গের দরজা খুলিয়া দেওয়ায় আরও অনেক মারাঠী সৈন্য নীচ হইতে ভাল পথ দিয়া দুর্গে ঢুকিল। অবশেষে এই নিষ্ফল যুদ্ধে বারো শত রাজপুত মারা পড়িল, অনেকে পাহাড়ের গা বাহিয়া

পলাইতে গিয়া নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

বিজয়ী মারাঠারা দুর্গের ভিতরের আস্তাবলের খড়ের ছাদে আগুন ধরাইয়া দিল। পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজগড় হইতে সেই আলো দেখিয়া শিবাজী বুঝিলেন যে তাঁহার জয় হইয়াছে। পরদিন যখন সকল সংবাদ পাইলেন, তখন দুঃখ করিয়া বলিলেন, "গড়টা পাইলাম বটে, কিন্তু সিংহকে হারাইলাম।" তিনি কোণ্ডানার নাম বদলাইয়া "সিংহগড়" করিলেন, এবং তানাজীর পরিবারকে অনেক পুরস্কার দিলেন।

এইরূপে কোণ্ডানা, পুরন্দর, কল্যাণ-ভিবণ্ডী, মাহুলী প্রভৃতি অনেক দুর্গ শিবাজীর হাতে আসিল। মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে একমাত্র দাউদ খাঁ কুরেশী যুদ্ধ করিয়া কিছু ফললাভ করিলেন, কিন্তু তিনি একলা কত দিক সামলাইবেন?

দাক্ষিণাত্যে মুঘলদিগের গৃহ-বিবাদ

আওরংজীব শিবাজীর নূতন বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র আরও অনেক সৈন্য ও সেনাপতি মহারাষ্ট্রে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। গৃহবিবাদে মুঘলদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার কুমার মুয়জ্জম এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র যশোবন্ত সিংহের সহিত দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুঘল-বীর ও সেনাপতি দিলির খাঁর মর্ম্মান্তিক শত্রুতা ছিল। তাহার উপর নিন্দুকেরা বাদশাহকে বলিল যে, কুমার নিজকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় আছেন। এ-পক্ষ ও-পক্ষের বিরুদ্ধে বাদশাহর নিকট নালিশ করিতে লাগিল। দিলিরের ভয় হইল, সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুমার তাঁহাকে কয়েদ করিতে পারেন! অবশেষে (আগষ্ট ১৬৭০) গভীর বর্ষার মধ্যে দিলির প্রাণভয়ে মহারাষ্ট্র দেশ ছাড়িয়া উত্তর-ভারতের দিকে পলাইলেন। আর মুয়জ্জম এবং যশোবন্ত তাপ্তী নদী পর্য্যন্ত সৈন্যসহ তাঁহাকে তাড়া করিয়া গেলেন, এবং এই অবাধ্য কর্ম্মচারীকে দমন করিবার জন্য শিবাজীর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

ইহার ফলে শিবাজীর জয়জয়কার হইল; কোথাও তাঁহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। ইংরাজ-কুঠীর সাহেব লিখিলেন, "শিবাজী আগে চোরের মত গোপনে দ্রুত চলিতেন। কিন্তু এখন আর তাঁহার সে অবস্থা নাই। তিনি প্রবল সৈন্যদল, ত্রিশ হাজার যোদ্ধা লইয়া দেশ জয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। শাহজাদা যে এত কাছে রহিয়াছেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না।"

শিবাজীর দ্বিতীয়বার সুরত-লুণ্ঠন

এই বৎসর (১৬৭০) ৩রা অক্টোবর শিবাজী আবার সুরত-বন্দর লুঠ করিলেন। একমাস আগে হইতে সকলেই শুনিতেছিল যে, তিনি কল্যাণ শহরে অনেক অশ্বারোহী সৈন্য একত্র করিতেছেন এবং প্রথমেই সুরত আক্রমণ করিবেন। এমন কি ইংরাজেরা এই লুঠ সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল যে, আগেই তাহাদের সুরত-কুঠী হইতে সব টাকাকড়ি মালপত্র এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার লোকজন পর্য্যন্ত সুহায়িলীতে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। অথচ সুরতের মুঘল-শাসনকর্ত্তা এমন অলস ও অন্ধ যে অত-বড় ধনশালী শহর রক্ষার জন্য সে শুধু তিনশত সৈন্য রাখিয়াছিল।

৩রা অক্টোবর প্রাতে শিবাজী পনের হাজার সৈন্যসহ সুরতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পূর্ব্বদিন ও রাত্রে সমস্ত ভারতীয় বণিক—এমন কি সরকারী কর্ম্মচারীরাও শহর ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া গিয়াছিল। ১৬৬৪ সালে প্রথম লুঠের পর বাদশাহর আজ্ঞায় সুরতের চারিদিক একটা ইটপাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এত সামান্য যে শিবাজীর পনের হাজার লোকের সম্মুখে তিনশত মুঘল চৌকীদার দাঁড়াইতে পারিল না, তাহারা দুর্গের মধ্যে পলাইয়া গেল।

দুইদিন একবেলা ধরিয়া মারাঠারা এই পরিত্যক্ত শহর লুঠ করিল। ডচ্-কুঠীতে খবর পাঠাইল—"যদি তোমরা চুপচাপ করিয়া থাক তবে তোমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না।" তাহারা তাহাই করিল। ফরাসী কুঠীর সাহেবরা মূল্যবান উপহার দিয়া মারাঠাদের খুশী করিল। সুহায়িলী হইতে আনা পঞ্চাশজন জাহাজী-গোরা (বিখ্যাত ষ্ট্রেনস্-হ্যাম মাষ্টারের অধীনে) ইংরাজ-কুঠী রক্ষা করিল; যে মারাঠাদল উহা লুঠ করিতে আসিয়াছিল ইংরাজদের অব্যর্থ বন্দুকের গুলিতে তাহাদের এত লোক মারা গেল যে আর কেহ সেদিকে অগ্রসর হইল না। পারসী ও তুর্কী বণিকদের দুর্গের মত "নূতন সরাই"ও রক্ষা পাইল।

ফরাসী-কুঠীর সামনে "তাতার সরাই"য়ে কাশঘরের পদচ্যুত রাজা আবদুল্লা খাঁ মক্কা হইতে কয়েকদিন আগে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। নিকটের কয়েকটি গাছের আড়াল হইতে মারাঠারা প্রথম দিন এই সরাইএর উপর গুলি চালাইতে লাগিল। তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া রাত্রে সকলে ভিতর হইতে পলাইয়া গেল। মারাঠারা রাজার ধনসম্পত্তি, আওরংজীবের দেওয়া সোনার খাট এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহার সব দখল করিল।

মারাঠারা অবসর-মত অবাধে বড় বড় বাড়ী লুঠ করিয়া সুরত হইতে ৬৬ লক্ষ টাকার ধনরত্ব লইয়া ৫ই অক্টোবর দুপুর বেলা তাড়াতাড়ি শহর ত্যাগ করিল। লুঠের পর তাহারা এত জায়গায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল যে প্রায় অর্দ্ধেক শহর পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে ইংরাজদের গুলিতে অনেক মারাঠা মারা পড়ায় শিবাজীর সৈন্যগণ প্রতিহিংসা লইবার জন্য তৃতীয় দিন ইংরাজ-কুঠীর সামনে আসিয়া "কুঠী পুড়াইব" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের নেতারা জানিত যে আবার আক্রমণ করিলে আরও লোক মারা যাইবে। শেষে একটা নিষ্পত্তি হইল। দুইজন ইংরাজ-বণিক শহরের বাহিরে শিবাজীর শিবিরে গিয়া কিছু লাল বনাত, তরবারি এবং ছুরি উপহার দিল। রাজা তাহাদের প্রতি বেশ মিষ্ট ব্যবহার করিলেন এবং তাহাদের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ইংরাজেরা আমার বন্ধু; আমি তাহাদের কোন অনিষ্ট করিব না।"

সুরতের দুর্দ্দশা

সুরত ছাড়িবার সময় শিবাজী শহরের শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান বণিকদের নামে এই মর্ম্মে এক চিঠি পাঠাইলেন যে, যদি তাহারা তাঁহাকে বৎসর বৎসর বারো লাখ টাকা কর না দেয়, তবে তিনি আগামী বৎসর আসিয়া শহরের বাকী ঘরগুলিও পুড়াইয়া দিয়া যাইবেন।

যেই মারাঠারা সুরত হইতে বাহির হইল, অমনি শহরের গরিব লোকগুলি (যাহারা পলায় নাই) সব বাড়ীতে ঢুকিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুঠ করিতে লাগিল। ইংরাজ-কুঠীর জাহাজী-গোরারাও এই কাজে যোগ দিল।

যখন সুরতে তিনদিন ধরিয়া এই লুঠ চলিতেছিল, তখন পাঁচ-ছয় ক্রোশ পশ্চিমে সুহায়িলী বন্দরে ইংরাজদের গুদাম এবং কুঠীতে সুরত-কুঠীর সাহেবগুলি ছাড়া সুরত শহরের শাহ-বন্দর (অর্থাৎ জাহাজী মালের দারোঘা), প্রধান কাজী এবং বড় বড় হিন্দু মুসলমান ও আরমানী বণিক আশ্রয় লইয়াছিল। মারাঠারা আসিবে আসিবে বলিয়া দুই-একদিন একটা জনরব উঠিয়াছিল; সকলে তাহাতে ভীত ও চঞ্চল হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজেরা জেটীর ধারে আটটা তোপ রাখিয়া বন্দর রক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং কোনই বিপদ ঘটে নাই।

এইরূপে জনকতক বিদেশী দোকানদার মারাঠাদের তুচ্ছ করিয়া নিজেদের বল দেখাইল; আর 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা'-র শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যগণ ভয়ে পলাইল। এই দৃশ্য দেখিয়া দেশের লোক বিস্মিত হইল। সুরতের শ্রেষ্ঠ ধনী হাজি সাইদ্ বেগ্-এর পুত্র সুহায়িলীতে আশ্রয় পাইয়া বলিলেন, "আমি সপরিবারে বোম্বাই চলিয়া যাইব—বাদশাহী রাজ্যে আর বাস করিব না।"

একটা কথা আছে, বাঘে যাহাকে একবার ঘাল্ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সে লোক পরে বাঁচিলেও মরার শামিল হইয়া থাকে। শিবাজীর দুই-দুইবার বুঠের পরে সুরতেরও সেই দশা হইল। শিবাজী ঐদিকে আসিতেছেন, মারাঠা-সৈন্য সুরতের পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণে কোলী-দেশে ঢুকিয়াছে—এই সব জনরব ঘন ঘন সুরতে পৌঁছিতে লাগিল। আর অমনি লোকজন শহর ছাড়িয়া পলাইতে সুরু করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড বন্দর মরুদেশের মত নির্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। ইংরাজ ও অন্যান্য সাহেব-বণিকেরা নিজ কুঠী খালি করিয়া টাকা ও মাল তাড়াতাড়ি সুহায়িলীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বৎসরের পর বৎসর এইরূপ ঘাটতে লাগিল। ফলে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি একেবারে লোপ পাইল।

ডিণ্ডোরীর যুদ্ধ

৫ই অক্টোবর সুরত ছাড়িয়া শিবাজী দক্ষিণ-পূর্ব্বে বগলানা প্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং মূলের দুর্গের নীচের গ্রামগুলি লুঠিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শাহজাদা মুয়জ্জম দিলির খাঁর পিছু লইয়া প্রায় বুর্হানপুর পর্য্যন্ত যাইবার পর বাদশাহর হুকুমে সেখান হইতে সবেমাত্র আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়াছেন, এমন সময় তিনি দ্বিতীয়বার সুরত-লুঠের সংবাদ পাইলেন। তিনি অমনি দাউদ খাঁকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদ খাঁ চান্দোর-দুর্গের কাছে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, সেখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে ঐ লম্বা গিরিশ্রেণীর মধ্যে একটা সরু পথ দিয়া শিবাজী বগলানা হইতে নামিয়া উত্তর-মহারাষ্ট্রে (অর্থাৎ নাসিক জেলায়) ঢুকিবেন। মধ্যরাত্রে মুঘলদের চরেরা আসিয়া পাকা খবর দিল যে, শিবাজী ঐ গিরিসঙ্কট পার হইয়া অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া নাসিকের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন, আর তাঁহার বাকী অর্দ্ধেক সৈন্য মাল ও পশ্চাৎ রক্ষা করিবার জন্য ঐ গিরিসঙ্কটের মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

দাউদ খাঁ তৎক্ষণাৎ আবার অগ্রসর হইলেন। সেদিন কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশী; তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে চাঁদ ডুবিল, এবং অন্ধকারে মুঘল-সৈন্যগণ শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের অগ্রগামী বিভাগের নেতা ছিলেন—বিখ্যাত পাঠানবীর ইখ্লাস খাঁ মিয়ানা। প্রভাত হইলে (১৭ই অক্টোবর)

তিনি একটি ছোট পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলেন যে, নীচের মাঠে মারাঠারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুঘল-সৈন্যগণ উটের পিঠ হইতে বর্ম্ম ও অস্ত্র নামাইয়া সাজ করিতে লাগিল; কিন্তু ইখ্‌লাস খাঁর বিলম্ব সহিল না, তিনি জনকতক মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুদের আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মারাঠারা সংখ্যায় আট হাজার; তাহাদের বড় বড় নেতা—প্রতাপ রাও (সেনাপতি), আনন্দ রাও প্রভৃতি উপস্থিত।[8] শীঘ্রই ইখ্‌লাস খাঁ আহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দাউদ খাঁ আসিয়া পৌঁছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আরও সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রাতঃকাল হইতে ছয় সাত ঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ কাটাকাটি চলিল। মারাঠা বর্গীরা মুঘলদের চারিদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া ঘুরিতে লাগিল যেন তাহাদের সব পথ রোধ করিবে। দাউদ খাঁর দলের অনেকে মারা গেল, অনেকে আহত হইল। কিন্তু বুন্দেলা রাজপুতদের বন্দুকের ভয়ে মারাঠারা বেশী কাছে আসিল না। অবশেষে দাউদ খাঁ স্বয়ং রণক্ষেত্রে আসিয়া তোপের সাহায্যে শত্রুদের তাড়াইয়া দিলেন এবং নিজপক্ষীয় আহত লোকজনদের উদ্ধার করিলেন।

যখন বেলা দুই প্রহর তখন উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া খাইতে গেল। সন্ধ্যার আগে মারাঠারা আবার আক্রমণ করিল, তাহারা আট হাজার, আর দাউদ খাঁর সঙ্গে দু হাজার মাত্র লোক, তথাপি তোপের জোরে বাদশাহী দল রক্ষা পাইল। রাত্রিতে মারাঠারা কোঁকনের দিকে চলিয়া গেল; তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, একদিন এক রাত্রি মুঘলদের সেখানে থামাইয়া রাখিয়া তাহারা সুরত বগলানার লুঠ নিরাপদে দেশে লইয়া যাইতে পারিল।

ডিণ্ডোরীর যুদ্ধের ফলে ইহার পর এক মাসেরও অধিক কাল মুঘল-শক্তি নিস্তেজ হইয়া রহিল। দাউদ খাঁ আহত সৈন্যদের লইয়া নাসিকে এবং পরে আহমদনগরে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু এই বৎসরের শেষে (১৬৭০) তাঁহাকে আবার এখানে আসিতে হইল।

প্রথমবার বেরার ও বগলানা লুঠ

সুরত-লুঠের পর মারাঠারা দেড়মাস নিশ্চেষ্ট ছিল। কিন্তু ১৬৭০ সালের ডিসেম্বরের প্রথমে শিবাজী আবার সসৈন্য বাহির হইলেন; পথে চাণ্ডোর গিরিশ্রেণীতে অহিবন্ত ও অন্যান্য কয়েকটি উঁচু পাহাড়ী দুর্গ জয় করিয়া তিনি বগলানার মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে খান্দেশ প্রদেশে ঢুকিলেন এবং তাহার রাজধানী বুর্হানপুর শহরের বাহিরের গ্রামগুলি লুঠিলেন। তাহার পর হঠাৎ পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া উর্ব্বর ও ধনশালী বেরার প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এপর্য্যন্ত মারাঠারা এতদূর আসে নাই, কাজেই বেরারের কেহই এই বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। শিবাজী অবাধে মনের সুখে কারিঞ্জা নামক খুব সমৃদ্ধিশালী শহর হইতে এক কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন, অলঙ্কার ও মূল্যবান কাপড় লইলেন। লুঠের জিনিস চারি হাজার বলদ ও গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া এবং শহরের সমস্ত ধনী লোককে[9] টাকা আদায়ের জন্য বন্দী করিয়া শিবাজী বেরারের অন্যান্য শহরে চলিলেন, এবং সেখানে অগাধ ধন লুঠিলেন। সর্ব্বত্রই লোকেরা ভয়ে শিবাজীকে লিখিয়া দিল যে, তাহারা বৎসর বৎসর তাঁহাকে চৌথ, অর্থাৎ বাদশাহী খাজানার এক-চতুর্থাংশ, কর দিবে।

[8]শিবাজী এই যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং কার্ম্মারকরের আধুনিক ব্রঞ্জ প্যানেল ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী।

[9]কিন্তু কারিঞ্জার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ধরা পড়েন নাই। তিনি স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া নিরাপদে পলাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যেখানে শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত সেখানে কোনো মারাঠা সৈন্য স্ত্রীলোকের উপর হাত তুলিতে সাহস পাইবে না।

মুঘলেরা উপযুক্ত কোনই বাধা দিতে পারিল না। বেরারের বাদশাহী সুবাদার অলস ধীর নবাবী চালে চলেন, আর খান্দেশের সুবাদার এবং কুমার মুয়জ্জমের মধ্যে এমন ঝগড়া ছিল যে যুদ্ধ বাধে আর কি!

শিবাজী স্বয়ং যখন বেরারে যান তখন আর একদল মারাঠা সৈন্য পেশোয়া মোরো ত্র্যম্বকের অধীনে পশ্চিম-খান্দেশ লুঠিতে থাকে। এখন শিবাজী ফিরিয়া আবার বগলানায় আসিলে, এই দল তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বিখ্যাত সালের-দুর্গ জয় করিল (৫ই জানুয়ারি ১৬৭১), এবং মুলের, ধোড়প প্রভৃতি অন্যান্য বড় পার্ব্বত্য দুর্গ অবরোধ করিল, গ্রাম লুঠিল, শস্য চলাচল বন্ধ করিল। ফলতঃ এই অঞ্চলে মুঘলেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, অথচ তাহাদের আত্মরক্ষার মত বল বা বড় নেতা কেহ নাই।

শিবাজী ও ছত্রশাল বুন্দেলার সাক্ষাৎ

১৬৭০ সালের শেষভাগে যখন এই-সব যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন বিখ্যাত বুন্দেলা রাজা চম্পৎ রায়ের পুত্র ছত্রশাল শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ইনিই পরে পান্না-রাজ্য এবং ছত্রপুর শহর প্রতিষ্ঠা করিয়া, দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ১৭৩১ সালে মারা যান। কিন্তু এ সময় তিনি তরুণ যুবক মাত্র এবং দক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্যদলে অল্প বেতনের মনসবদার। এরূপ চাকরিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ছত্রশাল একদিন শিকারের ভাণ করিয়া সস্ত্রীক মুঘল-শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং ঘোরা পথ দিয়া মহারাষ্ট্রে পৌঁছিয়া শিবাজীর অধীনে বাদশাহর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনাপতির পদ চাহিলেন। কিন্তু শিবাজী দক্ষিণী ভিন্ন ভারতের অন্য প্রদেশের লোককে বিশ্বাস করিতেন না অথবা উচ্চপদ দিতেন না। তিনি ছত্রশালকে এই বলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিলেন—"বীরবর! যাও, নিজ দেশ অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন কর, আর শত্রু জয় কর। তোমার পক্ষে সেখানে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করাই শ্রেয়, কারণ তোমার বংশের খ্যাতির জন্য অনেকে তোমার সঙ্গে যোগ দিবে। যদি মুঘলেরা তোমাকে আক্রমণ করিতে আসে, আমি এদিক হইতে তাহাদের উপর গিয়া পড়িব; এবং এইরূপে দুই শত্রুর মধ্যে পড়িয়া তাহারা সহজেই পরাস্ত হইবে।" ছত্রশাল ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিলেন।[10]

শিবাজীর বগলানা অধিকার

সমস্ত ১৬৭০ সাল ধরিয়া শিবাজীর আশ্চর্য্য তেজ ও ক্ষিপ্র গতিবিধি, নানাক্ষেত্রে জয়লাভ, এবং অতি দূর দূর প্রদেশ লুঠ করা দেখিয়া বাদশাহ আওরংজীব বড়ই চিন্তিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি মহাবৎ খাঁকে দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে দাউদ খাঁকে রাখিয়া দিলেন। নিজ জাতভাই এবং অন্যান্য অনেক রাজপুত-সেনাসহ রাজা অমর সিংহ চন্দাবৎকে বিস্তর টাকা, গোলাবারুদ ও রসদ দিয়া মহারাষ্ট্রে পাঠান হইল।

---

[10]তিনি পরে কি করিলেন তাহার বিবরণ আমার *History of Aurangzeb vol. 5, ch. 81-এ ও Irvine's later Mughals, ii. ch. 9-এ আছে।

মহাবৎ খাঁ ১০ই জানুয়ারি ১৬৭১ আওরঙ্গাবাদে পৌঁছিয়া কিছুদিন পরে চাণ্ডোর জেলায় গেলেন, অমনি কিন্তু সহকারী দাউদ খাঁর সহিত তাঁহার ঝগড়া বাধিয়া গেল। তিন মাসে মুঘলেরা এখানে প্রায় কিছুই করিতে পারিল না। শিবাজী ধোড়প-দুর্গ অবরোধ করিয়া বিফল হইয়াছিলেন বটে (ডিসেম্বরের শেষ), কিন্তু পরের মাসে সালের-দুর্গ জয় করিলেন। মার্চ্চ মাসের প্রথমে দাউদ খাঁ মারাঠাদের হাত হইতে অহিবন্ত গড় কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার এই গৌরবে মহাবৎ খাঁ ঈর্ষায় ক্ষেপিয়া গেলেন। তাহার পর আর যুদ্ধ করা হইল না। প্রধান সেনাপতি সৈন্যসহ নাসিক এবং পরে পার্‌নের নগরে ছয় মাস ধরিয়া বিশ্রাম করিতে এবং বাঈজীদের নাচ দেখিতে লাগিল!

এই-সব শুনিয়া বাদশাহ বিরক্ত হইয়া অক্টোবর ১৬৭১ সালে বাহাদুর খাঁ ও দিলির খাঁকে গুজরাত হইতে মহারাষ্ট্রে পাঠাইলেন। এই দুই বিখ্যাত সেনাপতি সালের-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্যই ইখ্‌লাস খাঁ মিয়ানা, রাজা অমর সিংহ চন্দাবৎ এবং অন্য কর্ম্মচারীদের রাখিয়া, নিজেরা আহমদনগর হইয়া পুণা জেলা আক্রমণ করিলেন। দিলির খাঁ পুণ দখল করিয়া নয় বৎসরের কম বয়স্ক বালক ছাড়া আর-সব লোককে হত্যা করিলেন (ডিসেম্বর)। কিন্তু ইহার এক মাস পরেই মুঘলদের এক ভীষণ পরাজয় হইল। বগলানায় তাহাদের যে দল সালের-দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, ১৬৭২ জানুয়ারির শেষে প্রধান সেনাপতি প্রতাপ রাও, দ্বিতীয় সেনাপতি আনন্দ রাও এবং পেশোয়া মোরো ত্র্যম্বক অসংখ্য সৈন্য লইয়া হঠাৎ আসিয়া সেই মুঘলদলকে আক্রমণ করিলেন; তাহারা প্রাণপণ লড়িল, কিন্তু সংখ্যায় কম বলিয়া পারিয়া উঠিল না। রাজা অমর সিংহ এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতি এবং হাজার হাজার সাধারণ সিপাহী মারা গেল, আর অমর সিংহের পুত্র মুহকম্‌ সিংহ, ইখ্‌লাস খাঁ এবং ৩০ জন প্রধান কর্ম্মচারী আহত ও বন্দী হইল; তাহাদের সমস্ত মালপত্র ও তোপ মারাঠারা লইয়া গেল।

তাহার পরই পেশোয়া মুলের-দুর্গ জয় করিলেন। ইহার ফলে সমস্ত বগলানা প্রদেশে মারাঠা আধিপত্য নিষ্কণ্টক হইল। বগলানা সুরত যাইবার পথ। চারিদিকে শিবাজীর নাম ছড়াইয়া পড়িল, সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। মুঘল-সেনাপতি দুইজন (বাহাদুর ও দিলির) যুদ্ধে বিফল হইয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া নিজ সীমানায় আহমদনগরে ফিরিয়া আসিলেন। পুণা ও নাসিক জেলা (অর্থাৎ মারাঠাদের দেশ) বাঁচিল।

এদিকে মার্চ্চ মাসে সৎনামী বিদ্রোহ এবং এপ্রিল মাসে খাইবার গিরিসঙ্কটের পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় আওরংজীব এত বিব্রত হইলেন যে কিছুদিন ধরিয়া দক্ষিণে আর সৈন্য ও টাকা পাঠান অসম্ভব হইল। জুন মাসে (১৬৭২) শাহজাদা মুয়জ্জমের স্থানে বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কুমার ও মহাবৎ খাঁ দুজনেরই উত্তর-ভারতে ডাক পড়িল।

কোলী-দেশ অধিকার

তাহার পর শিবাজীর জয়জয়কার। সুরত হইতে দক্ষিণে বম্বের দিকে আসিতে যে পাহাড় ও জঙ্গলপূর্ণ দেশ পার হইতে হয়, তাহাতে কোলী নামক অসভ্য দস্যুজাতির বাস। সে সময় এখানে ইহাদের দুইটি ছোট রাজ্য ছিল;—ধরমপুর (রাজধানী রামনগর, বর্ত্তমান নাম 'নগর', সুরতের ৬০ মাইল দক্ষিণে) এবং জওহার (রামনগরের ৪০ মাইল দক্ষিণে)। এই রামনগরের ঠিক পূর্ব্বদিকে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতশ্রেণী পার হইলে নাসিক জেলা বা উত্তর-মহারাষ্ট্র। ১৬৭২ সালের ৫ই জুন পেশোয়া

মোরো ত্র্যম্বক জওহার অধিকার করিলেন। সেখানকার রাজা বিক্রম শাহ মুঘল-রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। ইহার অল্পদিন পরে রামনগরও দখল করা হইল, তাহার রাজা সোমসিংহ পোর্তুগীজ শহর দামনে আশ্রয় লইলেন।

মারাঠারা এত কাছে স্থায়ী আড্ডা গাড়াতে সুরত শহর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রামনগরে বসিয়া পেশোয়া সুরতের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান বণিকদের নামে উপরি উপরি তিনখানা পত্র পাঠাইয়া চারিলক্ষ টাকা কর চাহিলেন এবং বলিলেন যে, এই টাকা না দিলে তিনি সুরত দখল করিবেন। শেষ চিঠিতে শিবাজীর জবানী এইরূপ লেখা ছিল:—"আমি তিনবারের বার এই শেষবার তোমাদের বলিতেছি যে, সুরত প্রদেশের খাজনার এক সিকি অর্থাৎ চৌথ আমাকে পাঠাইয়া দাও। তোমাদের বাদশাহ আমাকে নিজ দেশ ও প্রজা রক্ষা করিবার জন্য প্রকাণ্ড সৈন্যদল রাখিতে বাধ্য করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার প্রজারাই এই সৈন্যদলের খরচ জোগাইবে। যদি এই টাকা শীঘ্র না পাঠাও, তবে আমার জন্য একটা বড় বাড়ী প্রস্তুত রাখিও, আমি গিয়া সেখানে বসিয়া থাকিব এবং সুরতের খাজনা এবং মালের মাশুল আদায় করিয়া লইব। এখন আমাকে বাধা দিতে পারে এমন লোক তোমাদের মধ্যে কেহ নাই।"

এই পত্র পাইবার পর সুরতে পরামর্শের জন্য সভা বসিল। শহরবাসী এবং আশপাশের গ্রামের প্রধান লোকদিগের উপর তিনলক্ষ টাকা চাঁদা তোলার ভার দেওয়া হইল। কিন্তু অনেক আলোচনার পর লোকেরা কিছুই দিল না, কারণ তাহারা বেশ জানিত যে শহরের মুঘল-শাসনকর্ত্তা সব টাকা নিজে খাইয়া ফেলিবে, মারাঠাদের শান্ত করিবার জন্য কিছুই দিবে না।

তাহার পর যতবারই মারাঠারা এদিকে আসিতেছে বলিয়া গুজব উঠিত, ততবারই সুরতবাসীরা পলাইবার পথ খুঁজিত। এই কাণ্ড অনেক বৎসর ধরিয়া চলিল।

১৬৭২, জুলাই মাসে পেশোয়া নাসিক জেলায় ঢুকিয়া লুঠপাঠ আরম্ভ করিলেন। সেখানকার দুইজন মুঘল-থানাদার পরাস্ত হইয়া পলাইল। অক্টোবর নবেম্বর মাসে মারাঠা অশ্বারোহীরা দ্রুতবেগে বেরার ও তেলিঙ্গানায় প্রবেশ করিয়া রামগির জেলা লুঠ করিতে লাগিল। মুঘল সেনাপতি বাহাদুর খাঁ কিছুতেই তাহাদের ধরিতে পারিলেন না। তাহারা দ্রুতগতি নিজদেশে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মুঘলেরা পিছু পিছু থাকিয়া তাহাদের হাত হইতে অনেক লুঠ করা ঘোড়া ও বণিকদের মাল উদ্ধার করিল। আওরঙ্গাবাদের কাছে একটি ছোট যুদ্ধে মারাঠারা পরাস্ত হইল। ফলতঃ তাহাদের এবারকার বেরার-আক্রমণ প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল।

বিজাপুরের সহিত শিবাজীর সন্ধিভঙ্গ

পর বৎসর (১৬৭৩) মহারাষ্ট্রে তেমন কোন বড় যুদ্ধ বা বিশেষ লাভ-লোকসান হইল না। সুবাদার বাহাদুর খাঁ ভীমা নদীর তীরে পেড়গাঁও-এ শিবির স্থাপন করিয়া পথঘাটের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন।

এই বৎসর শিবাজী নিজ জন্মস্থান শিবনের-দুর্গ অধিকার করিবার এক চেষ্টা করেন। আওরংজীব এই দুর্গটি আবদুল আজিজ খাঁ নামক একজন ব্রাহ্মণ মুসলমানের জিম্মায় রাখিয়াছিলেন। সেই লোকটি যেমন বিশ্বাসী তেমনি চতুর ও কার্য্যদক্ষ। শিবাজী তাহাকে "পর্ব্বতপ্রমাণ টাকার স্তূপ"

ঘুষ দিতে চাহিলেন, আর সেও সম্মতির ভাণ করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট রাত্রে দুর্গ দিয়া দিবে বলিয়া স্বীকার করিল। সেই রাত্রে শিবাজীর সাত হাজার সৈন্য দুর্গের কাছে পৌঁছিল। কিন্তু আবদুল আজিজ ইতিমধ্যে বাহাদুর খাঁকে গোপনে খবর দিয়াছিল। মারাঠারা আসিয়া ফাঁদে পড়িল। তাহাদের অনেকে মরিল, অনেকে জখম হইল, বাকি সকলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

কিন্তু অন্যদিকে শিবাজীর এক মহাসুযোগের পথ খুলিয়া গিয়াছিল। ২৪এ নবেম্বর (১৬৭২) বিজাপুরের রাজা দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার স্থানে চারি বৎসরের শিশু সিকন্দর রাজা হইলেন। তাঁহার অভিভাবক পদ লইয়া বিজাপুরের বড় বড় ওমরাদের মধ্যে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। রাজ্যময় গোলমাল ও বিদ্রোহ দেখা দিল। বিজাপুরের নূতন উজীর খাওয়াস্ খাঁর সহিত শিবাজী আর পূর্ব্বের সদ্ভাব বজায় রাখিলেন না, ঐ রাজ্যে উৎপাত সুরু করিয়া দিলেন।

পনহালা জয়

১৬৭৩, ৬ই মার্চ্চ, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রিতে শিবাজীর সেনাপতি কোণ্ডাজী ফর্জন্দ ষাটজন বাছা বাছা মাব্‌লে পদাতিক লইয়া নিঃশব্দে পনহালা-দুর্গের উপরে চড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পরকে পাহাড়ের প্রায় খাড়া গা বাহিয়া টানিয়া তুলিল। চূড়ায় পৌঁছিয়া তাহারা চারিদলে ভাগ হইয়া চারিদিক হইতে ভেরী বাজাইয়া দুর্গের মধ্যে ছুটিয়া চলিল। গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে, বাহিরের সমতলভূমি হইতে নহে, দুর্গের মধ্য হইতে এই হঠাৎ আক্রমণে দুর্গরক্ষকেরা হতভম্ব হইয়া পড়িল। চারিদিকে ছুটাছুটি ও পলায়ন আরম্ভ হইল। কোণ্ডাজী স্বয়ং দুর্গস্বামীকে তরবারি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। হিসাবের প্রধান কর্ম্মচারী নাগোজী পণ্ডিত গোলমাল শুনিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া একজন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" সে বলিল, "আরে ঠাকুর! জান না মারাঠারা দুর্গ লইয়াছে, আর দুর্গস্বামী মারা পড়িয়াছেন?" অমনি নাগাজী সর্বস্ব ছাড়িয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। ধরা পড়িলে তাঁহাকে মারিয়া টাকাকড়ি আদায় করা হইত।

তখন নীচ হইতে আর-সব মারাঠা সৈন্য দুর্গে ঢুকিল। ক্রমে প্রভাত হইল। সমস্ত দুর্গ শিবাজীর অধিকারে আসিল[11]। বিজাপুরী কর্ম্মচারীদের নিজের, এবং সরকারী সব ধনসম্পত্তি কোথায় লুকান আছে প্রহারের চোটে জানিয়া লইয়া মারাঠারা তাহা দখল করিল। সংবাদ পাইয়া শিবাজী নিজে শীঘ্র আসিয়া দুর্গটি দেখিলেন, এবং সেখানে একমাস থাকিয়া দেওয়াল মজবুত করিয়া, আরও কামান আনাইয়া পনহালাকে নিজের অজেয় আশ্রয়স্থলে পরিণত করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পারলি এবং সাতারা দুর্গও তাঁহার লাভ হইল।

উমরাণীর যুদ্ধ

এতগুলি দুর্গ হাতছাড়া হওয়ায় বিজাপুরের রাজসভায় মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। নূতন উজীর

[11] জেধে শকাবলীতে লেখা আছে যে শিবাজী ঘুষ দিয়া (দুর্গের একদিককার রক্ষীদের হাত করিয়া) পনহালা দখল করেন। আমারও তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ এমন অজেয় দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য তেমন কোন চেষ্টাই হয় নাই।

খাওয়াস্ খাঁর অবহেলায় এই সব ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সকলে তাঁহাকে দোষ দিতে লাগিল। বহলোল খাঁকে পনহালা উদ্ধার করিতে পাঠান হইল, এবং আর তিনজন বড় সেনাপতিকে দূর দূর প্রদেশ হইতে নিজ সৈন্য সহিত আসিয়া বহলোলকে সাহায্য করিবার জন্য হুকুম গেল।

কিন্তু এই সকল সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিবাজী বহলোলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি প্রতাপ রাও পনের হাজার অশ্বারোহীসহ দুই রাত্রি গোপনে দ্রুত কুচ করিয়া আসিয়া উমরাণী নামক গ্রামে (বিজাপুর শহরের ১৮ ক্রোশ পশ্চিমে) বহলোলের সৈন্যদলকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদের জলাশয়ে যাইবার একমাত্র পথ বন্ধ করিয়া দিলেন (১৫ই এপ্রিল)। পরদিন প্রাতে মারাঠারা দলে দলে ঢেউয়ের মত বারবার বিজাপুরী-সৈন্যদের আক্রমণ করিল। সারাদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল; অনেকে মরিল, অনেকে আহত হইল। বহলোলের আফঘান-সৈন্যগণ প্রাণপণে লড়িয়া নিজস্থান রক্ষা করিল। অবশেষে রণক্ষেত্রে সন্ধ্যা নামিল। দুই পক্ষ ক্লান্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু বিজাপুরীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক বিন্দু জল জুটিল না।

তখন বহলোল গোপনে প্রতাপ রাওকে অনেক টাকা ঘুষ পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, “আমাকে পলাইয়া যাইবার জন্য একদিকের পথ ছাড়িয়া দাও। তোমরা আমার শিবিরের সব জিনিস লইও।” তাহাই করা হইল। বহলোল রাতারাতি শত্রুব্যূহের মধ্যে একটি ফাঁক দিয়া কুচ করিয়া বিজাপুরে ফিরিয়া গেলেন। একথা শুনিয়া শিবাজী অত্যন্ত রাগিয়া প্রতাপ রাওকে তিরস্কার করিলেন।

তাহার পর কয়েক মাস ধরিয়া কানাড়া প্রদেশে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন পক্ষেই বড় কিছু হইল না। শিবাজী চারিদিকে অবাধগতিতে চলাফেরা ও লুঠ করিতে লাগিলেন। ১০ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন তিনি স্বয়ং কানাড়া আক্রমণ করিতে রওনা হইলেন। কিন্তু দুই মাস পরেই বিজাপুরীরা তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরিতে বাধ্য করিল। এবার তাঁহার তেমন কিছু লাভ হইল না।

সেনাপতি প্রতাপ রাও-এর মৃত্যু

এই পরাজয়ের অপমান মুছিয়া ফেলিবার জন্য ১৬৭৪, জানুয়ারি মাসে শিবাজী প্রতাপ রাওকে আবার পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, “বহলোল আমার রাজ্যে বার-বার আসিতেছে। তুমি সৈন্য লইয়া যাও এবং তাহাকে চূড়ান্তরূপে পরাস্ত কর। নচেৎ আর কখন আমাকে মুখ দেখাইও না।”

প্রভুর তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতাপ রাও বহলোলের খোঁজে বাহির হইলেন এবং কোলাপুরের ৪৫ মাইল দক্ষিণে ঘাটপ্রভা নদীর কিছু দূরে নেসরী নামক গ্রামে তাঁহাকে পাইলেন। বিজাপুরী-সৈন্য দেখিবামাত্র প্রতাপ রাও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের উপর গিয়া পড়িলেন। শুধু ছয়জন অনুচর তাঁহার সঙ্গে চলিল, বাকী সৈন্য এই পাগলের কাণ্ড দেখিয়া পিছাইয়া রহিল। কিন্তু প্রতাপ রাও-এর পশ্চাতে দৃষ্টি নাই, কথা শুনিবার সময় নাই। তাঁহার সম্মুখে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটি সরু পথ, ও-পারে বহলোলের লোক দাঁড়াইয়া। এই পথে ঢুকিয়া শত্রুবেষ্টিত প্রতাপ ও তাঁহার ছয়জন সঙ্গী শীঘ্রই নিহত হইলেন। তখন বিজাপুরীরা বিজয় উল্লাসে মারাঠাদের উপর ছুটিয়া আসিয়া অনেককে কাটিয়া ফেলিল, "রক্তের নদী বহিল।" (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৬৭৪)।

অন্যান্য যুদ্ধ

আনন্দ রাও ছত্রভঙ্গ মারাঠা-সৈন্যগণকে সাহস দিয়া আবার একত্র করিলেন। শিবাজী তাঁহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "শত্রুকে পরাজিত না করিতে পারিলে জীবন্ত ফিরিও না।" তখন আনন্দ রাও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিজাপুর রাজ্যের মধ্যে ঢুকিলেন। দিলির ও বহলোল খাঁ মিলিত হইয়া তাঁহার পথ রোধ করিলেন। কিন্তু আনন্দ রাও প্রত্যহ ৪৫ মাইল করিয়া এত দ্রুত কুচ করিলেন যে দুই খাঁ-ই অপারক হইয়া পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পর আনন্দ রাও দক্ষিণে ঘুরিয়া কানাড়ায় প্রবেশ করিলেন। সাঁপগাঁও শহরের বাজার (পেঠ) লুঠিয়া সাড়ে সাত লাখ টাকা পাইলেন (২৩ মার্চ্চ)। দশ ক্রোশ দূরে বঙ্কাপুর নগরের কাছে বহলোল ও খিজির খাঁর অধীনে একদল বিজাপুরী-সৈন্য পরাস্ত করিয়া পাঁচ শত ঘোড়া দুইটি হাতী এবং শত্রুদলের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বহলোল শীঘ্রই ফিরিয়া প্রচণ্ড বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা এক হাজার ঘোড়া ও লুঠের মালের কতক ফেলিয়া দিয়া হালকা হইয়া অবশিষ্ট লুঠ লইয়া নিরাপদে নিজ দেশে ফিরিল।

৮ই এপ্রিল শিবাজী চিপলুন নগরে এইসব বিজয়ী সৈন্যদের মহলা (রিভিউ) দেখিলেন, তাহাদের অনেক পুরস্কার দিলেন, এবং হংসাজী মোহিতেকে "হাম্বীর রাও" উপাখি দিয়া প্রতাপ রাও-এর স্থানে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৬৭৩ সালের ডিসেম্বর হইতে পর বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কোঁকনে ও অন্যত্র যুদ্ধ খুব ঢিলা তালে চলিল। দুই পক্ষেই সৈন্যেরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া কাজে গা লাগাইল না। তাহাদের নেতারাও যুদ্ধ করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করা অপেক্ষা লুঠতরাজ অধিক লাভজনক দেখিয়া তাহাতেই মন দিল। এই বৎসর শীতকালে অতিবৃষ্টি হওয়ায় মহারাষ্ট্রে মড়ক দেখা দিল। তাহাতে অনেক ঘোড়া ও মানুষ মরিল।

বাদশাহ ৭ই এপ্রিল (১৬৭৪) দিল্লী হইতে রওনা হইয়া উত্তর-পশ্চিমে আফগান-সীমানায় গেলেন, কারণ খাইবার পর্ব্বতের আফ্রিদি জাতি ভীষণ বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরাইয়া আনা হইল। সেখানে বাহাদুর খাঁ একা পড়িয়া রহিলেন; তাঁহার পক্ষে এত কম সৈন্য লইয়া কিছু করা অসম্ভব হইল। এই সুযোগে শিবাজী মহা আড়ম্বরে নিজের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় : রাজ্যাভিষেক

অভিষেকের আবশ্যকতা

শিবাজী অনেক দেশ জয় এবং অগাধ ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিজকে ছত্রপতি অর্থাৎ স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইহাতে তাঁহার অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছিল। প্রথমতঃ, অপর রাজারা তাঁহাকে বিজাপুরের অধীন জমিদার অথবা জাগীরদার মাত্র বলিয়া গণ্য করিতেন; বিজাপুরের কর্ম্মচারীদের চক্ষে তিনি বিদ্রোহী প্রজা মাত্র। আর, অন্যান্য মারাঠী জমিদার-বংশও ভোঁশলেদিগকে নিজেদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিত না; বরং তাহাদের মধ্যে অতিপুরাতন ঘরগুলি (যেমন, মোরে, যাদব, নিম্বলকর প্রভৃতি) শাহজী শিবাজীকে ভূঁইফোড় অকুলীন বলিয়া অবজ্ঞা করিত। শিবাজীর প্রজারাও মহাসঙ্কটে পড়িয়াছিল, কারণ যতদিন তিনি ছত্রপতি বলিয়া গণ্য না হন, ততদিন আইন অনুসারে তাহারা নিজেদের পূর্ব্বেকার রাজার প্রজা, শিবাজীর শাসন মানিতে বাধ্য ছিল না। তাঁহার ভূমিদান এবং নিয়োগপত্র আইন অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারিত না।

সুতরাং শিবাজী নিজের অভিষেক করিয়া 'ছত্রপতি' উপাধি লইয়া জগৎকে দেখাইলেন যে তিনি স্বাধীন রাজা, তাঁহার অধীন প্রজাগণ তাঁহাকেই মানিবে, অন্য কোন প্রভুর ক্ষমতা স্বীকার করিবে না। ইহা ভিন্ন মহারাষ্ট্রের সকল উচ্চমনা দেশসেবকই দেশে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব—"হিন্দবী স্বরাজ"—স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। একমাত্র শিবাজীই এই জাতীয় বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারেন।

অভিষেকের আয়োজন

কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন জাতের লোক হিন্দুর রাজা হইতে পারে না; অথচ সে যুগে সমাজে ভোঁশলে বংশকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা হইত। তখন শিবাজীর মুনশী বালাজী আবজী মারাঠা জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কাশীবাসী বিশ্বেশ্বর ভট্ট (ডাক-নাম গাগা ভট্ট)কে অনেক টাকা দিয়া হাত করিলেন। ভট্ট মহাশয় শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া এবং তাঁহার আদিপুরুষ যে সূর্য্যবংশীয় চিতোরের মহারাণার পুত্র—ইহা স্বীকার করিয়া এক পাঁতি লিখিয়া দিলেন এবং তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ায় প্রধান পুরোহিত হইতে সম্মত হইলেন। গাগা ভট্ট দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—"চারি বেদ ও

ছয় শাস্ত্রে যোগাভ্যাস-সম্পন্ন, জ্যোতিষী, মন্ত্রিক, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, কলিযুগের ব্রহ্মদেব" [সভাসদ বখর]। তাঁহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে পারে এমন শক্তি বা সাহস মহারাষ্ট্রে তখন কোন ব্রাহ্মণের ছিল না। সুতরাং শাস্ত্রীয় তর্কে পরাস্ত হইবার ভয়ে এবং মোটা দক্ষিণার লোভে সকলেই শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিল।

তাহার পর কয়েকমাস ধরিয়া মহাব্যয়ে অভিষেকের নানা আয়োজন করা হইল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই পণ্ডিতরা নিমন্ত্রিত হইলেন। সে সময় রাস্তা-ঘাট এবং ভ্রমণের সুবিধা ছিল না বলিলই হয়; তথাপি এগার হাজার ব্রাহ্মণ—তাহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া পঞ্চাশ হাজার লোক—রায়গড়-দুর্গে উপস্থিত হইল এবং চারি মাস ধরিয়া রাজার খরচে মিঠাই-পক্কান্ন খাইতে থাকিল।

অভিষেকের পূর্ব্বে আবশ্যক সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে শিবাজী নিজ গুরু রামদাস স্বামী এবং মাতা জীজা বাঈকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইলেন।

শিবাজী ও শাতকর্ণীর তুলনা

জীজা বাঈ-এর আজ আনন্দের সীমা নাই। যৌবনের শেষ হইতে স্বামীর অবহেলা সহ্য করিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর মত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছেন। পুত্রের আজীবন ভক্তিতে তিনি সে দুঃখ ভুলিয়া ছিলেন। আর, সেই পুত্রের পবিত্র চরিত্র, দয়াদাক্ষিণ্য, এবং অজেয় বীরত্বের খ্যাতিতে জগৎ পূর্ণ। আজ তাঁহার পুত্র স্বদেশবাসীদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়াছে, হিন্দু নরনারীকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করিয়াছে; এমন রাজার জননী বলিয়া আজ তিনি দেশপূজ্যা। পনের শত বৎসর পূর্ব্বের এই মহারাষ্ট্র দেশের আর এক রাজ-জননী অন্ধ্ররাজ শ্রীশাতকর্ণীর মাতা গোতমীর ভাষায় তিনিও বিজয়ী ধার্ম্মিক পুত্রের গুণগান করিয়া যেন বলিতেছেন :—

"আমি মহারাণী গোতমী বালশ্রী, রাজরাজ শ্রীশাতকর্ণীর মাতা। আমার পুত্রের মাতৃশুশ্রূষা অবাধ, পৌরজনের সুখ-দুঃখে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি, সে শক-যবন-পহ্লব-ধ্বংসকারী, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের গৃহসম্পদ বাড়াইয়াছে ক্ষহরাত বংশ নিঃশেষ করিয়াছে, চারিবর্ণের মিশ্রণ থামাইয়া দিয়াছে, অনেক যুদ্ধে শত্রুদলকে জয় করিয়াছে, সে সৎপুরুষদিগের আশ্রয়, লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, দক্ষিণাপথের ঈশ্বর ......"[12]

শুধু তাঁহার জীবনের এই পূর্ণ সফলতা দেখাইবার জন্যই যেন ভগবান জীজা বাঈকে এতদিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ, শিবাজীর অভিষেকের বারো দিন পরেই তাঁহার আত্মা আশী বৎসর বয়সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

[12]মহাদেব্যা গোতমী বালশ্রী মাতুঃ রাজরাজস্য শ্রীশাতকর্ণেঃ গোতমীপুত্রস্য-অবিপন্ন মাতৃশুশ্রূষাকবস্য—পৌরজন নির্বিশেষ সমসুখদুঃখস্য—শকযবন-পল্হব-নিসূদনস্য—দ্বিজাবর-কুটুম্ব-বিবর্দ্ধনস্য—খখবাত বংশ-নিরবশেষকাবস্য—বিনিবর্ত্তিত-চাতুর্বর্ণ সংকরস্য—অনেক সমরাবজীত শত্রু-সংঘস্য—সৎপুরুষাণাম্ আশরস্য—শ্রিয়া অধিষ্ঠানস্য—দক্ষিণাপথেশ্বরস্য ...[Epigraphia Indica, viii, 60. নাসিক-গুহার শিলালিপি সংস্কৃত অনুবাদ]।

তীর্থদর্শন ও প্রায়শ্চিত্ত

তাহার পর শিবাজী তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া চিপ্‌লুন তীর্থে পরশুরামের পূজা করিলেন এবং প্রতাপগড়ে গিয়া নিজ ইষ্ট দেবী ভবানীকে সওয়া মণ ওজনের সোনার ছাতা উপহার দিয়া আরাধনা করিলেন। ২৯এ মে রায়গড়ে ফিরিয়া অনেক দিন ধরিয়া প্রত্যহ স্থানীয় দেব-দেবীর পূজায় ব্যস্ত রহিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্ষত্রিয়াচার না করিয়া যে পতিত (বা শূদ্র) হইয়াছিল, তাহার জন্য শিবাজী ২৮এ মে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; এবং গাগা ভট্ট তাঁহাকে উপবীত পরাইয়া ক্ষত্রিয় করিয়া দিলেন। তখন শিবাজী বলিলেন, "আমি দ্বিজ হইয়াছি; সকল দ্বিজের বেদাধিকার আছে, সুতরাং আমার ক্রিয়াকাণ্ডে বৈদিক মন্ত্র পড়িতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সমবেত ব্রাহ্মণেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, বলিল, "কলিযুগে ক্ষত্রিয় জাত লোপ পাইয়াছে, এখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ দ্বিজ নহে।" তাহারা টাকার লোভে ভোঁশলে বংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বকার করিয়াছিল, নচেৎ অভিষেক হয় না, আর ব্রাহ্মণেরা এত লক্ষ টাকার দক্ষিণা ও সিধা পায় না। কিন্তু এখন তাহাদের প্রথম মতের ন্যায়সঙ্গত ফল দেখিয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। স্বয়ং গাগা ভট্টও ভয় পাইলেন, এবং একটা গোঁজামিল দিয়া তাড়াতাড়ি গোলমাল মিটাইয়া ফেলিলেন। অভিষেকে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইল না, কিন্তু শিবাজী বিবাহে (৩০এ মে) ঐ মন্ত্র ব্যবহার করিলেন।

এই ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত ও উপবীত-ধারণে মহাসমারোহ ও অগাধ টাকা দান করা হইল; গাগা ভট্ট "মুখ্য অধ্বর্য্যু" বলিয়া ৩৫ হাজার টাকা পাইলেন; অপর ব্রাহ্মণ-সাধারণের মধ্যে ৮৫ হাজার টাকা বিতরিত হইল।

পরদিন শিবাজী জ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্বকৃত পাপ মোচনের জন্য তুলা করিলেন, অর্থাৎ সোনা-রূপা-তামা প্রভৃতি সপ্ত ধাতু, সূক্ষ্ম বস্ত্র, কর্পূর, লবণ, মশলা, ঘৃত, চিনি, ফল ও খাদ্য প্রভৃতি নানা জিনিস তাঁহার দেহের সমান (দুই মণের কিছু কম) ওজন করিয়া লইয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ইহা ভিন্ন তাঁহার দেশলুণ্ঠনে যে গো ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক ও শিশু মারা পড়িয়াছিল সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ শিবাজী আট হাজার টাকা ব্রাহ্মণদের দান করিলেন।

অভিষেকের আগের দিন শিবাজী সংযম করিয়া রহিলেন। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া গাগা ভট্টকে ২৫ হাজার এবং অন্যান্য বড় বড় ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে পাঁচ শত করিয়া টাকা দিলেন।

শিবাজীর অভিষেক-স্নান

জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্ল ত্রয়োদশী (৬ই জুন, ১৬৭৪) অভিষেকের শুভদিন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া শিবাজী প্রথমে মঙ্গলস্নান এবং কুলদেবদেবী—মহাদেব ও ভবানীর–পূজা, কুলগুরু বাল্‌ম ভট্ট, পুরোহিত গাগা ভট্ট এবং অন্যান্য বড় বড় পণ্ডিত ও সাধুগণকে বন্দনা এবং বস্ত্রালঙ্কার দান শেষ করিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর শুদ্ধ শ্বেতবস্ত্র পরিয়া, মালা চন্দন স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া অভিষেক-স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলেন। সেখানে দুই ফুট লম্বা চওড়া ও উঁচু এক সোনার চৌকীতে বসিলেন। তাঁহার

পাশে বসিলেন রাণী সোইরা বাঈ, সহধর্ম্মিণী বলিয়া রাণীর আঁচল শিবাজীর আঁচলে গির বাঁধিয়া দেওয়া হইল। কিছু পশ্চাতে যুবরাজ শম্ভুজী বসিলেন। আট কোণে আটটি সুবর্ণ কলস এবং আটটি ছোট ভাঁড় ভরিয়া গঙ্গা প্রভৃতি সপ্ত মহানদী ও অন্যান্য বিখ্যাত নদ-নদী-সমুদ্র এবং তীর্থস্থলের জল আনিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক কলসের কাছে অষ্টপ্রধানের এক একজন দাঁড়াইয়া। তাঁহারা ঠিক মুহূর্ত্তে ঐ জল শিবাজী, রাণী ও রাজপুত্রের মাথায় ঢালিয়া দিলেন; আর শ্লোক-পাঠ ও মঙ্গলবাদ্যে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। ষোলজন সধবা ব্রাহ্মণী সুশোভন বস্ত্র পরিয়া সোনার থালায় পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া তাঁহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া মঙ্গল আরতি করিলেন।

তাহার পর ভিজা কাপড় ছাড়িয়া, রাজার যোগ্য জরির কাজ করা লাল বস্ত্র এবং মণিমুক্তাহীরা বসান নানাপ্রকার উজ্জ্বল অলঙ্কার পরিয়া, গলায় ফুলের মালা ও মাথায় মুক্তার অসংখ্য ঝালরে সজ্জিত পাগড়ী দিয়া, শিবাজী নিজ ঢাল তলোয়ার তীর ও ধনুকের “অস্ত্রপূজন” করিলেন, এবং এই উপলক্ষে আবার ব্রাহ্মণদের চরণ বন্দনা (তথা দক্ষিণা দান) করিলেন।

সিংহাসন-গৃহের সজ্জা

অবশেষে তিনি সিংহাসন-গৃহে ঢুকিলেন। এই ঘরের সজ্জায় অগাধ ধনরত্ন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছাদের নীচে জরির শামিয়ানা খাটান, তাহা হইতে লহরে লহরে মুক্তার মালা ঝুলিতেছিল। মেঝেতে মখমল বিছান : মধ্যস্থলে বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত অশেষ কারুকার্য্যে শোভিত, “অমূল্য নবরত্নে খচিত” এক প্রকাণ্ড সোনার সিংহাসন। সিংহাসনের তলদেশ সোনার চাদর দিয়া মোড়া; আট কোণে আটটি স্তম্ভ, মণিবসান সোনার পাতে জড়ান। আর এই আটটি থামের মাথায় চক্‌মকে জরির চাঁদোয়া বাঁধা, তাহার স্থানে স্থানে মুক্তার গুচ্ছ হীরক পদ্মরাগ প্রভৃতি ঝুলিতেছে। রাজার বসিবার গদী ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর মখমল দিয়া ঢাকা। গদীর পশ্চাতে রাজছত্র।

সিংহাসনের দুই পাশে নানা প্রকার রাজচিহ্ন সোনার জল করা বল্লম হইতে ঝুলিতেছিল,— যেমন, ডানদিকে দুইটি প্রকাণ্ড মাছের মাথা (মুঘলদিগের মাহী মুরাতিব্), বামে ঘোড়ার লেজের চামর (তুর্কীজাতীয় রাজচিহ্ন) এবং ওজনের মানদণ্ড (ইহা ন্যায়বিচারের চিহ্ন, প্রাচীন পারস্য-রাজ্য হইতে লওয়া)। রাজদ্বারের বাহিরে দুইদিকে পাতায় মুখ ঢাকা জলের ঘট সাজান, এবং তাহার পর দুটি হস্তিশাবক ও দুটি সুন্দর ঘোড়া; তাহাদের সাজ ও লাগাম সোনা ও মণি দিয়া কাজ করা।

শিবাজীর সিংহাসনে অধিবেশন ও ছত্রধারণ

নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে শিবাজী পূজ্যগণকে নমস্কার করিয়া সিংহাসনের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গদীতে বসিলেন। অমনি মুঠা মুঠা রত্নখচিত সোনার পদ্ম ও অন্যান্য সোনা-রূপার ফুল সভাসদ্‌গণের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। আবার ষোলজন সধবা ব্রাহ্মণী সু-বাস পরিয়া সোনার পঞ্চপ্রদীপ তাঁহার চারিদিকে ঘুরাইয়া অমঙ্গল দূর করিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্লোক আওড়াইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, শিবাজী নতশিরে তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। জনসাধারণ আকাশ ফাটাইয়া চেঁচাইতে লাগিল—“জয়, শিবরাজের জয়। শিব ছত্রপতির জয়।” একসঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া

উঠিল; আর, বাহিরে মহারাষ্ট্র দেশের সব দুর্গ হইতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোপের আওয়াজ করা হইল। দেশ জানিল যে নিজের রাজা পাইয়াছে।

প্রথমে অধ্বর্য্যু গাগা ভট্ট, তাহার পর অষ্টপ্রধান ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অগ্রসর হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিবাজীর মাথার উপর রাজছত্র ধরা হইল। তিনি সকলকে গণনাতীত ধন দিলেন। "দানপদ্ধতি-অনুযায়ী ষোড়শ মহাদান ইত্যাদি দানগুলি সম্পন্ন করিলেন।" সিংহাসনের আট কোণে অষ্টপ্রধান অর্থাৎ মন্ত্রিগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহাদের পদের পারসিক ভাষার নাম বদলাইয়া সংস্কৃত নাম দেওয়া হইল,—যেমন পেশোয়ার বদলে "মুখ্য প্রধান"। শিবাজীর উপাধি হইল—"ছত্রপতি"। সেইদিন হইতে "রাজ্যাভিষেক শক" নামে এক নূতন বৎসর গণনা সুরু করা হইল; ইহাই পরে সমস্ত মারাঠা সরকারী কাগজ পত্রে ব্যবহৃত হইত।

সিংহাসন অপেক্ষা কিছু নীচু তিনটি আসনে যুবরাজ শম্ভুজী, গাগা ভট্ট ও পেশোয়া মোরেশ্বর ত্র্যম্বক পিঙ্গলে বসিলেন। বাকী মন্ত্রীরা দুই লাইন করিয়া সিংহাসনের দুই পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহাদের পশ্চাতে কায়স্থ "লেখক" নীল প্রভু (পারসনিস্) এবং বালাজী আবজী (চিটনিস্) স্থান পাইলেন। অন্যান্য দরবারীরা যথাক্রমে আরও দূরে দাঁড়াইল।

এই সব কাজে বেলা আটটা হইয়া গেল। তখন ইংরাজ-দূত হেন্‌রি অক্‌সিণ্ডেনকে নিরাজী রাবজী (শিবাজীর ন্যায়াধীশ) সিংহাসনের সামনে লইয়া গেলেন। দূত মাথা নত করিলেন, আর তাঁহার দোভাষী নারায়ণ শেন্‌বী ইংরাজ কোম্পানীর উপহার একটি হীরার আংটি উঁচু করিয়া ধরিয়া শিবাজীকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদের আরও কাছে ডাকিয়া খেলাৎ পরাইয়া বিদায় দিলেন।

রায়গড়ে শোভাযাত্রা

সর্বশেষে হাতীতে চড়িয়া শিবাজী সদলবলে রায়গড়ের রাস্তা বাহিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন। আগে দুই হাতীর উপর দুই রাজ-পতাকা-"জরী পতাকা" (জরির) এবং "ভাগবে ঝাণ্ডা" (অর্থাৎ রামদাস সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্রের খণ্ড)। শহরবাসীরা নিজ নিজ বাড়ী ও রাস্তা নানারূপে সাজাইয়া রাখিয়াছিল; সর্ব্বত্রই ঘরে ঘরে সধবারা প্রদীপ ঘুরাইয়া রাজার আরতি করিল, তাঁহার মাথার উপর খই ও ফুল ও দূর্ব্বা ছিটাইতে লাগিল। তাহার পর রায়গড় পাহাড়ের সব মন্দিরে গিয়া প্রত্যেক স্থানে পূজা দিয়া দান-ধ্যান করিয়া, শিবাজী অবশেষে বাড়ী ফিরিলেন। তখন বেলা দুপুর।

অভিষেকের ব্যয়

পরদিন ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদান এবং কাঙ্গালী-বিদায় আরম্ভ হইল। ইহা শেষ হইতে বারো দিন লাগিল, এবং সে পর্য্যন্ত সকলেই রাজার সিধা পাইতে থাকি। সাধারণ ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা তিন হইতে পাঁচ টাকা, ব্রাহ্মণী ও শিশুদের দুই এক টাকা বরাদ্দ ছিল। এই দানে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হইল।

অভিষেকের দুই দিন পরে বর্ষা নামিল, আর দশ-এগার দিন ধরিয়া সেই বৃষ্টি মুষলধারে চলিল। আগন্তুকেরা বিদায় লইয়া পলাইবার পথ পায় না। ১৮ই জুন বৃদ্ধা জীজা বাঈ পূর্ণ সুখ-সম্পদের

মধ্যে জীবন শেষ করিলেন। তাঁহার ২৫ লক্ষ হোণের সম্পত্তি শিবাজী পাইলেন। এই অশৌচ শেষ হইলে শিবাজী দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসিলেন।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে অভিষেকের ব্যয় সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা হইয়াছিল।[13] কিন্তু সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধরিলে বোধ হয় সত্য হয়।

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল

অভিষেকের ধূমধামে শিবাজীর রাজভাণ্ডার প্রায় খালি হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহাকে আবার লুঠ করিতে বাহির হইতে হইল। ইহার ঠিক এক মাস পরেই, অর্থাৎ জুলাই-এর মাঝামাঝি, একদল মারাঠা অশ্বারোহী দূরে একটি স্থান আক্রমণ করিবে এরূপ ভাব দেখানতে, মুঘল সুবাদার বাহাদুর খাঁ পেডগাঁও-এ নিজ শিবির রাখিয়া সৈন্যসহ পঞ্চাশ মাইল দূরে উহাদের বাধা দিতে গেলেন। আর সেই অবসরে অপর একদল সাত হাজার মারাঠা-সৈন্য অন্যপথ দিয়া দ্রুত আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, পেডগাঁও-এর অরক্ষিত মুঘল-শিবির অবাধে লুঠ করিয়া এক কোটি টাকা এবং দুই শত ভাল ভাল বাদশাহী ঘোড়া লইয়া শিবিরে আগুন ধরাইয়া দিয়া চম্পট দিল। শীতকাল আসিলে মারাঠারা কয়েক মাস ধরিয়া কোলী-দেশ, আওরঙ্গাবাদ, বগলানা ও খান্দেশ লুঠ করিয়া বেড়াইল; জানুয়ারি ১৬৭৫-এর শেষে কোলাপুর হইতে সাড়ে সাত হাজার টাকা আদায় করিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি মুঘলেরা কল্যাণ শহর পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মুঘল, বিজাপুর ও শিবাজী

১৬৭৫ সালের মার্চ্চ হইতে মে—এই কয়মাস ধরিয়া শিবাজী আবার মুঘল বাদশাহর বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ভাণ করিয়া সন্ধির আলোচনায় সুবাদার বাহাদুর খাঁকে ভুলাইয়া রাখিলেন, এবং সেই অবসরে কোলাপুর (মার্চ্চ) এবং বিখ্যাত ফোণ্ডা দুর্গ (জুলাই মাসে) অধিকার করিলেন। তাহার পর কার্য্য সিদ্ধি হওয়ায় বাহাদুর খাঁর দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

রাগে লজ্জায় বাহাদুর খাঁ শিবাজীকে জব্দ করিবার জনা বিজাপুরের উজীর খাওয়াস্ খাঁর সহিত জোট করিলেন। কিন্তু ১১ই নবেম্বর বিজাপুরের আফঘান-দল খাওয়াস খাঁকে বন্দী করিয়া রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইল; বাহাদুরের ইচ্ছা বিফল হইল।

১৬৭৬ সালের প্রথমেই শিবাজী বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। সাতারায় তিন মাস চিকিৎসার পর, মার্চ্চের শেষে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

এদিকে খাওয়াসের পতনের পর হইতেই বিজাপুরে আফঘান ও দক্ষিণী ওমরাদের মধ্যে ভীষণ গৃহ-বিবাদ বাধিল। বাহাদুর খাঁ নূতন উজীর আফঘান-নেতা বহলোল খাঁকে আক্রমণ করিবার জনা

[13]সভাসদ বলেন, সিংহাসনে ৩২ মণ সোনা (দাম ১৪ লক্ষ টাকা) এবং বাছা বাছা হীরা ও মণিমুক্তা লাগিয়াছিল। অষ্টপ্রধানেরা প্রত্যেকে এক লক্ষ হোণ (অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা) নগদ এবং হাতী ঘোড়া বস্ত্র অলঙ্কার বখ্‌শীষ পাইয়াছিলেন; গাগা ভট্টকে "অপরিমিত দ্রব্য" দেওয়া হইল, ইত্যাদি।

রওনা হইলেন (৩১ মে ১৬৭৬)। অমনি বহলোল শিবাজীর সহিত সন্ধি করিলেন; তাহার শর্ত্ত হইল যে, বিজাপুর-সরকার শিবাজীকে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং প্রতি বৎসর এক লক্ষ হোণ (অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা) কর দিবে এবং তাঁহার জয় করা প্রদেশগুলিতে তাঁহার অধিকার মানিয়া লইবে; আর মুঘলেরা আক্রমণ করিলে শিবাজী নিজ সৈন্য দিয়া আদিলশাহী রাজ্য রক্ষা করিবেন। কিন্তু বিজাপুরে ঘরোয়া বিবাদ ও নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে এ সন্ধি বেশী দিন টিকিল না। তাহাতে শিবাজীর কোনই ক্ষতি হইল না। তিনি অন্যত্র এক বহু ধনশালী দেশ জয় করিতে চলিলেন; তাহার নাম পূর্ব্ব-কর্ণাটক, অর্থাৎ মাদ্রাজ অঞ্চল।

নবম অধ্যায় : দক্ষিণ-বিজয়

পূর্ব্ব-কর্ণাটকের রাজ্যগুলি এবং ঐশ্বর্য্য

এক সময়ে বিখ্যাত বিজয়নগর-সাম্রাজ্য কৃষ্ণা নদীর পরপারে সারা দাক্ষিণাত্য জুড়িয়া পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সাগর,—অর্থাৎ মাদ্রাজ হইতে গোয়া—পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণের মুসলমান সুলতানেরা একজোট হইয়া বিজয়নগরের সম্রাটকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজধানী লুঠ করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ রাজধানী একস্থান হইতে অপর স্থানে সরাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ যুদ্ধের পর হইতে সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল; কতক প্রদেশ মুসলমানেরা কাড়িয়া লইল, আর কতক প্রদেশ স্বাধীন হইল। বিজয়নগরের শেষ সম্রাট (শ্রীরঙ্গ রায়ল) সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাঁহার সামন্ত শ্রীরঙ্গপটনের রাজার দ্বারে আশ্রয় মাগিলেন (১৬৫৬)।

ইতিমধ্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা বিজয়নগরের করদরাজাদিগের হাত হইতে বর্ত্তমান মহীশূর দেশ ও মাদ্রাজ উপকূলের প্রায় সমস্তটাই কাড়িয়া লইলেন। পূর্ব্বের একচ্ছত্র সম্রাটের বল ও আশ্রয় হারাইয়া, নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের অভিমানে অন্ধ স্বার্থপর প্রাদেশিক হিন্দুরাজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিল না। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক লড়িয়া সহজেই মুসলমানের কাছে রাজ্য হারাইল অথবা বশ মানিল। এইরূপে ১৬৩৭ হইতে ১৬৫৬ সালের মধ্যে কুতুব শাহ গোলকুণ্ডার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া কাড়াপা এবং উত্তর-আর্কট জেলা (পালার নদীর উত্তরের অংশ) এবং মাদ্রাজের সমুদ্রকূল অঞ্চলে শিকাকোল হইতে সাদ্রাজ বন্দর (মাদ্রাজের প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণ) পর্য্যন্ত দখল করিলেন। ইহার নাম হইল "হায়দারবাদী কর্ণাটক"। ঠিক ইহার দক্ষিণে,—পালার হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত সমভূমি এবং প্রায় সমস্ত মহীশূর জুড়িয়া আদিল শাহ রাজ্য বিস্তার করিলেন। তাহার নাম হইল "বিজাপুরী কর্ণাটক"।

অর্থ শস্য ও লোক-সংখ্যায় এই কর্ণাটক দেশ ভারতে প্রায় অতুলনীয় ছিল। জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; স্থানীয় লোকেরা খুব পরিশ্রমী ও শিল্পকার্য্যে দক্ষ; অনেক মণিমাণিক্যের খনি ও হাতীতে পূর্ণ বন-জঙ্গল হইতে রাজার অগাধ লাভ হইত। এই সব কারণে দেশের আয় দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই আয়ের অতি কম অংশই খরচ হইত, কারণ প্রজারা খুব মিতব্যয়ী, কোন প্রকার বিলাসিতা জানিত না; পান্তাভাত ও তেঁতুলের জল, নুন লঙ্কা মিশাইয়া খাইয়া এবং লেংটি পরিয়া বারো মাস কাটাইত। এইরূপে বৎসর বৎসর কর্ণাটকে অগাধ ধন উদ্বৃত্ত থাকিত; তাহার কতক অংশ বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় হইত; বাকী টাকা মাটির তলে পোঁতা থাকিত। এইজন্য সোনার দেশ বলিয়া যুগে যুগে কর্ণাটক প্রদেশের খ্যাতি ছিল। যুগে যুগে বিদেশী রাজা ও সেনাসামন্তরা এই দেশের অগাধ ধনরত্ন

লুঠিয়া লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এবার শিবাজীর দৃষ্টি কর্ণাটকের উপর পড়িল।

কর্ণাটকে বিজাপুরী জাগীরদারদের কলহ ও রাজনীতি

এই সময়ে (অর্থাৎ ১৬৭৬ সালে) বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের প্রায় সমস্তটাই বিজাপুরের অধীনে অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত ছিল; তাহার কতকগুলি ওমরাদের জাগীর, আর কতকগুলি করদ-হিন্দুরাজাদের রাজ্য। ইহাকে "কর্ণাটক বালাঘাট" (অর্থাৎ উঁচু জমি) বলা হইত। আর মহীশূরের পূর্ব্বদিকে বঙ্গ উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সমভূমি, অর্থাৎ মাদ্রাজের আর্কট প্রভৃতি জেলাগুলি, তাহার নাম ছিল "কর্ণাটক পাইনঘাট" (অর্থাৎ নীচু দেশ)। মহীশূরের পাহাড় বাহিয়া এই সমভূমিতে নামিলে উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে যাইবার পথে ক্রমে ক্রমে তিনটি বিজাপুরী ওমরাদের জাগীর পড়ে;—প্রথমে বিখ্যাত জিঞ্জি-দুর্গের অধীনস্থ প্রদেশ (ইহার শাসনকর্ত্তা নাসির মহম্মদ খাঁ, মৃত উজীর খাওয়াস খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা); তাহার পর বলি-কণ্ড-পুরম (যেখানে বানর-রাজ বালি রামচন্দ্রের দর্শনলাভ করেন; ইহার শাসনকর্ত্তা শের খাঁ লোদী, আফঘান উজীর বহলোলের জাতভাই); এবং শেষে কাবেরী পার হইয়া তাঞ্জোর (শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভাই ব্যঙ্কাজী, ওরফে একোজী, ১৬৭৫ সালে ইহা দখল করেন)। আরও দক্ষিণে স্বাধীন মাদুরা-রাজ্য। ইহা ভিন্ন বেলুর, আরণি প্রভৃতি বিখ্যাত দুর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর হাতে ছিল।

এই-সব বিজাপুরী ওমরাদের মধ্যে স্বার্থ লইয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধ ও রাজ্য কাড়াকাড়ি চলিতেছিল; কেহই উপরিতন সুলতানকে মানিয়া চলিত না, কারণ সুলতান তখন নাবালক এবং উজীরের হাতে পুতুল মাত্র। হিন্দু করদ-রাজারাও তেমনি স্বার্থপর ও একতাহীন। শের খাঁ ফন্দি করিলেন যে তাঁহার মিত্র—ফরাসী কোম্পানীর পণ্ডিচেরীর কুঠী হইতে গোরা এবং সাহেবদের হাতে শিক্ষিত দেশী সিপাহী লইয়া তিনি জিঞ্জি অধিকার করিবেন; তাহার পর ক্রমে রাজ্য ও বল বৃদ্ধি করিয়া মাদুরা ও তাঞ্জোরের অগাধ ধনদৌলত লুঠিবেন, এবং শেষে সেই অর্থের জোরে সৈন্যসংখ্যা বাড়াইয়া গোলকুণ্ডা-রাজ্য জয় করিবেন।

শিবাজীর কর্ণাটক-অভিযানের পূর্ব্বে অন্য রাজ্যের সহিত সন্ধি

শের খাঁ ১৬৭৬ সালে জিঞ্জি প্রদেশ আক্রমণ কবিয়া তাহার অনেক অংশ কাড়িয়া লইলেন। জিঞ্জির অধিকারী নাসির মহম্মদ নিরুপায় হইয়া গোলকুণ্ডার সাহায্য চাহিলেন। এই সময় কুতুব শাহর মন্ত্রী মাদন্না নামক ব্রাহ্মণই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহাদের বংশ পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত হিন্দু। মাদন্নার প্রাণের বাসনা ছিল মুসলমানের (অর্থাৎ বিজাপুরের) হাত হইতে কর্ণাটক উদ্ধার করিয়া, ১৬৪৮ সালের পূর্ব্বের মত আবার হিন্দুর শাসনে রাখিবেন। শিবাজীর মত ভুবনবিজয়ী বীর ও ভক্ত হিন্দু ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এই মহাকার্য্য সফল হওয়া সম্ভব নহে। সুলতান প্রিয়মন্ত্রীর পরামর্শে রাজি হইলেন। এই শর্ত্তে সন্ধি হইল যে শিবাজী মারাঠা-সৈন্যের সাহায্যে বিজাপুরী কর্ণাটক জয় করিয়া কুতুব শাহকে দিবেন, আর নিজে তথাকার রাজকোষে মজুত ও লুঠের টাকা এবং মহীশূরের কতক মহাল লইবেন। এই অভিযানের সমস্ত ব্যয় কুতুব শাহর, এ ছাড়া কামান ও গোলা এবং পাঁচ

হাজার সৈন্য দিয়া তিনি শিবাজীকে সাহায্য করিবেন। শিবাজীর চতুর দূত প্রহ্লাদ নিরাজী মাদন্নার সহিত আলোচনা করিয়া এই বন্দোবস্ত পাকা কবিলেন।

শিবাজী দেখিলেন, কর্ণাটক জয় করা যেরূপ কঠিন কাজ তাহাতে নিজে বাহির না হইলে শুধু সেনাপতি পাঠাইয়া কোনোই ফল হইবে না, আর ইহাতে অন্তত এক বৎসর সময় লাগিবে। অথচ এই দীর্ঘকাল স্বদেশ ছাড়িয়া সুদূর কর্ণাটকে থাকিলে শত্রুরা সেই সুযোগে তাঁহার রাজ্যে মহা অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এই কারণে শিবাজী মুঘল-সরকারের সহিত ভাব করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ১৬৭৬ সালের শেষভাগে মুঘল ও বিজাপুরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে শিবাজীর খুব সুবিধা হইল। বিজাপুরের নূতন উজীর বহলোল খাঁর আফঘান-দল এবং তাঁহার শত্রু দক্ষিণী ও হাবশী ওমরাদের মধ্যে খুনোখুনী বিবাদ বাধিয়া গিয়াছিল। মুঘল-সুবাদার বাহাদুর খাঁ বহলোলের উপর চটা ছিলেন; তিনি এই সুযোগে দক্ষিণীদের পক্ষ লইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন (৩১ মে, ১৬৭৬) এবং এই যুদ্ধে এক বৎসরের অধিক কাল ব্যাপৃত রহিলেন। সে সময়ে কেহই শিবাজীর দিকে তাকাইবার অবসর পাইল না।

বাহাদুর খাঁ দেখিলেন, বিজাপুর-আক্রমণের পূর্ব্বে শিবাজীকে হাত করিতে না পারিলে, তাঁহার নিজের শাসনাধীন প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিবে। আর, শিবাজীও দেখিলেন যে যখন তিনি কর্ণাটক লইয়া জড়াইয়া পড়িবেন তখন মুঘল-সুবাদার শত্রুতা করিলে মহারাষ্ট্র দেশের খুবই অনিষ্ট হইবে। অতএব "তুমি আমাকে জ্বালাইও না, আমি ছুঁইব না" এই শর্ত্তে দুই পক্ষ বন্ধুত্ব করিলেন। শিবাজীর দূত নিরাজী রাবজী পণ্ডিত গোপনে বাহাদুর খাঁকে অনেক টাকা ঘুষ এবং প্রকাশ্যে বাদশাহের জন্য কিছু টাকা কর বা উপহার দিয়া সন্ধির লেখাপড়া শেষ করিলেন।

হনুমন্তে বংশের সাহায্য

ভাগ্য চিরদিনই উদ্যোগী পুরুষসিংহের উপর প্রসন্ন। শিবাজীর কর্ণাটক জয়ের পক্ষে এক মহা সহায় জুটিল। রঘুনাথ নারায়ণ হনুমন্তে নামক একজন সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ শাহজীর সময় হইতে ব্যঙ্কাজীর অভিভাবক এবং উজীর হইয়া কর্ণাটক-রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ফলতঃ রঘুনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা জনার্দ্দনকে লোকে ঐ দেশের রাজার মতই জ্ঞান করিত। ব্যঙ্কাজী বড় হইয়া নিজহাতে শাসনভার লইলেন এবং রঘুনাথের নিকট হইতে রাজস্বের হিসাব তলব করিলেন। রঘুনাথ এত বৎসরে প্রভুর অগাধ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; ঈর্ষাবশে অন্যান্য মন্ত্রীরা সে কথা প্রকাশ করিয়া দিল। এতদিন একাধিপত্য করিবার পর, হিসাব দিতে বা হুকুমে চলিতে রঘুনাথ অপমান বোধ করিলেন। তিনি উজীরীতে ইস্তফা দিয়া কাশী যাত্রা করিবার ভাণে তাঞ্জোর হইতে সপরিবারে চলিয়া আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী তাঁহাকে অতি সমাদরে আহ্বান করিলেন এবং নিজ রাজ্যে চাকরি দিলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে কর্ণাটকের জায়গা জমি ও কর্ম্মচারীদের নাড়ীনক্ষত্র সব বলিয়া দিলেন, এবং নিজ বংশের এতদিনকার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি দিয়া শিবাজীর কর্ণাটক-আক্রমণে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

পেশোয়াকে নিজ প্রতিনিধি করিয়া বসাইয়া, কোঁকন-প্রদেশের শাসনভার অন্নাজী দত্ত (সুরণীস্)-কে দিয়া, এবং উভয়ের অধীনে এক একটি বড় সৈন্যদল রাখিয়া,—১৬৭৭ সালের জানুয়ারির প্রথমে শিবাজী রায়গড় হইতে রওনা হইলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার দূত প্রহ্লাদ নিরাজী গোলকুণ্ডা-রাজ কুতুব শাহকে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজি করাইয়াছিলেন। প্রথমে সুলতানের ভয় হইয়াছিল পাছে আফজল বা শায়েস্তা খাঁর মত তাঁহার দশা ঘটে। কিন্তু প্রহ্লাদ নানাপ্রকার ধর্ম্মশপথ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে শিবাজী কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আর মাদন্নাও সেই মত সমর্থন কবিলেন এবং রাজাকে দেখাইয়া দিলেন যে শিবাজীকে কাছে আনিয়া বন্ধুত্ব পাকা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে মুঘল আক্রমণ হইতে গোলকুণ্ডা রক্ষা করার নিশ্চিন্ত উপায় হইবে।

শিবাজীর গোলকুণ্ডা-রাজ্যে প্রবেশ

নিজ চোখে চোখে সৈন্যদের শৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া, প্রত্যহ নিয়মিত কুচ করিয়া শিবাজী এক মাসে হায়দারবাদ শহরে আসিয়া পৌঁছিলেন (ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ)। তিনি কড়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন যেন তাঁহার সৈন্য বা চাকর বাকরের কেহ পথে কোন গ্রামবাসীর জিনিসে হাত না দেয় বা স্ত্রীলোকের মানহানি না করে। প্রথমে দু-চারজন মারাঠা এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অপরাধীদের ফাঁসী অথবা হাত-পা কাটিয়া সাজা দেওয়ায় এমন ভয়ের সঞ্চার হইল যে এই পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র লোক এক মাস ধরিয়া অতি শান্ত ও সাধুভাবে বিদেশ পার হইয়া চলিল, কাহারও একগাছি তৃণ বা এক দানা শস্যে হাত দিল না। ইহাতে চারিদিকে শিবাজীর সুনাম ছড়াইয়া পড়িল।

কুতুব শাহ প্রস্তাব করেন যে তিনি রাজধানী হইতে কয়েক ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু শিবাজী নম্র ভাবে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; বলিলেন, "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, এতটা পথ আগুয়ান হইয়া কনিষ্ঠকে সম্মান করা গুরুজনের পক্ষে অনুচিত। সুতরাং শুধু মাদন্না, তাঁহার ভ্রাতা আকন্না এবং হায়দারবাদের বড় বড় লোকেরা শহর হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ বাহিরে আসিয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজধানীতে আনিলেন।

হায়দারবাদ নগরে শিবাজীর অভ্যর্থনা

শিবাজীর অভ্যর্থনার জন্য রাজধানী হায়দাবাদ আজ অতি সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। রাস্তা ও গলিগুলি কুঙ্কুম ও জাফরানে লালে লাল। স্থানে স্থানে ফুল পাতা ও নিশানে সজ্জিত খিলান ও ধ্বজদণ্ড তৈরি করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ নাগরিকেরা ভাল ভাল পোষাক পরিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া, আর বারান্দাগুলি সাজগোছ করা মহিলায় ভরা।

শিবাজীও তাঁহার সৈন্যগণকে এই দিনের জন্য চমৎকার বেশভূষা পরাইয়াছিলেন। জমকাল পোষাক ও অস্ত্রে তাঁহার সেনানীগণকে ধনী ওমরাদের মত দেখাইতেছিল। বাছা বাছা সিপাহীর পাগড়ীতে মোতির ঝালর ('তোড়া'), হাতে সোনার কড়া, গায়ে উজ্জ্বল বর্ম্ম ও জরির পোষাক।

দুই রাজার মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে সেই পঞ্চাশ হাজার মারাঠা-সৈন্য হায়দাবাদে ঢুকিল। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী এতদিন দাক্ষিণাত্যে লোকমুখে প্রচারিত, কত গাথায় (ব্যালাডে) গীত হইয়া আসিতেছিল। আজ লোকে অবাক হইয়া সেই-সব বিখ্যাত বীর নেতা ও সিপাহীদের দিকে তাকাইতে লাগিল; এতদিন তাহাদের নাম শুনিয়া আসিতেছিল, আজ তাহাদের চেহারা দেখিল।

সকলের চোখে পড়িল সেনাপতি মন্ত্রী ও রক্ষীদের মধ্যস্থলে বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর প্রতি। তাঁহার শরীর মাঝারি রকমের লম্বা এবং পাতলা। গত বৎসরের অসুখে এবং এই এক মাস ধরিয়া নিত্য কুচ করার ফলে তাঁহাকে আরও পাতলা দেখাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার গৌরবর্ণ মুখে সদাই হাসি লাগিয়া আছে, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ দুটি ও চোখাল নাক এদিকে ওদিকে ফিরিতেছে। নগরবাসীরা আনন্দে "জয় শিব ছত্রপতির জয়" ধ্বনি করিতে লাগিল। মহিলারা বারান্দা হইতে সোনা-রূপার ফুল বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অথবা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চারিদিকে প্রদীপ ঘুরাইয়া আরতি করিলেন, অভ্যর্থনার শ্লোক ও আশীর্ব্বাদ-বাণী উচ্চারণ করিলেন। শিবাজীও দুই পাশের জনতার মধ্যে মোহর ও টাকা ছড়াইতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক পাড়ার প্রধান নাগরিকগণকে খেলাৎ ও অলঙ্কার উপহার দিলেন।

শিবাজী ও কুতুব শাহর সাক্ষাৎ

এইরূপে শোভাযাত্রা কুতুব শাহর বিচার-প্রাসাদ—দাদ-মহলের সামনে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে আর-সকলে শান্ত সংযতভাবে রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল; শুধু শিবাজী পাঁচজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সিঁড়ি বাহিয়া দরবার-গৃহে উঠিলেন। সেখানে কুতুব শাহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি দরজা পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া গদীর উপর নিজ পাশে বসাইলেন; মন্ত্রী মাদন্নাকে ফরাশে বসিতে অনুমতি দেওয়া হইল; আর সকলে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্তঃপুরের বেগমেরা দুই পাশের পাথরের জাফরি-কাটা জানালার ফাঁক দিয়া কুতূহলে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

কুতুব শাহ তিন ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন, এবং শিবাজীর মুখে তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনা ও বীর কীর্ত্তিগুলির বিস্তারিত বিবরণ মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন। পরে তিনি স্বহস্তে শিবাজীকে পান আতর দিয়া, এবং মারাঠা মন্ত্রী ও সেনাপতিদের খেলাৎ অলঙ্কার হাতীঘোড়া উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। স্বয়ং শিবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নীচ তলা পর্য্যন্ত গেলেন। সেখান হইতে পথে টাকা ছড়াইতে ছড়াইতে শিবাজী বাসাবাড়ীতে পৌঁছিলেন।

উজীর মাদন্না পণ্ডিত পরদিন শিবাজী ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন; তাঁহার মাতা স্বহস্তে অতিথিদের জন্য রান্না করিলেন। ভোজশেষে নানা উপহার পাইয়া মারাঠারা বাসায় ফিরিল।

গোলকুণ্ডা-রাজের সহিত সন্ধি

তাহার পর কাজের কথা আরম্ভ হইল। অনেক আলোচনার পর শিবাজীর সহিত এই শর্ত্তে সন্ধি হইল :—কুতুব শাহ দৈনিক পনের হাজার টাকা এবং নিজ সেনাপতি মীরজা মহম্মদ আমিনের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য, কতকগুলি তোপ এবং গোলা বারুদ দিয়া শিবাজীকে কর্ণাটকজয়ে সাহায্য করিবেন। শিবাজী প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ণাটকের যে যে অংশ তাঁহার পিতা শাহজীর ছিল তাহা বাদে জয় করা সমস্ত দেশ কুতুব শাহকে দিবেন। এ ছাড়া তিনি কুতুব শাহর সম্মুখে ধর্ম্মশপথ করিয়া বলিলেন যে মুঘলেরা আক্রমণ করিলেই তিনি গোলকুণ্ডা-রাজ্য রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিবেন।

তজ্জন্য কুতুব শাহ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত বার্ষিক কর পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়মিতভাবে দিতে থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

গোপনে এই-সব মন্ত্রণা ও বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল, আর বাহিরে আমোদ-প্রমোদ তামাশা ও ভোজে মারাঠা এবং নগরবাসীদের সময় সুখে কাটিতে লাগিল। শিবাজী দ্বিতীয়বার কুতুব শাহর সহিত দেখা করিলেন; দুই রাজা প্রাসাদের বারান্দায় পাশাপাশি বসিলেন, আর সমস্ত মারাঠা-সৈন্য কুচ করিয়া তাঁহাদের সামনে দিয়া চলিল; গোলকুণ্ডার সুলতান তাহাদের নানা উপহার দিলেন। শিবাজীর ঘোড়াকে পর্য্যন্ত একটি মণি ও হীরার মালা গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল, কারণ সে-ও তাঁহার যুদ্ধজয়ে সঙ্গী ছিল।

আর একদিন কুতুব শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কয় শত হাতী আছে?" শিবাজী তাঁহার হাজার হাজার মাব্‌লে পদাতিক সৈন্য দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহারাই আমার হাতী।" তখন সুলতানের একটি প্রকাণ্ড মত্ত হস্তীর সহিত মাব্‌লে সেনাপতি যেসাজী কঙ্ক তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিলেন, এবং উহাকে কিছুক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়া শেষে এক কোপে উহার শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন। হাতী পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গেল।

এইরূপে এক মাস কাটাইবার পর টাকা ও মালপত্র লইয়া শিবাজী মার্চ্চ মাসের প্রথমে হায়দারবাদ ত্যাগ করিলেন। দক্ষিণ দিকে গিয়া কৃষ্ণা নদীর তীরে "নিবৃত্তি সঙ্গমে" (ভবনাশী নদীর সহিত মিলন ক্ষেত্রে) তীর্থস্নান ও পূজা দানাদি করিয়া, সৈন্যদের অনন্তপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজে অল্প রক্ষী ও কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে শ্রীশৈল দর্শনে চলিলেন।

শিবাজীর শ্রীশৈল দর্শন

এই স্থান কর্ণূল নগর হইতে ৭০ মাইল পূর্ব্ব দিকে। এখানে কৃষ্ণা নদী হইতে হাজার ফীট উঁচু এক অধিত্যকার জনহীন বনের মধ্যে মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির—ইহা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি লিঙ্গ। মন্দিরটি পঁচিশ ছাব্বিশ ফীট উচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা; ইহার চারিদিকে অতি বিস্তৃত আঙ্গিনা। বড় বড় সমচতুষ্কোণ পাথর দিয়া এই দেওয়াল গাঁথা, আর তাহার গায়ে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, শিকারী, যোদ্ধা, যোগী, এবং রামায়ণ ও পুরাণের দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা। শিবমন্দিরটিও সমচতুষ্কোণ। বিজয়নগরের দিগ্বিজয়ী সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের অর্থে মন্দিরের চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ আগাগোড়া সোনার জল করা পিতলের চাদরে মোড়া (১৫১৩)। ঐ বংশের এক সম্রাজ্ঞী উপর হইতে নীচে কৃষ্ণার জলধারা পর্য্যন্ত হাজার ফীটেরও বেশী দীর্ঘপথ, পাথরের শান্‌ বাধাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার নীচে ঘাটের নাম "পাতাল গঙ্গা"; আর কিছু ভাটীতে "নীলগঙ্গা" নামে পার-ঘাট; এই দুটিই বিখ্যাত স্নানের তীর্থ। শিবমন্দিরের কাছে একটি ছোট দুর্গা-মন্দির।

শিবাজী শৈলে উঠীয়া পূজা স্নান দান লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি কার্য্যে এখানে নবরাত্রি (অর্থাৎ চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রথম নয়দিবস, ২৪ মার্চ্চ হইতে ১ এপ্রিল, ১৬৭৭) যাপন করিলেন। এই তীর্থস্থানের শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, রম্য নির্জনতা, এবং ধর্ম্মভাব জাগাইবার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া তিনি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এটা যেন তাঁহার নিকট দ্বিতীয় কৈলাস বা শিবের স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। মরিবার এমন উপযুক্ত স্থান এবং সময় আর মিলিবে না ভাবিয়া শিবাজী স্থির করিলেন, তিনি দেবী-প্রতিমার চরণে নিজমাথা কাটিয়া দিয়া দেহ ত্যাগ করিবেন। প্রবাদ আছে, ভগবতী স্বয়ং

আবির্ভূত হইয়া, শিবাজীর উদ্যত তরবারি ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে থামাইলেন এবং বলিলেন, "বৎস! এই উপায়ে তোমার মোক্ষ হইবে না। একাজ করিও না। তোমার হাতে এখনও অনেক বড় বড় কর্ত্তব্যভার রহিয়াছে।" তাহার পর দেবী অদৃশ্য হইলেন, শিবাজীও ক্ষান্ত হইলেন।

জিঞ্জি অধিকার

এপ্রিল মাসের ৪ঠা ৫ই অনন্তপুরে ফিরিয়া শিবাজী সসৈন্য দ্রুত মাদ্রাজ প্রদেশের দিকে চলিলেন। ভারত-বিখ্যাত তিরুপতি পর্ব্বতের মন্দির দেখিয়া পূর্ব্ব-কূলের সমভূমিতে নামিলেন, এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজ শহরের সাত মাইল পশ্চিমে পেড্ডাপোলম্ নগরে পৌঁছিলেন। এখান হইতে তাঁহার অগ্রগামী সৈন্য—পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দ্রুত জিঞ্জি-দুর্গে উপস্থিত হইল। তাহার মালিক নসির মহম্মদ খাঁ বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের জাগীর এবং কিছু নগদ টাকা পাইবার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ এই অজেয় দুর্গ মারাঠাদের হাতে ছাড়িয়া দিল (১৩ই মে)। শিবাজী শীঘ্রই সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং জিঞ্জি নিজ দখলে রাখিয়া উহার দেওয়াল পরিখা বুরুজ প্রভৃতি এত দৃঢ় করিলেন যে “ইউরোপীয়গণও তাহা করিলে গর্ব্ব অনুভব করিত।”

সেখান হইতে রওনা হইয়া শিবাজী ২৩এ মে বেলুর-দুর্গ অবরোধ করিলেন। ইহাও জিঞ্জির মত দুর্জ্জয় গড়। ইহার শাসনকর্ত্তা হাবশী আবদুল্লা খাঁ আদিল শাহর বিশ্বাসী কর্ম্মচারী; সে মারাঠাদের সব গোলাবাজী ও আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া মহাবিক্রমের সহিত চৌদ্দ মাস লড়িল, শেষে যখন দেখিল যে প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিবে না, আর তাহার দুর্গরক্ষী সৈন্যদের মধ্যে পদাতিকের সখ্যা ১,৮০০ হইতে দুইশত এবং অশ্বারোহীর সংখ্যা ৫০০ হইতে এক শততে দাঁড়াইয়াছে—তখন আবদুল্লা শিবাজীকে দুর্গ ছাড়িয়া দিল (২১ আগষ্ট ১৬৭৮)। এজন্য তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা নগদ এবং বার্ষিক সেই পরিমাণ আয়ের জাগীর দিবার শর্ত্ত হইল।

মারাঠাদের কর্ণাটক লুণ্ঠন

শিবাজীর সৈন্যদল দ্রুতবেগে কুচ করিয়া বন্যার মত মাদ্রাজ প্রদেশের সমভূমি ছাইয়া ফেলিল। চারিদিকে যাহা পাইল গ্রাস করিল; কেহই তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। শুধু গোটাকয়েক দুর্গ জলবেষ্টিত দ্বীপের মত কিছুদিনের জন্য স্বাধীনভাবে খাড়া রহিল। প্রথমে এক হাজার মারাঠা-অশ্বারোহী দুই দিনের পথ আগে আগে চলিল; তাহার পিছনে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া শিবাজী স্বয়ং আসিলেন; আর সর্ব্বপশ্চাতে চাকর-বাকর এবং সিংহের পিছু পিছু শৃগালের পালের মত লুঠের লোভে আগত স্থানীয় ছোট জমিদার, ডাকাতের সর্দ্দার, এবং জঙ্গলী জাতের দলপতি ("পলিগর") ঘুরিতে লাগিল। টাকা আদায়ের জন্য শিবাজীর কঠোর পীড়ন এবং তাঁহার সৈন্যদের বিক্রম ও নিষ্ঠুরতার সংবাদ আগে আগে চলিল। পথ হইতে বড়লোকেরা যে যেখানে পারিল পলাইল, কেহ বনে কেহ-বা সাহেবদের সুরক্ষিত বন্দরে স্ত্রীপুত্র ও ধনরত্ন সহ আশ্রয় লইল।

এদিকে শিবাজীর টাকার বড় দরকার। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, কুতুবশাহী সরকারকে জিঞ্জি না দিয়া নিজ দখলে রাখায়, গোলকুণ্ডা রাজ্যের নিকট হইতে দৈনিক পনের হাজার টাকার সাহায্য

বন্ধ হইয়া গেল। তখন শিবাজী ঐ অঞ্চলের সব বড় বড় শহরে চিঠি পাঠাইয়া দশ লক্ষ টাকা ঋণ চাহিলেন; অবশ্য এই ঋণ পরিশোধের আশা ছিল না, আর তাহা চাহিবার মত দুঃসাহস কাহারই বা? শিবাজী তখন ঐ দেশের ধনী লোকদের নামধাম ও তাঁহাদের ধনদৌলতের একটা তালিকা করিলেন। তাঁহার চৌথ-আদায়ের তহসিলদারগণ দেশ ছাইয়া ফেলিল। বিশ হাজার ব্রাহ্মণ এই সব চাকরির আশায় তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারা অতি নির্লজ্জভাবে লোকদের শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল—ন্যায়বিচার দয়া-মায়ার ধার ধারিল না। (ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর ডায়েরি)। ইংরাজ ফরাশী ও ডচ্ কুঠীর বণিকেরা বার-বার দূত এবং উপহার পাঠাইয়া শিবাজীকে তুষ্ট রাখিলেন।

শের খাঁ লোদীর পরাজয়

জিঞ্জি প্রদেশের দক্ষিণে শের খাঁ লোদীর প্রকাণ্ড জাগীর, কাবেরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি যুদ্ধে একেবারেই অপারক; চতুর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শে সব কাজ চালাইতেন। ইহারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে শিবাজীর সৈন্যবল কিছুই না, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ও সহায়ক পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এ শত্রু বড় ভীষণ। শের খাঁ নিজ সৈন্য (চার হাজার অশ্বারোহী ও তিন-চার হাজার পেয়াদা ধরণের ভীরু অকেজো পদাতিক) লইয়া ১০ই জুন হইতে তিরুবাড়ীতে (কাডালোরের ১৩ মাইল পশ্চিমে) মারাঠাদের পথ রোধ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। ২৩এ মে শিবাজী জিঞ্জি হইতে বেলুরে পৌঁছিয়া, তথায় এক মাস থাকিয়া ঐ দুর্গ অবরোধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ছয় হাজার অশ্বারোহী সহ ২৬এ জুন তিরুবাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শের খাঁ নিজ সৈন্যদল সাজাইয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মারাঠারা নিজ স্থানে স্থির নিঃশঙ্কভাবে দাঁড়াইয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া শের খাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি দেখিলেন বড়ই বিপদ। অমনি নিজ সেনাদের ফিরিতে হুকুম দিলেন! তাহারা ইহাতে আরও ভীত এবং বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সুযোগে শিবাজী ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া তাহাদের উপর পড়িলেন; সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

শের খাঁ তিরুবাড়ীর ছোট দুর্গে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কাডালোরে আশ্রয় লইবার ইচ্ছায় রাত্রে তিনি সেখান হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু মারাঠারা টের পাইয়া তাড়া করিয়া তাঁহাকে অকাল-নায়কের জঙ্গলে তাড়াইয়া দিল। চন্দ্র অস্ত গেলে অন্ধকারের আড়ালে বন হইতে বাহির হইয়া শের খাঁ একশত মাত্র সওয়ার লইয়া (২৭এ জুন) বাইশ মাইল দূরে বোনগির-পটন নামক একটি ছোট দুর্গে (ভেলার নদীর উত্তর তীরে) ঢুকিলেন। কিন্তু তাঁহার পাঁচ শত ঘোড়া, দুইটি হাতী, বিশটা উট এবং তাঁবু ঢাকার পতাকা ও মালের বলদ মারাঠারা কাড়িয়া লইল। ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই শের খাঁর রাজ্যের অনেক শহর ও দুর্গ শিবাজী অবাধে দখল করিলেন। অবশেষে ৫ই জুলাই খাঁ সন্ধি করিয়া শিবাজীকে নিজের সমস্ত দেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজের মুক্তির জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত নিজপুত্র ইব্রাহিম খাঁকে জামিন-স্বরূপ শিবাজীর হাতে রাখিলেন। শিবাজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে শের খাঁকে পরিবারসহ অবাধে ঐ দুর্গ হইতে বাহির হইতে এবং কাডালোরে রক্ষিত তাঁহার সম্পত্তি লইয়া যাইতে দিবেন।[14]

[14] অবশেষে ১৬৭৮ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যহীন নিঃসম্বল শের খাঁ মাদুরারাজের দ্বারে আশ্রয় লইলেন।

শিবাজী ও ব্যঙ্কাজীর সাক্ষাৎ ও কলহ

শিবাজী এখান হইতে আরও দক্ষিণে কুচ করিয়া কোলেরুণ নদী (অর্থাৎ কাবেরীর মুখের কাছে সর্ব্ব-উত্তর শাখা)র তীরে তিরুমল-বাড়ী নামক স্থানে ১২ই জুলাই পৌঁছিয়া বর্ষা কাটাইবার জন্য সৈন্যদের শিবির গাড়িলেন। ব্যঙ্কাজীর রাজধানী তাঞ্জোর শহর এখান হইতে দশ মাইল মাত্র দক্ষিণে, মধ্যে শুধু কোলেরুণ নদী। এখানে বসিয়া মাদুরার রাজার নিকট হইতে কর আদায়ের চেষ্টা হইতে লাগিল, এক কোটি টাকা চাওয়া হইল, কিন্তু শেষে ত্রিশ লক্ষে রফা হইল। স্থির হইল, এই টাকা পাইলে শিবাজী আর মাদুরা আক্রমণ করিবেন না।

ইতিমধ্যে শিবাজী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যঙ্কাজীকে দেখা করিবার জনা ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধে প্রথমে ব্যঙ্কাজীর মন্ত্রীরা শিবাজীর সহিত আলোচনা করিতে আসিল, এবং শিবাজীর তিনজন মন্ত্রী ও নিমন্ত্রণপত্র লইয়া তাহারা নিজ প্রভুর কাছে ফিরিয়া গেল। শিবাজীর অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া ব্যঙ্কাজী দু হাজার অশ্বারোহীর সহিত জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিরুমল-বাড়ীতে পৌঁছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং কয়েক দিন ধরিয়া ভোজ ও উপহার বিনিময় চলিল।

তাহার পর কাজের কথা উঠিল। শাহজী মৃত্যুকালে যে সব ধনসম্পত্তি এবং কর্ণাটকে জাগীর রাখিয়া যান তাহার সমস্তই ব্যঙ্কাজীর হাতে পড়িয়াছিল; পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে, শিবাজী এখন তাহার বারো আনা দাবি করিলেন। ব্যঙ্কাজী সিকিমাত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে অস্বীকার করিলেন; তখন শিবাজী রাগিয়া তাঁহাকে খুব ধমকাইলেন এবং নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ব্যঙ্কাজী দেখিলেন, ধন-সম্পত্তি সব সঁপিয়া না দিলে মুক্তি পাওয়া দুরূহ। কিন্তু তিনি শিবাজীরই ভাই বটে; গোপনে জোগাড়যন্ত্র ঠিক কবিয়া এক রাত্রে শৌচের ভাণ করিয়া নদীতীরে এক নির্জ্জন স্থানে গেলেন। সেখানে তাঁহার পাঁচজন অনুচর একটি ভেলা লইয়া প্রস্তুত ছিল। ব্যঙ্কাজী তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া নদী পার হইয়া নিজ রাজ্যে পৌঁছিলেন (২৩ জুলাই)।

পরদিন প্রাতে এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী মহা চটিয়া বলিলেন, “ও পলাইল কেন? আমি কি উহাকে ধরিতে যাইতেছিলাম? পলাইবার কথা নয়। আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, দিবার ইচ্ছা না থাকিলে বলিলেই পারিত। অতি কনিষ্ঠ ত কনিষ্ঠ, বুদ্ধিও ছেলেমানুষের মত দেখাইল।” ব্যঙ্কাজীর মন্ত্রিগণ প্রভুর খবর পাইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল, তাহাদের ধরিয়া শিবাজীর কাছে আনা হইল। কয়েকদিন আটক থাকিবার পর তিনি তাহাদের খালাস করিয়া খেলাৎ ও উপহার দিয়া তাঞ্জোরে পাঠাইয়া দিলেন; নচেৎ এই নিষ্ফল নির্য্যাতনে তাঁহার দুর্নাম ভিন্ন কোনই লাভ হইত না। শিবাজী কোলেরুণের উত্তরে শাহজীর সমস্ত জাগীর নিজে দখল করিলেন।

শিবাজীর শিবিরের বর্ণনা

ফরাসী-দূত জার্মায়াাঁ সাহেব তিরুমল-বাড়ীতে শিবাজীর শিবির দেখিয়া এই বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তাঁহার শিবিরে কোন রকম ধূমধাম নাই, ভারী মালপত্র বা স্ত্রীলোকের ঝঞ্ঝাট নাই। সমস্ত শিবিরে দুটি মাত্র তাম্বু, তাহাও আকারে ছোট এবং মোটা সাধারণ কাপড়ে তৈয়ারি; একটায় থাকেন

শিবাজী, অপরটায় তাঁহার পেশোয়া। মারাঠা-অশ্বারোহীদের মাসিক বেতন দশটাকা করিয়া, এবং তাহাদের ঘোড়া ও সইস্ রাজাই দেন। প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্য তিনটি করিয়া ঘোড়া রাখা হয়, এইজন্য তাহারা খুব দ্রুত চলিতে পারে। শিবাজী গুপ্তচরদের মুক্তহস্তে টাকা দেন, আর তাহারা তাঁহাকে সত্য খবর দিয়া দেশ-জয়ে বিশেষ সহায়তা করে।"

ব্যঙ্কাজীকে ফিরাইয়া আনিবার আশা নাই দেখিয়া শিবাজী ২৭এ জুলাই তিরুমল-বাড়ী ছাড়িয়া আবার উত্তরে আসিলেন। পথে বলি-কণ্ড-পুরম্ চিদাম্বরম্ ও বৃদ্ধাচলম্ (বিখ্যাত তীর্থ দুটি) দর্শন করিয়া ক্রমে ৩রা অক্টোবর মাদ্রাজ হইতে দুই দিনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে আরণি প্রভৃতি অনেক দুর্গ তাঁহার হাতে পড়িল।

কর্ণাটকে নূতন রাজ্যের বন্দোবস্ত

এখন তিনি খবর পাইলেন যে, একমাস আগে আওরংজীবের হুকুমে মুঘল-সুবাদার বিজাপুর-রাজ্যের সহিত জোট করিয়া গোলকুণ্ডা-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ কুতুব শাহ শিবাজীর মত বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। এদিকে শিবাজীও দশমাস হইল নিজ রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেখানে রাজকর্ম্ম তত ভাল চলিতেছে না। সুতরাং তাঁহার দেশে ফেরাই স্থির হইল।

নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চারি হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া তিনি কর্ণাটকের সমভূমি ছাড়িয়া মহীশূরের অধিত্যকায় চড়িলেন, এবং সেখানে পিতার জাগীরের মহালগুলি দখল করিবার পর মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই আপাততঃ কর্ণাটকে রহিল, কারণ সেই অঞ্চলে তিনি যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহা অতীব বিস্তীর্ণ ও ধনশালী। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল, প্রস্থে ১২০ মাইল, এবং ইহার মধ্যে ৮৬টা দুর্গ ছিল। বার্ষিক খাজানা ৪৬ লক্ষ টাকার অধিক। এই নূতন রাজ্য জিঞ্জি ও বেলুরের জেলাগুলি লইয়া গঠিত। ইহার সদর অফিস জিঞ্জিদুর্গে। শাহজীর দাসীপুত্র শান্তাজীকে ইহার শাসনকর্ত্তা, রঘুনাথ হনুমন্তেকে দেওয়ান এবং হাম্বীর রাও মোহিতেকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া শিবাজী চলিয়া গেলেন। রঙ্গো নারায়ণ মহীশূরের অধিত্যকায় বিজিত মহালগুলির শাসনকর্ত্তা হইলেন।

ইতিমধ্যে ব্যঙ্কাজী কর্ণাটকে পিতার জাগীর উদ্ধার করিবার জন্য চারিদিকে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৬ই নবেম্বর ১৬৭৭ তিনি কোলেরুণ পার হইয়া চৌদ্দ হাজার সৈন্যসহ শান্তাজীর বারো হাজার সেনাকে আক্রমণ করিলেন। সারাদিন যুদ্ধ করিবার পর শান্তাজী হার মানিয়া এক ক্রোশ পশ্চাতে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রে যখন ব্যঙ্কাজীর বিজয়ী সেনাগণ ক্লান্ত হইয়া নিজ শিবিরে ফিরিয়া, ঘোড়ার জীন খুলিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন শান্তাজী নিজ পরাজিত সৈন্যদের আবার একত্র করিয়া, তাহাদের নূতন উৎসাহে মাতাইয়া সুস্থ ঘোড়ায় চড়াইয়া, এক ঘোরা পথ দিয়া আসিয়া হঠাৎ ব্যঙ্কাজীর শিবিরের উপর পড়িলেন। ব্যঙ্কাজীর দল আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, অনেকে মারা গেল, বাকী সকলে নদী পার হইয়া তাঞ্জোরে পলাইল। তিনজন প্রধান সেনানী বন্দী হইল। শত্রুপক্ষের এক হাজার ঘোড়া তাঁবু ও মালপত্র শান্তাজীর হাতে পড়িল।

ব্যঙ্কাজীর সহিত শেষ নিষ্পত্তি

দুই ভাই-এর মধ্যে আরও কিছুদিন ধরিয়া ছোটখাট যুদ্ধ এবং লুঠপাট চলিল; দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে শিবাজী দেখিলেন, তাঁহার অত সৈন্য এবং বড় বড় সেনাপতিদের কর্ণাটকে আর বেশী দিন আটকাইয়া রাখিলে মহারাষ্ট্র দেশ রক্ষা করা কঠিন হইবে। তিনি তখন ব্যঙ্কাজীর সহিত সন্ধি করিলেন। ব্যঙ্কাজী তাঁহাকে নগদ ছয়লক্ষ টাকা দিলেন, তাহার বদলে শিবাজী কর্ণাটকের উত্তরাংশে জিঞ্জি ও বেলুর প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখিয়া, বাকী সব দেশ (অর্থাৎ কোলেরুণের উত্তরে কয়েকটি মহাল এবং তাহার দক্ষিণে সমস্ত তাঞ্জোর-রাজ্য) ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে মহীশূরের জাগীরগুলিও ব্যঙ্কাজী ফিরিয়া পাইলেন। এইরূপে শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, হাম্বীর রাও শিবাজীর অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন; কর্ণাটক রক্ষার জন্য রঘুনাথ হনুমন্তে দশ হাজার স্থানীয় ফৌজ নিযুক্ত করিলেন।

কর্ণাটক হইতে যে ধনরত্ন লাভ হইল তাহা কল্পনার অতীত।

দশম অধ্যায় : জীবনের শেষ দুই বৎসর

স্ত্রীলোকের বীরত্ব

পূর্ব্ব-কর্ণাটক বিজয়ের পর শিবাজী মহীশূর পার হইয়া ১৬৭৮ সালের গোড়ায় পশ্চিম কানাড়া বালাঘাট—অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে বর্ত্তমান ধারোয়ার জেলায় পৌঁছিলেন। এই অঞ্চলের লক্ষ্মীশ্বর প্রভৃতি নগরে লুঠ ও চৌথ আদায় করিয়া তিনি উহার উত্তরে বেলগাঁও জেলায় ঢুকিলেন। বেলগাঁও দুর্গের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বেলবাড়ী নামক গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় ঐ গ্রামের পাটেলনী (অর্থাৎ জমিদারণী)—সাবিত্রী বাঈ নামক কায়স্থ বিধবার অনুচরগণ মারাঠাসৈন্যদের কতকগুলি মালের বলদ কাড়িয়া লইল। ইহাতে শিবাজী রাগিয়া বেলবাড়ীর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী বাঈ সেই মহাবিজয়ী বীর ও তাঁহার অগণিত সৈন্যের বিরুদ্ধে অদম্য সাহসে যুঝিয়া ২৭ দিন পর্য্যন্ত নিজের ছোট মাটির গড়টি রক্ষা করিলেন। শেষে তাঁহার খাদ্য ও বারুদ ফুরাইয়া গেল, মারাঠারা বেলবাড়ী দখল করিল, বীর নারী বন্দী হইলেন। এমন এক ক্ষুদ্র স্থানে এত দীর্ঘকাল বাধা পাওয়ায় শিবাজীর বড় দুর্নাম রটিল। ইংরাজ-কুঠীর সাহেব লিখিতেছেন (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৬৭৮),— "তাঁহার নিজের লোকেরাই ওখান হইতে আসিয়া বলিতেছে যে বেলবাড়ীতে তাঁহার যত বেশী নাকাল হইয়াছে, নাকাল অতটা তিনি মুঘল বা বিজাপুর সুলতানের হাতেও হন নাই। যিনি এত রাজ্য জয় করিয়াছেন, তিনি কিনা শেষে এক স্ত্রীলোক দেশাইকে হারাইতে পারিতেছেন না।"

বিজাপুর-লাভের চেষ্টা বিফল

ইতিমধ্যে শিবাজী ঘুষ দিয়া বিজাপুর-দুর্গ লাভ করিবার এক ফন্দি আঁটিয়াছিলেন। ঘটনাটা এই,—উজীর বহলোল খাঁর মৃত্যু (২৩ ডিসেম্বর, ১৬৭৭)-র পর তাঁহার ক্রীতদাস জমশেদ খাঁ ঐ দুর্গ ও বালক রাজা সিকন্দর আদিল শাহর ভার পাইয়াছিল; কিন্তু সে দেখিল উহা রক্ষা করিবার মত বল তাহার নাই। তখন ত্রিশ লক্ষ টাকার বদলে রাজা ও রাজধানীকে শিবাজীর হাতে সঁপিয়া দিতে সম্মত হইল। এই সংবাদ পাইয়া আদোনীর নবাব সিদ্দি মাসুদ (মৃত সিদ্দি জৌহরের জামাতা) গোপনে থাকিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার কঠিন অসুখ, অবশেষে নিজের মৃত্যু-সংবাদও রটাইলেন। এমন কি একখানা পালকীতে করিয়া যেন তাঁহারই মৃতদেহ বাক্সে পূরিয়া কয়েক হাজার রক্ষী সহ কবর দিবার জন্য আদোনী পাঠান হইল। তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যদল—চার হাজার

অশ্বারোহী,—বিজাপুরে গিয়া জমশেদকে জানাইল, "আমাদের প্রভু মারা যাওয়ায় আমাদের অন্ন জুটিতেছে না; তোমার চাকরিতে আমাদের লও।" সেও তাহাদের ভর্ত্তি করিয়া দুর্গের মধ্যে স্থান দিল। আর, তাহারা দুই দিন পরে জমশেদকে বন্দী করিয়া বিজাপুরের ফটক খুলিয়া দিয়া সিদ্দি মাসুদকে ভিতরে আনিল। মাসুদ উজীর হইলেন (২৯ ফেব্রুয়ারি)। শিবাজী এই চরম লাভের আশায় বিফল হইবার পর পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া নিজদেশে পনহালায় প্রবেশ করিলেন (বোধ হয় ৪ঠা এপ্রিল, ১৬৭৭)।

মারাঠাদের অন্যান্য যুদ্ধ ও দেশজয়

শিবাজী কর্ণাটক-অভিযানে যে পনের মাস নিজদেশ হইতে অনুপস্থিত ছিলেন সেই সময় তাঁহার সৈন্যগণ গোয়া ও দামনের অধীনে পোর্তুগীজদের মহাল আক্রমণ করে, কিন্তু ইহাতে কোনই ফল হয় নাই। সুরত এবং নাসিক জেলায় পেশোয়া এবং পশ্চিম-কানাড়ায় দত্তাজী কিছুদিন ধরিয়া লুঠ করেন, কিন্তু ইহাতে দেশজয় হয় নাই।

১৬৭৮ সালের এপ্রিলের প্রথমভাগে দেশে ফিরিয়া শিবাজী কোপল অঞ্চল—অর্থাৎ বিজয়নগর শহরের উত্তরে তুঙ্গভদ্রা নদীর অপর তীর—এবং তাহার পশ্চিমে গদগ মহাল জয় করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। হুসেন খাঁ এবং কাসিম খাঁ মিয়ানা দুই ভাই বহলোল খাঁর স্বজাতি। কোপল প্রদেশ এই দুই আফগান ওমরার অধীনে ছিল। শিবাজী ১৬৭৮ সালে গদগ এবং পর বৎসর মার্চ্চ মাসে কোপল অধিকার করিলেন। "কোপল দক্ষিণ দেশের প্রবেশ-দ্বার," এখান হইতে তুঙ্গভদ্রা নদী পার হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়া সহজেই মহীশূরে যাওয়া যায়। এই পথে প্রবেশ করিয়া মারাঠারা ঐ নদীর দক্ষিণে বেলারী ও চিতলদুর্গ জেলার অনেক স্থান অধিকার করিল, পলিগরদের বশে আনিল। এই অঞ্চলের বিজিত দেশগুলি একত্র করিয়া শিবাজীর রাজ্যের একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল; উহার শাসনকর্ত্তা হইলেন জনার্দন নারায়ণ হনুমন্তে।

শিবাজী দেশে ফিরিবার একমাস পরেই তাঁহার সৈন্যরা আবার শিবনের-দুর্গ রাত্রে আক্রমণ করিল। কিন্তু বাদশাহী কিলাদার আবদুল আজিজ খাঁ সজাগ ছিল—সে আক্রমণকারীদের আবার মারিয়া তাড়াইয়া দিল, এবং বন্দী শত্রুদের মুক্তি দিয়া তাহাদের দ্বারা শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইল, "যতদিন আমি কিলাদার আছি, ততদিন এ দুর্গ অধিকার করা তোমার কাজ নয়।"

এদিকে বিজাপুরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িল। উজীর সিদ্দি মাসুদই সর্ব্বেসর্ব্বা—বালক সুলতান তাহার হাতে পুতুলমাত্র। চারিদিকে নানা শত্রুর উৎপাতে উজীর অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। মৃত বহলোল খাঁর আফঘানদল তাঁহাকে নিত্য অপমান করে ও ভয় দেখায়; শিবাজী রাজ্যের সর্ব্বত্র অবাধে লুঠ করেন ও মহাল দখল করেন; রাজকোষে টাকা নাই; দলাদলির ফলে রাজশক্তি নির্জ্জীব। আর অল্পদিন আগে যেসব শর্ত্তে মুঘল-সেনাপতির সহিত গুলবর্গায় তাঁহার সন্ধি হয়, তাহা বিজাপুর-রাজবংশের পক্ষে অত্যন্ত অপমান ও ক্ষতিজনক বলিয়া সকলে মাসুদকে ধিক্কার দিতে থাকে। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া হতভম্ব মাসুদ শিবাজীর নিকট সাহায্য চাহিলেন, বলিলেন যে শিবাজীও এই আদিলশাহী বংশের নূন খাইয়াছেন এবং একদেশবাসী; মুঘলেরা তাঁহাদের দুজনেরই শত্রু, দুজনে মিলিত হইয়া মুঘলদের দমন করা উচিত। এই সন্ধির কথাবার্ত্তার সংবাদ পাইয়া দিলির খাঁ রাগিয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন (১৬৭৮ সালের শেষে)।

শম্ভুজীর পলায়ন ও দিলিরের সঙ্গে যোগদান

শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী যেন পিতার পাপের ফল হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই একুশ বৎসর বয়সেই তিনি উদ্ধত, খামখেয়ালি, নেশাখোর এবং লম্পট হইয়া পড়িয়াছেন। একজন সধবা ব্রাহ্মণীর ধর্ম নষ্ট করিবার ফলে ন্যায়পরায়ণ পিতার আদেশে তাঁহাকে পনহালা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে শম্ভুজী নিজ স্ত্রী যেসু বাঈকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পলাইয়া গিয়া দিলির খাঁর সহিত যোগ দিলেন (১৩ই ডিসেম্বর, ১৬৭৮)। শম্ভুজীকে পাইয়া দিলির খাঁর আহ্লাদ ধরে না। "তিনি যেন ইতিমধ্যে সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছেন এরূপ উল্লাস করিতে লাগিলেন এবং বাদশাহকে এই পরম সুখবর দিলেন।" আওরংজীবের পক্ষ হইতে শম্ভুজীকে সাত হাজারী মন্‌সব্, রাজা উপাধি এবং একটি হাতী দেওয়া হইল। তাহার পর দুজনে একসঙ্গে বিজাপুর দখল করিতে চলিলেন।

এই বিপদে সিদ্দি মাসুদ শিবাজীর শরণ লইলেন। শিবাজী অমনি ছয় সাত হাজার ভাল অশ্বারোহী বিজাপুর-রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া রাজধানীর বাহিরে খানাপুরা ও খসরুপুরা গ্রামে আড্ডা করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে বিজাপুর দুর্গের একটা দরজা এবং একটা বুরুজ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। মাসুদ তাহাদের বিশ্বাস করিলেন না। তখন মারাঠারা বিজাপুর দখল করার এক ফন্দি পাকাইল :— কতকগুলি অস্ত্র চাউলের বস্তায় লুকাইয়া, বস্তাগুলি বলদের পিঠে বোঝাই করিয়া, নিজেদের কতকগুলি সৈন্যকে বলদ-চালকের ছদ্মবেশে বাজারে পাঠাইবার ভাণ করিয়া দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ধরা পড়িয়া তাহারা তাড়িত হইল। তাহার পর মারাঠারা এই বন্ধুর গ্রাম লুঠিতে আরম্ভ করিল। মাসুদ বিরক্ত হইয়া দিলির খাঁর সঙ্গে মিটমাট করিয়া ফেলিলেন, বিজাপুরে মুঘলসৈন্য ডাকিয়া আনিলেন, আর মারাঠাদের তাড়াইয়া দিলেন।

দিলিরের ভূপালগড়-জয়

তাহার পর শম্ভুজীকে সঙ্গে লইয়া দিলির খাঁ শিবাজীর ভূপালগড় তোপের জোরে কাড়িয়া লইলেন, এবং এখানে প্রচুর শস্য, ধন, মালপত্র, এবং অনেক লোককে ধরিলেন। এই সব বন্দীদের কতকগুলির এক হাত কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, অবশিষ্ট সকলকে দাস করিয়া বিক্রয় করা হইল (২রা এপ্রিল, ১৬৭৯)। ঐ দুর্গের দেওয়াল ও বুরুজগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ছোটখাট যুদ্ধ এবং বিজাপুরের দরবারে অশেষ দলাদলি ও ষড়যন্ত্র কয়েক মাস ধরিয়া চলিল; কোনই কিছু নিষ্পত্তি হইল না।

২রা এপ্রিল ১৬৭৯ সালে আওরংজীব হুকুম প্রচার করিলেন যে তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র হিন্দুদের মানুষ গণিয়া প্রত্যেকের জন্য বৎসর বৎসর তিন শ্রেণীর আয় অনুসারে ১৩.৫০—৬.৬২ বা ৩.৩১ “জজিয়া কর” লওয়া হইবে। বাদশাহর এই নূতন ও অন্যায় প্রজাপীড়নের সংবাদে শিবাজী তাঁহাকে নিম্নের সুন্দর পত্রখানি লেখেন। ইহা সুললিত ফারসী ভাষায় নীল প্রভুর দ্বারা রচিত হয়।

জজিয়া করের বিরুদ্ধে আওরংজীবের নামে শিবাজীর পত্র

"বাদশাহ আলমগীর, সালাম। আমি আপনার দৃঢ় এবং চিরহিতৈষী শিবাজী। ঈশ্বরের দয়া এবং বাদশাহর সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়া নিবেদন করিতেছি যে :—

যদিও এই শুভাকাঙ্ক্ষী দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার মহিমামণ্ডিত সন্নিধি হইতে অনুমতি না লইয়াই আসিতে বাধ্য হয়, তথাপি আমি, যতদূর সম্ভব ও উচিত, ভৃত্যের কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতার দাবি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে সদাই প্রস্তুত আছি।

এখন শুনিতেছি যে আমার সহিত যুদ্ধের ফলে আপনার ধন ও রাজকোষ শূন্য হইয়াছে, এবং এই কারণে আপনি হুকুম দিয়াছেন যে জজিয়া নামক কর হিন্দুদের নিকট আদায় করা হইবে, এবং তাহা আপনার অভাব পূরণ কবিতে লাগিবে।

বাদশাহ সালাম। এই সাম্রাজ্য-সৌধের নির্ম্মাতা আকবর বাদশাহ পূর্ণ-গৌরবে ৫২ [চান্দ্র] বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়—যেমন, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান, দাদুপন্থী, নক্ষত্রবাদী [ফলকিয়া=গগন-পূজক?], পরী-পূজক [মালাকিয়া], বিষয়বাদী [আনসরিয়া], নাস্তিক, ব্রাহ্মণ ও শ্বেতাম্বরদিগের প্রতি—সার্ব্বজনীন মৈত্রী [সুল্‌হ্-ই-কুল=সকলের সহিত শান্তি]র সুনীতি অবলম্বন করেন। তাঁহার উদার হৃদয়ের উদ্দেশ্য ছিল সকল লোককে রক্ষা ও পোষণ করা। এইজন্যই তিনি "জগৎগুরু" নামে অমর খ্যাতি লাভ করেন।

তাহার পর বাদশাহ জহাঙ্গীর ২২ বৎসর ধরিয়া তাঁহার দয়ার ছায়া জগৎ ও জগৎবাসীর মস্তকের উপর বিস্তার করিলেন। তাঁহার হৃদয় বন্ধুদিগকে এবং হস্ত কার্য্যেতে দিলেন, এবং এইরূপে মনের বাসনাগুলি পূর্ণ করিলেন। বাদশাহ শাহজহানও ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া সুখী পার্থিব জীবনের ফলস্বরূপ অমরতা—অর্থাৎ সজ্জনতা এবং সুনাম অর্জ্জন করেন।

(পদ্য)

যে জন জীবনে সুনাম অর্জ্জন করে

সে অক্ষয় ধন পায়,

কারণ, মৃত্যুর পর তাহার পুণ্য চরিতের কথা

তাহার নাম জীবিত রাখে॥

আকবরের মহতী প্রবৃত্তির এমনি পুণ্য প্রভাব ছিল যে তিনি যেদিকে চাহিতেন, সেদিকেই বিজয় ও সফলতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক অনেক দেশ ও দুর্গ জয় হয়। এই সব পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য ইহা হইতেই অতি সহজে বুঝা যায় যে আলমগীর বাদশাহ তাঁহাদের রাজনীতি অনুসরণ মাত্র করিতে গিয়া বিফল এবং বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদেরও জজিয়া ধার্য্য করিবার শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁহারা গোঁড়ামীকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে উচ্চ নীচ সব মনুষ্যকে ঈশ্বর বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতি তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নরূপে অনন্তকালের ইতিহাসে লিখিত রহিবে, এবং এই তিন পবিত্র-আত্মা [সম্রাটের] জন্য প্রশংসা ও শুভপ্রার্থনা চিরদিন ছোটবড় সমস্ত মানবজাতির কণ্ঠে ও হৃদয়ে বাস করিবে। লোকের প্রাণের

আকাঙ্ক্ষার ফলেই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য আসে। অতএব, তাঁহাদের ধনসম্পদ দিন দিন বাড়িয়াছিল, ঈশ্বরের জীবগুলি তাঁহাদের সুশাসনের ফলে শান্তিতে ও নিরাপদের শয্যায় বিরাম করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের সর্ব্ব কর্ম্মই সফল হইল।

আর আপনার রাজত্বে? অনেক দুর্গ ও প্রদেশ আপনার হাতছাড়া হইয়াছে; এবং বাকীগুলিও শীঘ্রই হইবে, কারণ তাহাদের ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন করিতে আমার পক্ষে চেষ্টার অভাব হইবে না। আপনার রাজ্যে প্রজারা পদদলিত হইতেছে, প্রত্যেক গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য কমিয়াছে,—এক লাখের স্থানে এক হাজার, হাজারের স্থানে দশ টাকা মাত্র আদায় হয়; আর তাহাও মহাকষ্টে। বাদশাহ ও রাজপুত্রদের প্রাসাদে আজ দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তি স্থায়ী আবাস করিয়াছে; ওমরা ও আমলাদের অবস্থা ত সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আপনার রাজত্বকালে সৈন্যগণ অস্থির, বণিকেরা অত্যাচার পীড়িত, মুসলমানেরা কাঁদিতেছে, হিন্দুরা জ্বলিতেছে, প্রায় সকল প্রজারই রাত্রে রুটি জোটে না এবং দিনে মনস্তাপে করাঘাত করায় গাল রক্তবর্ণ হয়।

এই দুর্দ্দশার মধ্যে প্রজাদের উপর জজিয়ার ভার চাপাইয়া দিতে কি করিয়া আপনার রাজ-হৃদয় আপনাকে প্রণোদিত করিয়াছে? অতি শীঘ্রই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে এই অপযশ ছড়াইয়া পড়িবে যে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ভিক্ষুকের থলিয়ার প্রতি লুব্ধ-দৃষ্টি ফেলিয়া, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, জৈন যতি, যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, দেউলিয়া, ভিখারী, সর্ব্বস্বহীন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের নিকট হইতে জজিয়া কর লইতেছেন! ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কাড়াকাড়িতে আপনার বিক্রম প্রকাশ পাইতেছে! আপনি তাইমুর-বংশের সুনাম ও মান ভূমিসাৎ করিয়াছেন।

বাদশাহ, সালাম ! যদি আপনি খোদার কেতাব (অর্থাৎ কুরাণ)-এ বিশ্বাস করেন, তবে দেখিবেন সেখানে লেখা আছে যে ঈশ্বর সর্ব্বজনের প্রভু (বর্-উল্-আলমীন্), শুধু মুসলমানের প্রভু (রব্-উল্-মুস্‌লমীন্) নহেন। বস্তুতঃ, ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম্ম দুইটি পার্থক্যব্যঞ্জক শব্দ মাত্র; যেন দুইটি ভিন্ন রং যাহা দিয়া স্বর্গবাসী চিত্রকর রং ফলাইয়া মানবজাতির [নানা বর্ণে রঙ্গীন] চিত্রপট পূর্ণ করিয়াছেন।

মসজিদে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্যই আজান উচ্চারিত হয়। মন্দিরে তাঁহার অন্বেষণে হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার জন্যই ঘণ্টা বাজান হয়। অতএব, নিজের ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য গোঁড়ামী করা ঈশ্বরের গ্রন্থের কথা বদল করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্রের উপর নূতন রেখা টানিলে আমরা দেখাই যে চিত্রকর ভুল আঁকিয়াছিল।

প্রকৃত ধর্ম্ম অনুসারে জজিয়া কোনমতেই ন্যায্য নহে। রাজনীতির দিক হইতে দেখিলে, জজিয়া শুধু সেই যুগেই ন্যায্য হইতে পারে যে-যুগে সুন্দরী স্ত্রীলোক স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া নির্ভয়ে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে নিরাপদে যাইতে পারে। কিন্তু, আজকাল আপনার বড় বড় নগর লুঠ হইতেছে, গ্রামের ত কথাই নাই। জজিয়া ত ন্যায়বিরুদ্ধ, তাহা ছাড়া ইহা ভারতে এক নূতন অত্যাচার ও ক্ষতিকারক।

যদি আপনি মনে করেন যে প্রজাদের পীড়ন ও হিন্দুদের ভয়ে দমাইয়া রাখিলে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রমাণিত হইবে, তবে প্রথমে হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় মহারাণা রাজসিংহের নিকট হইতে জজিয়া আদায় করুন। তাহার পর আমার নিকট আদায় করা তত কঠিন হইবে না, কারণ আমি ত আপনার সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু মাছি ও পিপীলিকাকে পীড়ন করা পৌরুষ নহে।

বুঝিতে পারি না কেন আপনার কর্ম্মচারীরা এমন অদ্ভুত প্রভুভক্ত যে তাহারা আপনাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানায় না, কিন্তু জ্বলন্ত আগুনকে খড় চাপা দিয়া লুকাইতে চায়।

আপনার রাজসূর্য্য গৌরবের গগনে দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকুক![15]

দিলিরের বিজাপুর-আক্রমণ; শিবাজীর আদিল শাহের পক্ষে যোগদান

১৮ই আগষ্ট ১৬৭৯, দিলির খাঁ ভীমা নদী পার হইয়া বিজাপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মাসুদ নিরুপায় হইয়া শিবাজীর নিকট হিন্দুরাও নামক দূতের হাত দিয়া এই করুণ নিবেদন পাঠাইলেন :—"এই রাজসংসারের অবস্থা আপনার নিকট গোপন নহে। আমাদের সৈন্য নাই, টাকা নাই, খাদ্য নাই, দুর্গ-রক্ষার জন্য কোন সহায় নাই। শত্রু মুঘল প্রবল এবং সর্বদা যুদ্ধ করিতে চায়। আপনি এই বংশের দুই পুরুষের চাকর, এই রাজাদের হাতে গৌরব সম্মান লাভ করিয়াছেন। অতএব, এই রাজবংশের জন্য অন্যের অপেক্ষা আপনার বেশী দুঃখ দরদ হওয়া উচিত। আপনার সাহায্য বিনা আমরা এই দেশ ও দুর্গ রক্ষা করিতে পারিব না। নিমকের সম্মান রাখুন; আমাদের দিকে আসুন; যাহা চান তাহাই দিব।"

ইহার উত্তরে শিবাজী বিজাপুর-রক্ষার ভার লইলেন; মাসুদের সাহায্যে দশ হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার বলদ-বোঝাই রসদ ঐ রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজ প্রজাদের হুকুম দিলেন, যে যত পারে খাদ্যদ্রব্য বস্ত্র প্রভৃতি বিজাপুরে বিক্রয় করুক। তাঁহার দূত বিসাজী নীলকণ্ঠ আসিয়া মাসুদকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আপনি দুর্গ রক্ষা করুন, আমার প্রভু গিয়া দিলিরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন।"

১৫ই সেপ্টেম্বর ভীমার দক্ষিণ তীরে ধূলখেড় গ্রাম হইতে রওনা হইয়া দিলির খাঁ ৭ই অক্টোবর বিজাপুরের ছয় মাইল উত্তরে পৌঁছিলেন।

ঐ মাসের শেষে শিবাজী নিজে দশ হাজার সৈন্য লইয়া বিজাপুরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে সেলগুড নামক স্থানে পৌঁছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার যে দশ হাজার অশ্বারোহী বিজাপুরের কাছে আসিয়াছিল, তাহারা এখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল। সেলগুড হইতে শিবাজী নিজে আট হাজার সওয়ার লইয়া সোজা উত্তর দিকে, এবং তাঁহার দ্বিতীয় সেনাপতি আনন্দ রাও দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মুঘল-রাজ্য লুঠ ও ভস্ম করিয়া দিবার জন্য ছুটিলেন। তিনি ভাবিলেন যে দিলির নিজ প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই বিজাপুর রাজ্য ছাড়িয়া ভীমা পার হইয়া উত্তরে ফিরিবেন। কিন্তু দিলির বিজাপুরী রাজধানী ও রাজাকে দখল করিবার লোভে নিজ প্রভুর রাজ্যের দুর্দ্দশার দিকে তাকাইলেন না।

দিলিরের নিষ্ঠুরতা, শম্ভুজীর পনহালায় ফিরিয়া আসা

বিজাপুরের মত প্রবল এবং বৃহৎ দুর্গ জয় করা দিলিরের কাজ নহে; স্বয়ং জয়সিংহও এখানে বিফল হইয়াছিলেন। একমাস সময় নষ্ট কবিয়া ১৪ই নবেম্বর দিলির বিজাপুর শহর হইতে সরিয়া গিয়া তাহার পশ্চিমের ধনশালী নগর ও গ্রামগুলি লুঠিতে আরম্ভ করিলেন। এই অঞ্চল যে মুঘলেরা

[15]লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ফারসী হস্তলিপির অনুবাদ।

আক্রমণ করিবে তাহা কেহই ভাবে নাই, কারণ মুঘলদিগের পশ্চাতে রাজধানী তখন অপরাজিত ছিল। সুতরাং এই দিক হইতে লোকে পলায় নাই, স্ত্রী পুত্র ধন নিরাপদ স্থানে সরায় নাই। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়িয়া তাহাদের কঠোর দুর্দ্দশা হইল। "হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোকগণ সন্তান বুকে ধরিয়া বাড়ীর কুয়ায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সতীত্ব রক্ষা করিল। গ্রামকে গ্রাম লুঠে উজাড় হইল। একটি বড় গ্রামে তিন হাজার হিন্দু মুসলমান (অনেকে নিকটবর্ত্তী ছোট গ্রামগুলির পলাতক আশ্রয়প্রার্থী)-দের দাসরূপে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল।"

এই মত অনেক স্থান ধ্বংস করিয়া, দিলির বিজাপুরের ৪৩ মাইল পশ্চিমে আখ্‌নীতে পৌঁছিলেন। তিনি এই প্রকাণ্ড ধনজনপূর্ণ বাজার লুঠ করিয়া পুড়াইয়া দিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাস করিতে চাহিলেন (১০ নবেম্বর)। তাহারা সকলেই হিন্দু। শম্ভুজী এই অত্যাচারে বাধা দিলেন, দিলির তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না। সেই রাত্রে শম্ভুজী নিজ স্ত্রীকে পুরুষেব বেশ পরাইয়া দুজনে ঘোড়ায় চড়িয়া শুধু দশজন সওয়ার সঙ্গে লইয়া দিলির খাঁর শিবির হইতে গোপনে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং পরদিন বিজাপুব পৌঁছিয়া মাসুদের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে থাকা নিরাপদ নয় বুঝিয়া আবার পলাইলেন, এবং পথে পিতার কতকগুলি সৈন্যের দেখা পাইয়া তাঁহাদের আশ্রয়ে পনহালা পৌঁছিলেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৬৭৯)।

শিবাজীর জাল্‌না লুঠ ও মহাবিপদ হইতে উদ্ধার

ইতিমধ্যে শিবাজী ৪ঠা নবেম্বর সেলগুড হইতে বাহির হইয়া মুঘল-রাজ্যে ঢুকিলেন, দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া পথের দুধারে লুটিয়া পুড়াইয়া দিয়া ছারখার করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় ...ই তিনি জাল্‌না শহর (আওরঙ্গাবাদের ৪০ মাইল পূর্ব্বে) লুঠ করিলেন। কিন্তু এই জনপূর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্রে তেমন ধন পাওয়া গেল না। তখন জানিতে পারিলেন যে জাল্‌নার সব মহাজনেরা নিজ নিজ টাকাকড়ি শহরের বাহিরে সৈয়দ জান্ মহম্মদ নামক মুসলমান সাধুর আশ্রমে লুকাইয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই জানিত যে শিবাজী সব মন্দির ও মসজিদ, মঠ ও পীরের আস্তানা মান্য করিয়া চলিতেন, তাহাতে হাত দিতেন না। তখন মারাঠা-সৈন্যগণ ঐ আশ্রমে ঢুকিয়া পলাতকদের টাকা কাড়িয়া লইল, কাহাকেও কাহাকেও জখম কবিল। সাধু তাঁহার আশ্রমে শান্তি ভঙ্গ করিতে নিষেধ করায় তাহারা তাঁহাকে গালি দিল, ও মারিতে উদ্যত হইল। তখন ক্রোধে সেই মহাশক্তিমান পুণ্যাত্মা পুরুষ শিবাজীকে অভিসম্পাত করিলেন। ইহার পাঁচমাস পরে শিবাজীর অকালমৃত্যু হইল; সকলেই বলিল যে পীরের ক্রোধের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে।

মারাঠা-সৈন্য চারিদিন ধরিয়া জাল্‌না নগর এবং তাহার শহরতলীর গ্রাম ও বাগান লুঠ করিয়া দেশের দিকে—অর্থাৎ পশ্চিমে, ফিরিল। সঙ্গে অগণিত লুঠের টাকা, মণি, অলঙ্কার, বস্ত্র হাতী ঘোড়া ও উট, সেজন্য তাহারা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। রণমস্ত খাঁ নামে একজন চট্‌পটে সাহসী মুঘল-ফৌজদার এই সময় মারাঠা-সৈন্যদের পশ্চাতে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। শিধোজী নিম্বলকর পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বাধা দিল; তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল, শিধোজী ও তাঁহার দুই হাজার সৈন্য মারা পড়িল। আর, ইতিমধ্যে মুঘল-দাক্ষিণাত্যের রাজধানী আওরঙ্গাবাদ হইতে অনেক সৈন্য রণমস্ত খাঁর দলপুষ্টি করিবার জন্য আসিতেছিল। তৃতীয় দিন তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছয় মাইল দূরে পৌঁছিয়া রাত্রির জন্য থামিল। শিবাজী চারিদিকে ঘেরা হইয়া ধরা পড়েন আর কি। কিন্তু ঐ নূতন সৈন্যগণের সর্দ্দার কেশরী সিংহ গোপনে সেই রাত্রে শিবাজীকে পরামর্শ দিয়া পাঠাইল

যে সামনের পথ বন্ধ হইবার আগেই তিনি যেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেশে পলাইয়া যান। অবস্থা প্রকৃতই খুব সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, শিবাজী লুঠের মাল, নিজের দু-হাজার ঘোড়া ইত্যাদি সব সেখানে ফেলিয়া মাত্র পাঁচশত বাছাবাছা ঘোড়সওয়ার সঙ্গে লইয়া স্বদেশের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহার সুদক্ষ প্রধান চর বহিরজী একটি অজানা পথ দেখাইয়া দিয়া তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া তাঁহাকে অবিরাম কুচ করাইয়া নিরাপদ স্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। শিবাজীর প্রাণ রক্ষা হইল; কিন্তু, এই যুদ্ধে ও পলায়নে তাঁহার চারি হাজার সৈন্য মারা পড়ে, সেনাপতি হাম্বীর রাও আহত হন, এবং অনেক সৈন্য মুঘলদের হাতে বন্দী হয়।

লুঠের জিনিষ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া মাত্র পাঁচশত রক্ষীর সহিত শিবাজী অবসন্নদেহে পাট্টা দুর্গে পৌঁছিলেন (২২ নবেম্বর)। ইহা নাসিক শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে এবং তলঘাট ষ্টেশনের ২০ মাইল পূর্ব্বে। এখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিবার পর আবার তিনি চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, এজন্য পাট্টাকে "বিশ্রামগড়" নাম দিলেন।

শেষ পারিবারিক বন্দোবস্ত

ইহার পর ডিসেম্বর মাসের প্রথমে তিনি রায়গড়ে গিয়া সেখানে তিন সপ্তাহ কাটাইলেন। শম্ভুজী পনহালাতে ফিরিয়া আসায় (৪ঠা ডিসেম্বর), শিবাজী স্বয়ং সেই দুর্গে জানুয়ারির প্রথমে গেলেন। নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদল মারাঠা-সৈন্য খান্দেশে ঢুকিয়া ধরণগাঁও, চোপ্‌রা প্রভৃতি বড় বড় বাজার লুঠিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠপুত্রের চরিত্র ও বুদ্ধির কথা ভাবিয়া শিবাজী নিজ রাজ্য ও বংশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। তাঁহার নানা উপদেশ ও মিষ্ট কথায় কোন ফল হইল না। শিবাজী পুত্রকে নিজের বিশাল রাজ্যের সমস্ত মহাল দুর্গ ধনভাণ্ডার অশ্ব গজ ও সৈন্যদলের তালিকা দেখাইলেন এবং সৎ ও উচ্চমনা রাজা হইবার জন্য নানা উপদেশ দিলেন। শম্ভুজী পিতার কথা শুধু চুপ করিয়া শুনিয়া উত্তর দিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" শিবাজী স্পষ্টই বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর শম্ভুজীর হাতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের কি দশা হইবে। এই দুর্ভাবনা ও হতাশা তাঁহার আয়ু হ্রাস করিল। শম্ভুজীকে আবার পনহালা-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইল, এবং শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৮০)। তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া, শিবাজী তাড়াতাড়ি কনিষ্ঠ পুত্র দশ বৎসরের বালক রাজারামের উপবীত ও বিবাহ দিলেন (৭ই ও ১৫ই মার্চ্চ)।

শিবাজীর মৃত্যু

২৩ মার্চ শিবাজীর জ্বর ও রক্ত-আমাশয় দেখা দিল। বারো দিন পর্য্যন্ত পীড়ার কোন উপশম হইল না। ক্রমে সব আশা ফুরাইল। তিনিও নিজ দশা বুঝিয়া কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া শেষ উপদেশ দিলেন; ক্রন্দনশীল আত্মীয়স্বজন, প্রজা ও সেবকদের বলিলেন, "জীবাত্মা অবিনশ্বর, আমি যুগে যুগে আবার ধরায় আসিব।" তাহার পর চিরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া অন্তিমের সকল ক্রিয়াকর্ম্ম করাইলেন।

অবশেষে চৈত্র পূর্ণিমার দিন (রবিবার, ৪ঠা এপ্রিল, ১৬৮০) সকালে তাঁহার জ্ঞান লোপ হইল, তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে তাহা অনন্ত নিদ্রায় পরিণত হইল। মারাঠা জাতির নবজীবন-দাতা কর্ম্মক্ষেত্র শূন্য করিয়া বীরদের বাঞ্ছিত অমরধামে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসরের ছয় দিন কম ছিল।

সমস্ত দেশ স্তম্ভিত, বজ্রাহত হইল। হিন্দুর শেষ আশা ডুবিল।

একাদশ অধ্যায় : শিবাজীর নৌবল এবং ইংরাজ ও সিদ্দিদের সহিত সংঘর্ষ

রাজাপুরের ইংরাজেরা শিবাজীর শত্রুতা করিল

১৬৫৯ সালের শেষে যখন শিবাজী বিজাপুর-রাজ্যে নানা স্থান জয় করিতে লাগিলেন, তখন ইংরাজদের প্রধান কুঠী ছিল সুরতে; এটি মুঘলসাম্রাজ্যের মধ্যে। বম্বে দ্বীপ তখনও পোর্তুগীজদের হাতে; ইংরাজেরা রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহে যৌতুক-স্বরূপ পোর্তুগালরাজের নিকট হইতে ইহার আট বৎসর পরে এই দ্বীপ পান, এবং আরও অনেক বৎসর পরে সুরত হইতে এখানে প্রধান অফিস উঠাইয়া আনেন। সুরতের পর রাজাপুর (রত্নগিরি জেলার বন্দর) এবং কারোয়ার (গোয়ার দক্ষিণে বন্দর), কানাড়ার অধিত্যকায় হুবলী এবং খান্দেশ প্রদেশে ধরণগাঁও প্রভৃতি আরও কয়েকটি বড় ক্রয়-বিক্রয়ের শহরে ইংরাজদের কুঠী এবং কাপড় ও মরিচের আড়ৎ ছিল।

১৬৬০ সালে জানুয়ারির প্রথমেই শিবাজীর সৈন্যেরা রাজাপুর বন্দর কিছুদিনের জন্য দখল করে এবং সেখানকার ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ হেনরি রেভিংটন্ বিজাপুরী আমলার মালপত্র কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিয়া তাহা মারাঠাদের লইতে বাধা দেন। এই ঘটনা হইতে শিবাজীর সহিত ইংরাজদের প্রথম ঝগড়া বাধে, কিন্তু তাহা অল্পেই থামিয়া যায়।

ইহার কয়েক মাস পরেই যখন সিদ্দি জৌহর শিবাজীকে পন্হালা-দুর্গে ঘেরিয়া ফেলেন তখন সেই রেভিংটন এবং আর কয়েকজন ইংরাজ কতকগুলি বেঁটে তোপ (মর্টার) ও বোমার মত গোলা (গ্রেনেড়) জৌহরকে বেচিবার জন্য সেখানে গিয়া এই অস্ত্রের বল দেখাইবার উদ্দেশ্যে শিবাজীর দুর্গের উপর কতকগুলি গ্রেনেড় ছুঁড়িলেন। শিবাজী লক্ষ্য করিলেন যে ইংরাজ-পতাকার নীচু হইতে একদল সাহেব এইসব গোলা মারিতেছে।

রাজাপুরের ইংরাজ কুঠী লুণ্ঠন

বিদেশী বণিকদের এই অকারণ শত্রুতার শাস্তি পর বৎসর মিলিল। ১৬৬১ সালের মার্চ্চ মাসে শিবাজী রত্নগিরি জেলা দখল করিতে করিতে রাজাপুর পৌঁছিয়া ইংরাজ কুঠীয়ালদিগকে বন্দী করিয়া

লইয়া গেলেন, কুঠী লুঠ ও ছারখার করিবার পর তাহার মেঝে খুঁড়িয়া দেখিলেন যে টাকা লুকান আছে কিনা। ফলতঃ রাজাপুরে ইংরাজ বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস পাইল। অনেক টাকা না দিলে ছাড়িয়া দিব না—এই বলিয়া সেই চারিজন ইংরাজ-বন্দীকে দুই বৎসর ধরিয়া নানা পার্ব্বত্য-দুর্গে আটকাইয়া রাখিলেন।

কোম্পানীর কর্ত্তারা বলিলেন যে, যখন রেভিংটন প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিবাজীর শত্রুতা করিয়া এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, তখন কোম্পানী টাকা দিয়া তাহাদের খালাস করিতে বাধ্য নহে। অবশেষে অনেক কষ্ট সহ্য করিবার পর তাহারা ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৬৩ এমনি ছাড়া পাইল।

তাহার পর কোম্পানী রাজাপুরের কুঠী লুঠ ও ধ্বংস করার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন; শিবাজী এজন্য নিজ দায়িত্বস্বীকার করেন না, কখনও বা খুব কম টাকা খেসারৎ দিতে চাহেন। এই লইয়া বিশ বৎসরেরও অধিক সময় তর্ক-বিতর্ক চিঠি লেখালেখি চলিল। ইংরাজেরা আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা ও জিদের সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিজেদের এই দাবি ধরিয়া রহিলেন, বারে বারে শিবাজীর নিকট দূত[16] পাঠাইতে লাগিলেন। পরে হুব্লী, ধরণগাঁও প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ-কুঠীও মারাঠারা লুঠ করে, এবং তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়া হইল। এ বিবাদ শিবাজীর জীবনকালে নিষ্পত্তি হইল না, অথচ এজন্য দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধও বাধিল না! কারণ সে যুগে ইংরাজ ও শিবাজী অনেক বিষয়ে পরস্পরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। বম্বে দ্বীপে তরকারী, চাউল, মাংস, জ্বালানী কাঠ কিছুই জন্মিত না; এগুলি পরপারে শিবাজীর দেশ হইতে না আসিলে, বম্বের লোক অনাহারে মারা যাইত। আর, শিবাজীর রাজ্যে লবণ মোমবাতী সৌখীন পশমী কাপড় (বনত ও সকরলাৎ) তোপ ও বারুদ ইংরাজেরাই আনিয়া দিতে পারিতেন। তা ছাড়া ইংরাজদের বেচা-কেনায় শিবাজীর প্রজাদের এবং পণ্যমাশুল হইতে রাজসরকারের অনেক টাকা আয় হইত। কাজেই এই ঝগড়া যুদ্ধ পর্য্যন্ত গড়াইল না।

রাজাপুর-কুঠীর ক্ষতিপূরণের দাবি

ইংরাজ-বণিকেরা বেশ বুঝিতেন যে, শিবাজীকে চটাইলে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যে তাঁহাদের বেচা-কেনা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে; অথচ তাঁহাদের এমন শক্তি ছিল না যে যুদ্ধ করিয়া শিবাজীকে কাবু করেন বা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করেন। তাঁহাদের একদিকে ভয় যে যদি তাঁহারা শিবাজীকে তোপ ও গোলা বিক্রয় না করেন তবে তিনি চটিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবেন; অপর দিকেও বিপদ কম নহে,—মারাঠা-রাজকে এইরূপে সাহায্য করা হইয়াছে টের পাইলে মুঘল বাদশাহ রাগিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে ইংরাজ-কুঠী উঠাইয়া দিবেন এবং বণিকদের কয়েদ করিবেন। ফরাসীরা এরূপ অবস্থায় অতি গোপনে কিছু ছোট ছোট তোপ ও সীসা শিবাজীকে বিক্রয় করেন।

চতুর ইংরাজ-কর্ত্তারা নিজ স্থানীয় কর্ম্মচারীদের লিখিয়া পাঠাইলেন— "এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে এমন সাবধানে চলিবে যেন কোনপক্ষই রাগ না করে। শিবাজীকে তোপ বারুদ বেচিবেও না, আবার বেচিতে খোলাখুলি অস্বীকারও করিবে না। অস্পষ্ট উত্তর দিয়া যত সময় কাটান যায় তাহার চেষ্টা

[16]আষ্টিক্ (১৬৭২), নিকল্‌স (১৬৭৬), হেনরি অকসিণ্ডেন (১৬৭৫)।

করিবে। আর, আমরা আমাদের জাহাজ ও তোপ লইয়া গিয়া হাবশী রাজধানী জয় করিতে তাঁহাকে সাহায্য করতে পারি, এই লোভ দেখাইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিবে, এবং তাঁহাকে এইরূপে দীর্ঘকাল হাতে রাখিবে।”

শিবাজীও যে-টাকা একবার গ্রাস করিয়াছেন তাহা ফেরত দিতে নারাজ। এই অবস্থায় রাজাপুর-কুঠীর ক্ষতিপূরণের জন্য আলোচনার শেষ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব ছিল। ইংরাজেরা এক লক্ষ টাকা দাবি করিয়াছিল। শিবাজীর মন্ত্রীরা প্রথমে ক্ষতির পরিমাণ বিশ হাজার টাকা ধার্য্য করিলেন, পরে আটাশ হাজার এবং শেষে চল্লিশ হাজারে উঠিলেন। কিন্তু তাহাও নগদ নহে; ইহার মধ্যে ৩২ হাজার টাকা কতক নগদ কতক বাণিজ্য-দ্রব্য দিয়া শোধ হইবে, আর বাকী আট হাজার টাকা তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত রাজাপুর বন্দরে ইংরাজদের আমদানী মালের দেয় মাশুল মাফ করিয়া পূরণ করা হইবে।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের দরবারে (১৬৭৪ জুন) ইংরাজদূত হেনরি অক্‌সিণ্ডেন উপস্থিত হইয়া এই তিন শর্ত্তে মিটমাট করিয়া এক সন্ধিপত্র সহি মোহর করাইয়া লইলেন :—

(১) শিবাজী ক্ষতিপূরণ বাবদে ইংরাজদের চল্লিশ হাজার টাকা দিবেন। ইহার এক-তৃতীয়াশ নগদ টাকা ও দ্রব্য (যেমন সুপারি) দিয়া শিবাজীর মৃত্যুর পূর্ব্বে শোধ হয়।

(২) তাঁহার রাজ্যে ইংরাজ-কুঠীগুলি রক্ষা করিবেন। তদনুসারে ১৬৭৫ সালে রাজাপুরে ইংবাজেরা আবার কুঠী খোলেন।

(৩) তাঁহার বাজ্যের কূলে ঝড়ে কোন জাহাজ আসিয়া অচল হইয়া পড়িলে অথবা ভগ্ন জাহাজের ভাসা মালগুলি পৌঁছিলে, নিজে জব্‌ৎ না করিয়া মালিককে ফিরাইয়া দিবেন।

কিন্তু শিবাজী ইংরাজদের চতুর্থ প্রার্থনা, অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যে ইংরাজদের মুদ্রা প্রচলিত করিতে, কিছুতেই রাজি হইলেন না।

শিবাজীর সহিত ইংরাজ-বণিকদের সাক্ষাৎ

রাজাপুরের নূতন কুঠীর সাহেবেরা শিবাজীর সহিত ১৬৭৫ সালে দেখা করিয়া তাহার এই সুন্দর বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন।—

“রাজা ২২এ মার্চ্চ দুপুরবেলায় এখানে আসেন, সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী পদাতিক ও দেড়শত পাল্কী। তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়াই আমরা তাঁবু হইতে বাহির হইলাম এবং অল্প দূরেই তাঁহাকে পাইলাম। আমাদের দেখিয়া তিনি পাল্কী থামাইলেন এবং কাছে ডাকিয়া জানাইলেন, আমরা যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি তাহাতে তিনি খুব খুশী হইয়াছেন, কিন্তু এই রৌদ্রের গরমে আমাদের এখন বেশীক্ষণ রাখিবেন না, বিকালে ডাকিবেন।

২৩এ মার্চ্চ রাজা আসিলেন এবং পাল্কী থামাইয়া আমাদের কাছে ডাকিলেন। আমরা নিকটে গেলে তিনি হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া আরও কাছে আসিতে বলিলেন। যখন আমি তাঁহার সামনে পৌঁছিলাম, তিনি কুতূহলে আমার লম্বা পরচুল নিজ হাতে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন এবং অনেক

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন যে রাজাপুরে আমাদের সব অসুবিধা দূর করিবেন, এবং আমাদের যুক্তিসঙ্গত কোন অনুরোধই অগ্রাহ্য করিবেন না।

পরদিন আবার আমাদের ডাক পড়িল; দু'ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর আমাদের দরখাস্তের মারাঠী-অনুবাদ তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইল; তিনি আমাদের সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া ফর্ম্মান্ দিবেন, এ আশ্বাস দিলেন।"

জঞ্জিরার হাবশীগণ

ভারতের পশ্চিম-কূলে বম্বে শহর হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণে জঞ্জিরা নামে পাথরের একটি ছোট দ্বীপ আছে। তাহার আধ মাইল পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের এক খাড়ী কোলাবা জেলার মধ্যে ঢুকিয়াছে। এই খাড়ীর মুখে উত্তর তীরে দণ্ডা নামক শহর, তাহার তিনদিকে সমুদ্রের জল; আর দণ্ডার দুইমাইল উত্তর-পশ্চিমে রাজপুরী নামক আর একটি নগর; [রাজাপুর বন্দর এখান হইতে অনেক দূরে, দক্ষিণে]। এইগুলি এবং ইহাদের সংলগ্ন জমি লইয়া একটি ছোট রাজ্য; তাহার অধিকারীরা হাবশী জাতীয়, অর্থাৎ আফ্রিকার এবিসিনিয়া দেশ হইতে আগত; ইহাদের ভীষণ কাল রং, মোটা ঠোঁট, কোঁকড়া চুল।

এই হাবশীরা তথায় কয়েক ঘর মাত্র; অসংখ্য ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইত। তাহারা সকলেই যুদ্ধে এবং জাহাজ চালানতে দক্ষ; অন্য কোন ব্যবসা করিত না; প্রত্যেকেই যেন এক একজন ছোটখাট ওমরা বা রাজপুত এইরূপ পদগৌরবে থাকিত। তাহাদের দলপতি পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে হইতেন না; জাতির মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কর্ম্মদক্ষ বীরকে বাছিয়া নেতা স্বীকার করিয়া সকলে তাঁহাকে মানিত। হাবশী জাতি ভারতে বল-বিক্রম, শ্রম ও কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি, যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে সমান দক্ষতা, এবং প্রভুভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। আর, দৃঢ় স্থির মন, লোক চালাইবার ক্ষমতা, এবং জলযুদ্ধে পরিপক্কতায় ইউরোপীয় ভিন্ন অপর সব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহারা সিদ্দি (অর্থাৎ সৈয়দ বা উচ্চবংশজাত) নামে পরিচিত ছিল।

শিবাজী ও সিদ্দিদের শত্রুতার কারণ

জঞ্জিরার পূর্ব্বদিকের তীরভূমি কোলাবা জেলা। এখানে হাবশীদের খাদ্য জন্মে, রাজস্ব সংগ্রহ হয়, অনুচরগণ বাস করে। শিবাজী উত্তর-কোঁকনে কল্যাণ, অর্থাৎ বর্ত্তমান খানা জেলা, অধিকার করিয়া তাহার পরই কোলাবা জেলায় প্রবেশ করায়, হাবশীদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইল। ইহা অনিবার্য্য; কারণ এই তটভূমি হারাইলে হাবশীরা না খাইতে পাইয়া মারা পড়িবে; সুতরাং তাহারা দণ্ডা-রাজপুরী নিজ হাতে রাখিবার জন্য প্রাণপণ লড়িতে থাকিল। অপর পক্ষে, শিবাজীও জানিতেন যে তটভূমি ও জঞ্জিরা দ্বীপ হইতে হাবশীদের তাড়াইতে বা অধীন করিতে না পারিলে তাঁহার কোঁকন প্রদেশের স্থলভাগও অসম্পূর্ণ, অরক্ষিত, হইয়া পড়িয়া থাকিবে; এই শত্রুরা জাহাজে করিয়া যেখানে সেখানে নামিয়া গ্রাম লুঠ ও প্রজাদের দাস করিয়া লইয়া যাইবে। "ঘরের মধ্যে ইঁদুর যেমন, সিদ্দিরাও ঠিক

সেই ধরণের শত্রু" (সভাসদ), বিশেষত, তাহারা হিন্দু প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের ধরিয়া মেথরের কাজ করাইত, সাধারণ লোকদের নাক-কান কাটিয়া দিত। আর, ঐ দ্বীপের ও দুর্গের আশ্রয়ে নিজ জাহাজ রাখিয়া সমুদ্রে যখন-তখন মারাঠী জাহাজ ধরিতে পারিত।

সিদ্দিদের সহিত মারাঠাদের অশেষ যুদ্ধ

এজন্য শিবাজীর জীবনের ব্রত হইল জঞ্জিরা দ্বীপ অধিকার করিয়া পশ্চিম-কূলে সিদ্দির প্রভাব একেবারে লোপ করা। এই কাজে তিনি অসংখ্য সৈন্য এবং জলের মত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মারাঠাদের তোপ ভাল ছিল না। তোপ চালানে দক্ষতা একেবারেই ছিল না। আর তাহাদের জাহাজগুলি হাবশী-জাহাজের তুলনায় অবজ্ঞার জিনিষ। এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধটা বাঙ্গলার ছেলেভুলান গল্পের "সুন্দরবনের বাঘ ও কুমীরের যুদ্ধের" মত হইল। শিবাজীর সৈন্য অসংখ্য, স্থলপথে অজেয়, অপর দিকে হাবশীরা জল-যুদ্ধে দুর্গরক্ষা করিতে তেমনি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহাদের স্থল-সৈন্য এক হাজারের বেশী নয়।

শিবাজী ১৬৫৯ সাল হইতে কোলাবা জেলায় ক্রমে বেশী বেশী সৈন্য পাঠাইয়া হাবশী-রাজ্যেব স্থলভূমি যথাসম্ভব দখল করিতে লাগিলেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, কখন এপক্ষ আগাইয়া আসে, কখন ওপক্ষ। অবশেষে দণ্ডা-দুর্গ শিবাজী কাড়িয়া লইলেন, আর দ্বীপটি মাত্র সিদ্দিদের দখলে থাকিল, তাহারা স্থলপথের দুর্গ ও শহরগুলি হারাইল। কিন্তু "পেট ভরিবার জন্য" জাহাজে করিয়া আসিয়া রত্নগিরি জেলায় গ্রাম লুঠিতে লাগিল। প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে শিবাজী কয়েক মাস ধরিয়া স্থল হইতে জঞ্জিরা দ্বীপের উপর গোলা ছুঁড়িতেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইত না। তিনি বুঝিলেন যে নিজের যুদ্ধ-জাহাজ না থাকিলে তাঁহার পক্ষে মান-সম্ভ্রম ও রাজ্যরক্ষা করা অসম্ভব। তখন নৌবল-গঠনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

শিবাজীর নৌবল

শিবাজীর যুদ্ধ-জাহাজের এবং জলপথে প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস অতি স্পষ্ট ও ধারাবাহিকরূপে জানা যায়। ১৬৫৯ সালে কল্যাণ অধিকার করিবার পর তাহার নীচে সমুদ্রের খাড়ীতে (বম্বে হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে) শিবাজী প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সমুদ্রে ভাসাইলেন। এই নবশক্তির জাগরণে পোর্ত্তুগীজদের ভয় ও হিংসা হইল। পরে কোঁকন তীর দিয়া তাঁহার দ্রুত রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নির্ম্মাণ, নৌ-সেনা ভর্ত্তি এবং কূলে জাহাজের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ জলদুর্গ ও বন্দর স্থাপন বাড়িয়া চলিল; "রাজা সমুদ্রের পিঠে জীন চড়াইলেন" (সভাসদ)।

শিবাজীর সর্ব্বসমেত চারিশত নৌকা ছিল। তাহা ছোট-বড় সকল শ্রেণীর, যথা ঘুরাব্ (তোপ-চড়ান, সমান ও উঁচু পাটাতনের যুদ্ধ-জাহাজ), গলবট্ (দ্রুতগামী পাতলা রণতরী), তরাণ্ডী, তার্বে, শিবাড্ এবং মাঁচোয়া (এ দুটি মালবাহী নৌকা), পগার্ ইত্যাদি। তাঁহার অধিকাংশ জাহাজই অতি ছোট, ভারী ধাতুর পাতে মোড়া নহে, এবং তীর ছাড়িয়া বহুদূরে সমুদ্রে দীর্ঘকাল থাকিতে অক্ষম;

কামানের এক গোলা লাগিলেই ডুবিয়া যাইত। ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ এগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এই সকল নৌকা অসার জিনিষ, ইংরাজদের একখানা ভাল যুদ্ধ-জাহাজ ইহাদের একশতখানা নির্ব্বিঘ্নে ডুবাইয়া দিতে পারে।" অর্থাৎ যাহাকে "মশা মাছি" (mosquito craft) বলা হয়। সুরত বম্বে ও গোয়া ছাড়া পশ্চিম-কূলের প্রায় আর-সব বন্দরের জলের গভীরতা এত কম যে বড় বড় ভারী জাহাজ সেখানে ঢুকিতে বা ঝড়ের সময় আশ্রয় লইতে পারে না। এজন্য প্রাচীনকাল হইতেই কোঁকন ও মালবার-কূলের পণ্য-দ্রব্য ছোট এবং কম গভীর (চেপ্টা তলা) নৌকায় চালান করা হইত; এসব নৌকা তীরের কাছে যেখানে ছোট খাড়ী ও নদীতে তুফান দেখিলেই পলাইয়া রক্ষা পাইত। এই দেশের যুদ্ধ-জাহাজও সেই ধরণে তৈয়ার করা হইত; এগুলি ছোট, বড় বড় বা বেশী সংখ্যার তোপ বহিতে পারিত না; ঝড়ে সমুদ্রে টিকিতে বা ডাঙ্গা ছাড়িয়া দূরে গিয়া একসঙ্গে অনেকদিন ধরিয়া পালে চলিবার জন্য প্রস্তুত নহে। তাহারা সংখ্যার জোরে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা করিত, তোপের গোলাতে নহে। শিবাজীও নিজ পোতগুলি এই প্রাচীন ধরণের গঠন করেন, এবং জলযুদ্ধে এই পুরাতন রণ-নীতির কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি করেন নাই। কাজেই, ইংরাজদের ত কথাই নাই, সিদ্দিদের কাছেও তাঁহার সহজেই পরাজয় হইত।

শিবাজীর নাবিক ও নৌ সেনাপতি

শিবাজীর নৌ-বল দুই ভাগ করিয়া রাখা হয়; দরিয়া সারঙ্গ (মুসলমান) এবং ময়া-নায়ক (হিন্দু) উপাধিধারী দুজন নৌ-সেনাপতি (য়্যাড্‌মিরাল্) ইহাদের নেতা। রত্নগিরি জেলার সমুদ্র-কূলের গ্রামগুলিতে জেলে ভণ্ডারী জাতের অনেক কৃষক আছে। ইহারা সমুদ্রে বাস করিতে, জাহাজ চালাইতে এবং নৌ-যুদ্ধে পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত। আগে ইহারা জলদস্যু-গিরি করিত। ইহাদের দেহ পুষ্ট, সবল ও ব্যায়ামে গঠিত—স্থল-যুদ্ধে যেমন মারাঠা ও কুন্‌বী জাত দক্ষ, ইহারাও ঠিক সেইমত। এই ভণ্ডারী এবং অপর কয়েকটি নীচ হিন্দুজাত—যথা, কোলী, সংঘর, বাঘের ও আংগ্রে (বংশ) হইতে শিবাজী অনেক উৎকৃষ্ট নৌ-সেনা ও নাবিক পাইলেন।

পরে (১৬৭৭ সালে) ঘরোয়া বিবাদের ফলে সিদ্দি সম্বল্ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সিদ্দি মিসরি, এই দুই হাবশী সর্দ্দার আসিয়া শিবাজীর অধীনে কাজ লইলেন। তাঁহার অপর মুসলমান নৌ-সেনাপতির নাম দৌলত খাঁ। কিন্তু জঞ্জিরার সিদ্দিদের জাহাজগুলি মারাঠাদের তুলনায় আকারে বড়, অধিকতর দৃঢ় ও সুরক্ষিত, এবং ভাল কামান এবং দক্ষতর যোদ্ধা দিয়া পূর্ণ; সুতরাং যুদ্ধে সিদ্দিরই জয়লাভ হইত, মারাঠারা অনেক বেশী লোক ও নৌকা হারাইয়া পলাইত।

শিবাজীর অনেকগুলি জাহাজ তাঁহার নিজের এবং প্রজাদের মাল লইয়া, আরবের মোচা, পারস্যের বসরা, ইত্যাদি বন্দরে যাত্রা করিয়া নানাদেশে বাণিজ্য করিতে লাগিল। দক্ষিণের আট-দশটা বন্দর তাঁহার বাণিজ্যপোতের কেন্দ্র ও বিশ্রামস্থল ছিল। আর, তাঁহার যুদ্ধের নৌকাগুলি যথাসম্ভব সমুদ্রে অরক্ষিত শত্রু-পোত এবং কূলে অন্যান্য রাজার বন্দর লুঠ করিত। সুরত হইতে বাদশাহর প্রজাদের জাহাজগুলি তীর্থযাত্রী লইয়া মক্কা যাইবার পথে শিবাজীর দ্বারা আক্রান্ত হইত, কখন ধরা পড়িত। অবশেষে, আওরংজীব এই-সব জাহাজ রক্ষা, পশ্চিমসমুদ্রে পাহারা দেওয়া এবং শিবাজীর নৌ-বল দমন করিবার ভার অনেক টাকা বেতনে সিদ্দিদের উপর দিলেন।

জঞ্জিরার বিপ্লব এবং সিদ্দি কাসিমের দণ্ডা জয়

শিবাজী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রায় প্রত্যেক বৎসরই জঞ্জিরা আক্রমণ করিতেন; এই সকল একঘেয়ে নিষ্ফল চেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। ১৬৬০-৭০ সালে তিনি জিদের সহিত অতি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সিদ্দি-সর্দ্দার ফতহ্ খাঁকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন; অন্নাভাবে জঞ্জিরার পতন হয় আর কি! অথচ সিদ্দিদের উপরের রাজা আদিল শাহর নিকট হইতে কোনপ্রকার সাহায্যের আশা নাই। তখন ফতহ্ খাঁ টাকা ও জাগীর লইয়া শিবাজীকে ঐ দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অপর তিনজন সিদ্দি-প্রধান তাঁহাকে বন্দী করিয়া জঞ্জিরা ও সিদ্দি জাহাজগুলির কর্তৃত্ব নিজ হাতে লইলেন। মুঘল-বাদশাহ সিদ্দিকে পুরুষানুক্রমে "ইয়াকুৎ খাঁ" উপাধি ও বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বেতন দিয়া নিজ চাকর করিয়া, সমুদ্রে পাহারা দিবার ভার দিলেন। সিদ্দি কাসিম হইলেন জঞ্জিরার, আর সিদ্দি খয়রিয়ৎ স্থলভূমির শাসনকর্ত্তা, এবং সিদ্দি সম্বল্ জাহাজগুলির নেতা (য়্যাড্‌মিরাল, আমীর-আল-বহর্।)

সিদ্দি কাসিম বড় চতুর সাহসী ও পরিশ্রমী লোক। তিনি সুশাসনে এবং কাজকর্মে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধে জাহাজ ও গোলাবারুদ বাড়াইলেন, অনেক মারাঠা-জাহাজ ধরিয়া ধনলাভ করিলেন। অবশেষে ১০ ফেব্রুয়াবি ১৬৭১(???) সালে, যখন দণ্ডা-দুর্গের মারাঠা-রক্ষীগণ সারাদিন হোলী উৎসবে মাতিয়া, মদ খাইয়া, ক্লান্ত-অবস্থায় রাত্রে অসাবধান হইয়া ঘুমাইতেছিল, তখন কাসিম গোপনে চল্লিশখানা জাহাজে সৈন্য লইয়া নিঃশব্দে দণ্ডার সমুদ্র-তীরের ঘাটে (অর্থাৎ দুর্গের দক্ষিণ মুখে) পৌঁছিলেন। এদিকে সিদ্দি খয়রিয়ৎ পাঁচশত সেনা লইয়া স্থলের দিকের দেওয়ালে (অর্থাৎ দুর্গের উত্তর-পূর্ব্বমুখে) গিয়া মহাবাদ্য ও গোলমালের সহিত সেই দেওয়াল আক্রমণ করিবার ভান করিলেন। মারাঠা-সৈন্যের অধিকাংশই এই দ্বিতীয় দিকে ছুটিল; আর সেই অবসরে কাসিম বিনা বাধায় ঘাটের দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া দুর্গে ঢুকিলেন। তাঁহার জনকতক লোক মরিল বটে, কিন্তু সেখানে মারাঠাদের যে-কয়জন রক্ষী ছিল তাহারা পরাস্ত হইয়া পলাইল। কাসিম দুর্গের মধ্যে আরও অগ্রসর হইলেন। এমন সময় হঠাৎ আগুন লাগিয়া দুর্গের বারুদের গুদাম ফাটিয়া যাওয়ায় মারাঠা কিলাদার এবং দুই পক্ষের অনেক লোক পুড়িয়া মরিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সৈন্যদল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কাসিম অমনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "খাস্‌সু! খাস্‌সু (তাঁহার রণ-বাণী)! বীরগণ, আশ্বস্ত হও। আমি বাঁচিয়া আছি, আমার কোন জখম হয় নাই।" তাহার পর শত্রু কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদিক হইতে আগত খয়রিয়তের দলের সহিত মিলিলেন, এবং সমস্ত দুর্গ দখল করিয়া মারাঠাদের নিঃশেষ করিয়া দিলেন।

শিবাজী জঞ্জিরা লইবার জন্য দিনরাত ভাবিতেছেন, আর কিনা তাঁহার হাত হইতে দণ্ডা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। এই সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। গল্প আছে যে, রাত্রিতে আগুন লাগিয়া বারুদের গুদাম উড়িয়া যাওয়ার সময় তিনি চল্লিশ মাইল দূরে নিজ গড়ে ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল; তিনি বলিলেন "মনটা কেমন করিতেছে। নিশ্চযই দণ্ডায় কোন বিপদ ঘটিয়াছে।"

এই জয়ের পর কাসিম ঐ অঞ্চলে আরও সাতটি দুর্গ মারাঠাদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং পরাজিত লোকদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার করিলেন। শিবাজী ও শম্ভুজী তাঁহাদের রাজত্বকালে এই প্রদেশ পুনরায় দখল করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জাহাজ দিয়া অপর পক্ষকে চূড়ান্ত পরাজিত করিতে সাহায্য করিবার জন্য শিবাজী ও বাদশাহ প্রত্যেকেই বম্বের ইংরাজদের সাধিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা বণিকের উচিত শান্তিতে রহিলেন; ফরাসী

কোম্পানী কিন্তু এই ফাঁকে গোপনে শিবাজীকে ৮০টা ছোট তোপ এবং দু' হাজার মণ সীসা বেচিয়া একচোট লাভ করিয়া লইল। ডচেরা শিবাজীর নিকট প্রস্তাব করিল, "আপনি সৈন্য দিন, আমরা জাহাজ দিব; উভয়ে একজোটে বম্বে আক্রমণ করিয়া ইংরাজদের বেদখল করিব, আর তাহার পর দণ্ডা কাড়িয়া লইয়া আপনাকে দিব।" কিন্তু শিবাজী এ কথায় কান দিলেন না। তাহার পর কত বৎসর ধরিয়া ঢিমে তালে এই যুদ্ধ চলিতে থাকিল। দুই পক্ষই অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল।

শিবাজীর নৌ-যুদ্ধ

১৬৭৪ সালের মার্চ্চ মাসে সিদ্দি সম্বল্ সাতবলী নদীর মুখের খাড়ীতে ঢুকিয়া শিবাজীর নৌ-সেনাপতি দৌলত খাঁকে আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহাকে পরাস্ত হইয়া ফিরিতে হইল; এই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই প্রধান সেনাপতি আহত হন এবং একশত ও ৪৪ জন লোক মারা পড়ে। সিদ্দি সম্বল অন্যান্য হাবশীদের সঙ্গে ঝগড়া করায় তাঁহাকে নৌ-সেনাপতির পদ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল; তিনি অবশেষে (১৬৭৭ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরে) স্বজাতির সঙ্গ ও জাহাজ ছাড়িয়া নিজ পরিবার ও অনুচর লইয়া শিবাজীর অধীনে চাকরি লইলেন।

খান্দেরী দ্বীপ লইয়া ইংরাজের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ

জঞ্জিরা-জয়ে হতাশ হইয়া শিবাজী নিজে একটি জলবেষ্টিত দুর্গ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় কাছাকাছি আর একটি দ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ইহার নাম খান্দেরী, বম্বের এগার মাইল দক্ষিণে এবং জঞ্জিরার ৩০ মাইল উত্তরে। ১৬৭৯ সেপ্টেম্বরে তাঁহার দেড়শত লোক চারিটি কামান লইয়া ময়া-নায়কের অধীনে জাহাজে আসিয়া এই ছোট শূন্য দ্বীপটি দখল করিল, এবং তাড়াতাড়ি পাথর ও মাটির দেওয়াল তুলিয়া ইহার চারিদিক ঘিরিয়া দিল। রাজা এই-সব খরচের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে ইংরাজদের ভয় হইল, কারণ বম্বেতে যে-সব জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলি খান্দেরী হইতে অতি স্পষ্ট দেখা যায় এবং শীঘ্র আক্রমণ করা সম্ভব। এই খান্দেরী শত্রুর অভেদ্য দুর্গ হইয়া উঠিলে, ইহার আশ্রয় হইতে মারাঠা যুদ্ধ-জাহাজের পক্ষে সমুদ্রে ইংরাজ-বাণিজ্যপোত ধ্বংস করা সহজ হইবে।

সুতরাং বম্বের ইংরাজদের সৈন্য ও রণপোত মারাঠাদের খান্দেরী হইতে তাড়াইয়া দিতে আসিল। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৬৭৯ ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হইল; ইংরাজ হারিলেন, কারণ ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে স্থলযুদ্ধই ছিল। বড় বড় ইংরাজ-জাহাজগুলি তীর হইতে দূরে থামিয়া খান্দেরী উপসাগরে ঢুকিতে দেরি করিতেছিল, কারণ তখনও সেখানকার জলের গভীরতা মাপা হয় নাই। এমন সময়ে প্রধান সেনাপতির আজ্ঞা অমান্য করিয়া, লেফটেনাণ্ট ফ্রান্সিস্ থর্প্ মাত্র তিনখানা পদাতিক-ভরা তোপহীন ছোট শিবাড (মালের নৌকা) সঙ্গে লইয়া ঐ দ্বীপে নামিবার চেষ্টা করিলেন। তীর হইতে তাঁহাদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। থর্প এবং আর দুইজন ইংরাজ মারা পড়িল, অনেকে জখম হইল, আর অনেকে তীরে নামিবার পর মারাঠাদের হাতে বন্দী হইল। থর্পের শিবাডখানা শত্রুরা দখল করিল; আর দুখানা বাহির সমুদ্রে পলাইয়া গেল।

১৮ই অক্টোবর দ্বিতীয়বার জলযুদ্ধ হইল। সেদিন প্রাতঃকালে দৌলত খাঁ ৬০ খানা রণপোত লইয়া আক্রমণ করিলেন। ইংরাজদের আটখানা মাত্র জাহাজ ছিল, তাহার মধ্যে 'রিভেঞ্জ' নামক ফ্রিগেট ও দুইখানা ঘুরাব্ বড়, বাকী সব ছোট; এগুলিতে দুইশত ইংরাজ-সৈন্য এবং দেশী ও সাহেব নাবিক ছিল। চৌল-দুর্গের কিছু উত্তরে তীরের আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া মারাঠা-জাহাজগুলি সামনের গলুই হইতে তোপ দাগিতে দাগিতে এত দ্রুত অগ্রসর হইল যে খান্দেরীর বাহিরে ইংরাজ পোতগুলি নোঙর তুলিয়া অগ্রসর হইবার সময় পাইল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে ইংরাজদের 'ডোভার' নামক ঘুরাবে সার্জেন্ট মলেভারার ও জনকয়েক গোরা অত্যন্ত কাপুরুষতার সহিত আত্মসমর্পণ করিল এবং জাহাজ শুদ্ধ সকলেই মারাঠাদের হাতে বন্দী হইল।[17] অপর ছয়খানি ছোট ইংরাজজাহাজও ভয়ে রণস্থল হইতে দূরে রহিল। কিন্তু এক সিংহই সহস্র শৃগালকে হারাইতে পারে। চারিদিকে শত্রুপোতের মধ্যে 'রিভেঞ্জ' ফ্রিগেট নির্ভয়ে খাড়া রহিয়া, তোপের গোলায় পাঁচখানা মারাঠী গলবট্ ডুবাইয়া দিল, এবং আরও অনেকগুলির এমন দশা করিল যে দৌলত খাঁ নিজ পোত লইয়া নাগোৎনায় পলাইয়া গেলেন; রিভেঞ্জ তাঁহার পিছু পিছু ছুটিল।

দুইদিন পরে দৌলত খাঁ খাড়ী হইতে আবার বাহির হইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ-জাহাজ তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া ফিরিয়া পলাইলেন। নবেম্বরের শেষে সিদ্দি কাসিম ৩৪খানা জাহাজ লইয়া ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং দুই দলই খান্দেরীর উপর প্রত্যহ গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সব যুদ্ধের খরচ এবং শিবাজীর রাজ্যে তাঁহাদের বাণিজ্য বন্ধ হইবার ভয়ে ইংরাজদের কর্ত্তারা ভীত হইলেন। তাঁহাদের অর্থ ও লোক কম; গোরা সৈন্য মরিলে নূতন লোক পাওয়া কঠিন। সুতরাং তাঁহারা শিবাজীকে খুব মিষ্ট করিয়া চিঠি লিখিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিলেন। জানুয়ারি মাসে ইংরাজ-রণপোতগুলি খান্দেরীর উপসাগর ছাড়িয়া বম্বেতে ফিরিল।

সিদ্দির সহিত জলযুদ্ধ

কিন্তু সিদ্দি কাসিম খান্দেরীর পাশে আন্দেরী দ্বীপ দখল করিয়া কামান চড়াইয়া দেওয়াল গাঁথিয়া (৯ই জানুয়ারি ১৬৮০) সেখান হইতে খান্দেরীর উপর গোলা দাগিতে লাগিলেন। দৌলত খাঁ নাগোৎনা খাড়ী হইতে নৌকাসহ আসিয়া দুই রাত্রি আন্দেরী-দখলের বৃথা চেষ্টা করিলেন। ২৬এ জানুয়ারি তিনি তিনদিক হইতে আন্দেরী আক্রমণ করিলেন। চারি ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ হইল; অবশেষে মারাঠারা পরাস্ত হইয়া চৌলে ফিরিয়া গেল। তাহাদের চারিখানা ঘুরাব ও চারিখানা ছোট জাহাজ ধ্বংস পাইল, দুইশত সৈন্য মরিল, একশত জখম হইল, আর অনেকে শত্রুহস্তে বন্দী হইল। দৌলত খাঁ নিজে পায়ে বিষম আঘাত পাইলেন। সিদ্দির তরফে একখানিও জাহাজ নষ্ট হইল না, এবং মাত্র চারিজন লোক হত এবং সাতজন আহত হইল।

[17]শিবাজী সুরগড় দুর্গে ইহাদের আবদ্ধ রাখেন। সেখানে ৬ই নবেম্বর বন্দী ছিল—২০জন ইংরাজ ফরাসী ও ডচ, ২৮ জন পোর্তুগীজ অর্থাৎ ফিরিঙ্গি, এবং ৯জন খালাসী।

দ্বাদশ অধ্যায় : কানাড়ায় মারাঠা-প্রভাব

কানাড়া দেশ-বর্ণন

শিবাজী এত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অভিযান ও দেশজয় করেন যে তাহার সবগুলির বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। দক্ষিণ-কোঁকন এবং উত্তর-কানাড়ায় (অর্থাৎ গোয়ার উত্তর ও দক্ষিণের কূলদেশে) তিনি কি করিয়াছিলেন এখানে তাহাই বলা হইবে। বম্বের পশ্চিম-কূলে রত্নগিরি এবং উত্তর-কানাড়া জেলায় কতকগুলি বন্দর ছিল, —যথা রাজাপুর, খারেপটন, বিনগুরলা, মালবন, কারোয়ার, মিরজান, ইত্যাদি। ইহার অনেকগুলিতে ইউরোপীয় বণিকদের কুঠী এবং জাহাজ লাগিবার ঘাট ছিল। মহা উর্ব্বর কানাড়া দেশ হইতে মরিচ, এলাচ, মসলিন্ কাপড, রেসম, গালা (লাক্ষা) প্রভৃতি অনেক মূল্যবান মাল এই সব বন্দরের ভিতর দিয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত, আর ইহাতে এদেশে অগাধ ধন জমিত।

'রুস্তম্-ই-জমান্'-উপাধিধারী এক বিজাপুরী ওম্‌রার অধীনে দক্ষিণ-কোঁকন ও কানাড়া ছিল। শিবাজী কয়েকবার আক্রমণ করিয়া ১৬৬৪ সালের মধ্যে গোয়ার উত্তরে সব দেশ, অর্থাৎ রত্নগিরি ও সাবন্ত-বাড়ী, নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। কিন্তু গোয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বিজাপুরী-রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিতে তাঁহাকে অনেক বাধা পাইতে হইয়াছিল; বহু বিলম্বে তিনি এই কার্য্যে আংশিক মাত্র সফল হন। পশ্চিম-কানাড়ার অধিত্যকায় দুইটি বড় হিন্দু রাজ্য ছিল,—বিদনুর এবং সোন্দা। ১৬৬৩ সালে বিজাপুরী সুলতানের আক্রমণে বিদনুরের রাজা কাবু হইয়া পড়েন এবং ৩৫ লক্ষ টাকা নজর দিতে বাধ্য হন। তাহার পর প্রায়ই বিজাপুরীসৈন্য এই দেশে ঢুকিত, এখন মারাঠারাও সেই পথ ধরিল। রুস্তম্-ই-জমান্ শিবাজীর বংশের দুপুরুষের বন্ধু, তিনি কখনও মারাঠাদের বিরুদ্ধে লাগিয়া পড়িয়া যুদ্ধ করিতেন না, বাহিরে লড়াই-এর ভাব দেখাইয়া সুলতানকে ভুলাইতেন মাত্র। একথা দেশের সকলে, এমন কি ইংরাজ-কুঠীর সাহেবেরাও জানিত।

ঘোরপড়ে-উচ্ছেদ এবং সাবন্ত-বাড়ী অধিকার

১৬৬৪ সালের এপ্রিল মাসে বিজাপুরী ওমরারা আবার বিদনুর আক্রমণ করিল কারণ, সেখানে রাজপরিবার-মধ্যে কলহ ও খুনোখুনি আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সুযোগে শিবাজী ঐ বৎসরের কয়েক মাস যাবৎ এই প্রদেশের ভিতর দিয়া ইচ্ছামত দেশলুঠ ও নগর-অধিকার করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে বহলোল খাঁর সহিত তাঁহার দুইবার যুদ্ধ হয়; প্রথমটায় তাঁহার হার, এবং দ্বিতীয়টায় জিত হয়। এই সময় তিনি মুদ্‌হোল গ্রাম আক্রমণ করিয়া তথাকার জমিদার ঘোরপড়ে বংশ প্রায় নির্ম্মূল করিয়া দেন। মারাঠী প্রবাদ এই যে, যখন (১৬৪৮ সালে) বিজাপুরী উজীর জিঞ্জির নিকট শাহজীকে কয়েদ করেন, তখন বাজী ঘোরপড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শাহজীর পলায়নে বাধা দিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়, এবং সে জন্য শাহজী শিবাজীকে পত্র লেখেন—"যদি তুমি আমার পুত্র হও, তবে এই দুষ্কার্য্যের জন্য ঘোরপড়ের উপর প্রতিহিংসা লইও।" কিন্তু এই গল্প বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ মুদ্‌হোল-জয়ের দশ মাস আগে শাহজীর মৃত্যু হইয়াছিল।

১৬৬৪ ডিসেম্বর মাসে শিবাজী রত্নগিরি জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ, বর্ত্তমান সাবন্ত-বাড়ী জমিদারী, দখল করেন। এখানকার ছোট ছোট দেশাই (জমিদার)-গুলি বিজাপুরের অধীন ছিল; তাহারা শিবাজীর ভয়ে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া প্রথমে জঙ্গলে পরে গোয়াতে আশ্রয় লইল, এবং সেখানে বসিয়া নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার বিফল চেষ্টায় অনেক বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল। তজ্জন্য শিবাজী রাগিয়া পত্র লেখায়, পোর্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি শেষে এইসব দেশাইকে নিজ এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিলেন (মে ১৬৬৮)। ইহার পর কুড়ালের দেশাই লখম্ সাবন্ত (বর্ত্তমান সাবন্ত-বাড়ী-রাজ্যের আদিপুরুষ এবং জাতিতে ভোঁসলে) শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনে জাগীরদার হইয়া নিজ জমিদারী ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে ও নিজের সৈন্য রাখিতে নিষেধ করা হইল।

রুস্তম্-ই-জমান্ গোপনে শিবাজীর সহায়ক হওয়ায়, এমন কি মারাঠাদের সহিত একজোটে নিজ রাজার প্রজাদের নিকট হইতে লুঠকরা সম্পত্তি ভাগাভাগি করায়, ঐ প্রদেশে শিবাজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত কেহই রহিল না, সর্ব্বত্রই ধনী ও বণিকেরা মারাঠাদের ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইল, ঐ দেশের অত বড় ও বিখ্যাত বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। কোন স্থানই তাঁহার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইত না।

বস্‌রুর এবং কারোয়ার লুণ্ঠন

বিদনুরের প্রধান বন্দর বস্‌রুর (ম্যাপের Barcelore); এটা হিন্দুর রাজ্য, ইহার রাজা শিবাজীর নিকট কোন অপরাধ করেন নাই, এবং মহারাষ্ট্রের ত্রিসীমার কাছেও যাইতেন না। কিন্তু বাণিজ্যের ও শিল্পবিক্রয়ের ধনে ঐ অঞ্চলে বস্‌রুর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব শিবাজী ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৬৬৫ সালে, ৮৮খানা জাহাজে সৈন্য চড়াইয়া রত্নগিরি জেলার তীর হইতে রওনা হইয়া হঠাৎ বস্‌রুরে আসিয়া হাজির হইলেন। এখানে যে তাঁহার আগমন হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। মারাঠারা একদিনের অবাধ লুঠেই অগণিত ধনরত্ন পাইল। পরদিন ঐ শহর ছাড়িয়া শিবাজী সমুদ্র তীরে গোকর্ণ নামক ভারতবিখ্যাত তীর্থে নামিয়া তথাকার শিবমন্দিরের সামনে স্নান পূজাদি পুণ্যক্রিয়া সারিলেন। তাহার পর জাহাজগুলিকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে চারি হাজার পদাতিকের সঙ্গে উত্তরদিকে কুচ করিয়া আঙ্কোলা হইয়া কারোয়ার নগরে[18] পৌঁছিলেন।

[18]এই শহর এখন বম্বে প্রদেশের একটি তালুকের সদর। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজ করিতেন, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে এখানে তাঁহার প্রবাসের সুখ-স্মৃতি লিখিয়াছেন।

এই বন্দরে ইংরাজদের একটি বড় কুঠী ছিল। তাহারা ভয়ে শিবাজীর রাজ্যে নানাস্থানে বেতনভোগী চর রাখিয়া তাঁহার গতিবিধি ও অভিসন্ধির পাকা খবর আগে হইতে আনিত। এখন শিবাজীর এদিকে আগমনের সংবাদ পাইবামাত্র তারা কোম্পানীর টাকাকড়ি ও মাল একখানা ছোট ভাড়াটে জাহাজে বোঝাই কবিয়া কুঠী ছাড়িয়া তাহাতে আশ্রয় লইল। সেই রাত্রে বহলোল খাঁর অনুচর শের খাঁ (হাবশী), প্রভুর মাতার মক্কা-যাত্রার জন্য জাহাজ ঠিক করিতে এই বন্দরে উপস্থিত হইলেন, এবং পৌঁছিবার পর প্রথম শুনিলেন যে শিবাজীও সেখানে আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিজ বাসা দুর্গের মত ঘিরিয়া, সঙ্গের পাঁচ শত রক্ষী-সৈন্যকে চারিদিকে দাঁড় করাইয়া, মাল ও টাকা সুরক্ষিত করিয়া, শিবাজীকে সেই রাত্রেই সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি যেন ঐ শহরে না ঢুকেন, কারণ ঢুকিতে চেষ্টা করিলে শের খাঁ যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে তাঁহার সঙ্গে লড়বেন। শের খাঁর সাহস এবং নেতৃত্বের যশ কাহারও অজানা ছিল না। আর বহ্‌লোলও বিজাপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরা। এই সব কারণে শিবাজী শের খাঁকে আক্রমণ করতে সাহসী হইলেন না, এবং কারোয়ার শহরের কোন ক্ষতি না করিয়া কিছু দূরে নদীতীরে শিবির ফেলিলেন।

এখান হইতে পরদিন (২৩ ফেব্রুয়ারি) দূত পাঠাইয়া তিনি শের খাঁকে জানাইলেন, "হয় ইংরাজদের ধরিয়া আমার হাতে দাও, না হয় তুমি শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আমি ওখানে গিয়া ইংরাজদের উপর প্রতিহিংসা লইব, কারণ তাহারা আমার চিরশত্রু।" শের খাঁ কি উত্তর দিবেন ইংরাজদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা জানাইল, "আমাদের কাছে এই জাহাজে বারুদ ও গোলা ভিন্ন আর কোন ধনদৌলৎ নাই। শিবাজী আসিয়া তাহা লইয়া যাইতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে তাহাতে টাকার মত কাজ দিবে।" এই উত্তর শুনিয়া শিবাজী অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "যাইবার আগে ইংরাজদের দেখিয়া লইব।" স্থানীয় বণিকেরা তখন ভয়ে চাঁদা[19] তুলিয়া তাঁহাকে কিছু নজর দিল। তাহা লইয়া শিবাজী ঐদিন চলিয়া গেলেন; যাইবার সময় বলিতে লাগিলেন, "শের খাঁ এবার আমার হোলীর সময়ের শিকার মাটি করিয়াছে।" তাহার পর ভীমগড় (১৪ মার্চ্চ) হইয়া শিবাজী দেশে ফিরিলেন, কারণ এই মাসেই জয়সিংহ তাঁহার আশ্রয় পুরন্দর-দুর্গ আক্রমণ করেন।

এই আক্রমণের সময় বিজাপুরীরা দক্ষিণ-কোঁকনের অনেকটা (অর্থাৎ বিন্‌গুর্‌লা ও কুডাল) শিবাজীর হাত হইতে উদ্ধার করিল। কানাড়ার উপকূলে কারোয়ার প্রভৃতি স্থান দুই পক্ষের দ্বারাই লুঠ হইতে লাগিল।

ফোণ্ডা দুর্গ অধিকার

গোয়ার পূর্ব্ব-সীমানার নিকট বিজাপুর-রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান দুর্গ ফোণ্ডা। ১৬৬৬ সালের প্রথম ভাগে শিবাজী একদল সৈন্য পাঠাইয়া ফোণ্ডা অবরোধ করেন, কিন্তু বিজাপুরীদের আরও সৈন্য আসিয়া শিবাজীর লোকদের তাড়াইয়া দিয়া ঐ দুর্গ বাঁচাইল। তাহারা এই অঞ্চলে আরও চারটি দুর্গ শিবাজীর হাত হইতে উদ্ধার করিল (মার্চ্চ ১৬৬৬)।

তার পর সাত বৎসর ধরিয়া শিবাজীর দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই। ১৬৭৩ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার সৈন্যরা কানাড়ার অধিত্যকায় ঢুকিয়া অনেক নগর ও দুর্গ লুঠিল। তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ

[19]এই চাঁদায় ইংরাজেরা ৯ শত টাকা দিয়াছিল, কারণ কারোয়ার শহরে তাদের সম্পত্তির মূল্য ছিল চল্লিশ হাজার টাকা।

রাও হুবলীর ইংরাজ-কুঠী হইতে চল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানীর মাল ছাড়া কর্ম্মচারীদের নিজ সম্পত্তিও লইয়া গেল। কিন্তু বিজাপুর হইতে মুজফ্‌ফর খাঁ চারি হাজার অশ্বারোহী লইয়া আসিয়া পড়ায় মারাঠারা হুবলী ছাড়িয়া পলাইল; তাড়াতাড়িতে তাহারা রাস্তায় বস্তা বস্তা লুঠের মাল ফেলিয়া দিয়া গেল।

এই বৎসর বিজয়া দশমীর দিন (১০ই অক্টোবর ১৬৭৩) শিবাজী পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া দেশ-জয়ে বাহির হইলেন; সঙ্গে বিশ হাজার বড় বড় থলিয়া লইলেন, তাহাতে লুঠের জিনিষ ভরিয়া আনা হইবে। এই অভিযানে তিনি কানাড়া অবধি অগ্রসর হন, কিন্তু ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বহলোল ও শর্জা খাঁর নিকট পরাস্ত হইয়া দেশে ফিরিলেন।

বিজাপুরের দরবারে ক্রমেই গোলমাল ও নৈতিক অবনতি বাড়িতে লাগিল; তাহাতে দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলির অত্যন্ত দুরবস্থা হইল, সেগুলি রক্ষা করিবার শক্তি বিজাপুরের রহিল না। সেই সুযোগে শিবাজী ১৬৭৫ সালে কানাড়া উপকূল স্থায়িভাবে দখল করিলেন।

নয় হাজার সৈন্য লইয়া ৮ই এপ্রিল শিবাজী ফোণ্ডা দুর্গের অবরোধ শুরু করিয়া দিলেন। দুর্গস্বামী মহম্মদ খাঁ একমাস ধরিয়া মহা বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার সহিত লড়িলেন। শিবাজী দুর্গ-প্রাকারের নীচে চারিটি সুড়ঙ্গ খুঁড়িলেন; কিন্তু মহম্মদ খাঁ তাহার সবগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন। তখন শিবাজী এক মাটির দেওয়াল তুলিয়া দুর্গের বাহিরে চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিলেন; মারাঠা সৈন্য তাহার আড়ালে নিরাপদে থাকিয়া গুলি চালাইতে লাগিল; তিনি পরিখার এক জায়গায় ভরাট করিয়া দুর্গ দেওয়াল অবধি পথ করিলেন। আধ সের ওজনের পাঁচশত সোনার বালা গড়াইয়া বলিলেন, যে-যে সৈন্য দুর্গ-দেওয়ালে চড়িতে পারিবে তাহাদের উহা দেওয়া হইবে। অবশেষে কোন সাহায্য না পাওয়ায় একমাস পরে (৬ই মে) ফোণ্ডার পতন হইল। আশেপাশের মহালগুলি দখল করিতে শিবাজীকে সাহায্য করিবেন—এই শর্ত্তে মহম্মদ খাঁ এবং চার-পাঁচজন প্রধানকে প্রাণদান করা হইল; দুর্গের আর সব লোককে বধ করা হইল। অল্পদিনের মধ্যে দক্ষিণে গঙ্গাবতী নদী পর্য্যন্ত ঐ জেলার সমস্তটা শিবাজীর অধিকারে আসিল।

কিন্তু কানাড়া অধিত্যকায় অনেক যুদ্ধের পরও শিবাজীর অধিকার স্থায়ী হইল না। বিদনুরের রাণী মারাঠা-রাজাকে কর দিতে সম্মত হইলেন। তাহার পর বিদনুর-সোন্দার মধ্যে যুদ্ধ, বিজাপুর ওমরাদের হস্তক্ষেপ, মারাঠা-সৈন্যের লুঠ ইত্যাদিতে দেশটা অশান্তি ও ক্ষতি ভোগ করিতে লাগিল।

পোর্তুগীজদেব সহিত শিবাজীর সম্বন্ধ

শিবাজীর রাজ্যের পশ্চিম সীমানার পাশেই পোর্তুগীজদের ভারতীয় প্রদেশ—উত্তরে দামন জেলা, মধ্যে বম্বে-থানা-বা...ইঁ (Bassein) চৌল, দক্ষিণে গোয়া-বার্দেশ-ষষ্ঠি (Salsette)।[20]

অনেক ছোট ছোট বিষয়ে, প্রধানতঃ পোর্তুগীজদের ভারত-সাগরে একাধিপত্য এবং সর্ব্বোচ্চ প্রভুত্বের দাবি লইয়া, শিবাজীর সহিত গোয়াসরকারের বিবাদ বাধে, কিন্তু তাহা কখনও যুদ্ধ অবধি গড়ায় নাই, কারণ পোর্তুগীজদের সৈন্য ও অর্থবল বড় কম, তাহাদের স্থানীয় দেশী সৈন্য (কানাড়া)

[20] ইহার মধ্যে বম্বে-দ্বীপ ১৬৬৮ সালে ইংলণ্ড-রাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার তেমনি বর্ত্তমান পোর্তুগীজ-ভারতে অনেক স্থান, যথা-ফোণ্ডা, বিচোলী, পেড়ুলে, সাঁকলী,—শিবাজীর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরে পোর্তুগীজদের দখলে আসে।

অত্যন্ত ভীরু, এবং গোরা সৈন্য (প্রকৃতপক্ষে মিশ্রজাতীয় ফিরিঙ্গি)-গুলি আসল ইউরোপীয়দের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। এইজন্য পোর্তুগীজ গভর্ণর নানা উপায়ে ও কথার চালাকিতে শিবাজীকে ভুলাইয়া শান্ত রাখেন। দুইবার (১৬৬৭ এবং ১৬৭০ সালে) তাঁহাদের মধ্যে লিখিত সন্ধি হইয়া উপস্থিত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

চৌথের উৎপত্তি

রামনগরের কোলী-জাতীয় রাজারা ঐ দেশের পশ্চিমে সমুদ্রকূলের অনেক গ্রাম হইতে লুঠ না করার মূল্য-স্বরূপ বার্ষিক টাকা পাইতেন। এই টাকাকে সাধারণ কথায় 'চৌথ' বলা হইত, কিন্তু ইহা সর্ব্বত্রই রাজকরের ঠিক চৌথা, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ ছিল না; কোন গ্রামে খাজানার দশমাংশ, কোন গ্রামে অষ্টমাংশ, কোন গ্রামে ষড়াংশ ইত্যাদি; দুই-এক জায়গায় চতুর্থাংশ। এই রাজাদের "চৌথিয়া-রাজা" বলিয়া ডাকনাম ছিল। পোর্তুগীজ দামন জেলার (অর্থাৎ বম্বের উত্তরে) কতকগুলি গ্রাম তাঁহাদের এই চৌথ দিত। ১৬৭৬ সালে শিবাজী যখন কোলী দেশ স্থায়িভাবে অধিকার করিলেন, তখন কোলী-রাজাদের স্বত্ব-অনুসারে ঐসব গ্রাম হইতে তিনিও চৌথ দাবি করিলেন। গোয়ার গভর্ণর নানা ওজরে সময় কাটাইয়া স্পষ্ট উত্তর দিতে যথাসম্ভব বিলম্ব করিলেন। শেষে শিবাজী যুদ্ধ করিবেন বলিয়া শাসাইলেন, কিন্তু শিবাজীর অকালমৃত্যুতে এই যুদ্ধ পরে তাঁহার পুত্র চালাইয়াছিলেন।

সাতবাড়ীর লখম সাবন্ত এবং অন্যান্য দেশাই, শিবাজীর আক্রমণে নিজ রাজ্য ছাড়িয়া গোয়ায় পলাইয়া গিয়া, সেখান হইতে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব ষড়যন্ত্র করিত, তাহার শাস্তি দিবার জন্য ১৭ই নবেম্বর ১৬৬৭ একদল মারাঠা-সৈন্য গোয়ার অধীন বার্দেশ জেলায় ঢুকিয়া কতকগুলি প্রজা ও গরু ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই বিবাদ দূত পাঠাইয়া বন্ধুভাবে মিটমাট করা হইল; বন্দীরা খালাস পাইল; এবং গভর্ণর দেশাইদের পোর্তুগীজ-সীমানার বাহির করিয়া দিলেন (১৬৬৮)।

গোয়া-অধিকারের বিফল চেষ্টা

গোয়ার পূর্ব্বদিক পাহাড়ে ঘেরা; তাহার মধ্যে দুএকটি সরু উঁচু পথ ভিন্ন যাওয়া যায় না। পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্র ও খাড়ী, প্রবল জাহাজ ও তোপ না থাকিলে সেইদিক দিয়া গোয়া আক্রমণ করা অসম্ভব। ১৬৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শিবাজী এই গোয়া প্রদেশে ঢুকিবার এক ফন্দী করিলেন। তিনি চারি পাঁচশত মারাঠা-সৈন্যকে ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া নানা ছদ্মবেশে ক্রমে ঐ গিরিসঙ্কট দিয়া গোয়া-রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন, এবং শিখাইয়া দিলেন যে যখন এইরূপে হাজার লোক একত্র হইবে, তখন তাহারা একত্রে হঠাৎ উঠিয়া পোর্তুগীজ-রক্ষীদের মারিয়া একটা পাহাড়ের পথ ("ঘাটি") দখল করিবে, এবং সেই পথ দিয়া শিবাজী সদলবলে ঐ রাজ্যে ঢুকিয়া দেশটা জয় করিবেন। কিন্তু হয় কেহ ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করিয়া দিল, অথবা পোর্তুগীজ গভর্ণরের সন্দেহ এমনি জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার এলাকাভুক্ত শহরগুলিতে কড়া খানাতল্লাশ করিয়া ঐ লুকান মারাঠা সৈন্যগুলিকে গেরেফ্‌তার করিলেন এবং মারের চোটে তাহাদের নিকট হইতে সব কথা বাহির করিয়া লইলেন। তাহার পর

শিবাজীর দূতকে ডাকিয়া স্বহস্তে তাহার কানে দুই-তিন ঘুঁষি দিয়া তাহাকে ও বন্দী মারাঠা সৈন্যদের গোয়া-রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন!

ত্রয়োদশ অধ্যায় : শিবাজীর রাজ্য এবং শাসন-প্রণালী

শিবাজীর রাজ্যের বিস্তৃতি এবং বিভাগ

শিবাজী দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অবিরাম পরিশ্রম এবং নিদ্রাহীন চেষ্টার ফলে যে-রাজ্য গঠন করিয়া যান, তাহার বিবরণ এক কথায় দেওয়া অসম্ভব, কারণ নানা স্থানে তাঁহার স্বত্ব নানা প্রকারের এবং তাঁহার প্রভাব বিভিন্ন পরিমাণের ছিল।

প্রথম হইল তাঁহার নিজের দেশ; ইহাকে মারাঠীতে "শিব-স্বরাজ" এবং ফারসীতে "পুরাতন-রাজ্য" (মমালিক-ই-কদিমি) বলা হইত। এখানে তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতা স্থায়ী এবং সকলেই তাহা মানিয়া চলিত। ইহার বিস্তৃতি সুরত শহরের ষাট মাইল দক্ষিণে কোলী দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়ার দক্ষিণে কারোয়ার নগর পর্য্যন্ত; মাঝে শুধু পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগীজদের গোয়া ও দামন প্রদেশ দুইটি বাদ। এই দেশের পূর্ব্বসীমার রেখা বগলানা ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে নাসিক ও পুণা জেলার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া, সাতারা ও কোলাপুর জেলা বেড়িয়া, উত্তর কানাড়ার কূলে গঙ্গাবতী নদীতে গিয়া শেষ হয়। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি পশ্চিম কর্ণাটকে বেলগাঁও-এর পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে কোপল প্রভৃতি জেলা অধিকার করেন; এগুলি তাঁহার স্থায়ী লাভ।

এই শিব-স্বরাজ তিন প্রদেশে বিভক্ত এবং তিনজন সুবাদারের শাসনাধীন ছিল :—

(১) দেশ, অর্থাৎ নিজ মহারাষ্ট্র; পেশোয়ার শাসনে, (২) কোঁকন, অর্থাৎ সহ্যাদ্রির পশ্চিমাঞ্চল; অন্নাজী দত্তোর অধীনে, (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাগ, অর্থাৎ দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমকর্ণাটক; দত্তাজী পন্তের শাসনে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব-কর্ণাটক অর্থাৎ মাদ্রাজে (১৬৭৭-৭৮) দিগ্বিজয়ের ফলে জিঞ্জি বেলুর প্রভৃতি জেলা তাঁহার হাতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার ক্ষমতা তখনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই; তাঁহার সৈন্যেরা যতটুকু জমি দখলে রাখিতে বা যেখানে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত; অন্য সর্ব্বত্র অরাজকতা এবং পুরাতন ছোট ছোট সামন্তদের সংঘর্ষ। মহীশূরে বিজিত স্থান কয়টিরও সেই দশা। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কানাড়া অধিত্যকায়, অর্থাৎ বর্ত্তমান বেলগাঁও ও ধারোয়ার জেলায় এবং সোন্দা ও বিদনুর রাজ্যে, যুদ্ধ চলিতেছিল, সেখানে তাঁহার ক্ষমতা নিঃসন্দেহভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, এই-সব স্থানের বাহিরে নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে তাঁহার সৈন্যেরা প্রতি বৎসর শরৎকালে গিয়া ছয় মাস বসিয়া থাকিয়া চৌথ আদায় করিত। এই কর রাজার প্রাপ্য রাজার রাজস্ব নহে, ইহা ডাকাতদের খুশী রাখিবার উপায় মাত্র। ইহার মারাঠী নাম "খণ্ডনী" (অর্থাৎ এই টাকা লইয়া আমাকে রেহাই দাও, বাবা!") হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু চৌথ আদায় করা সত্ত্বেও মারাঠারা অপর শত্রুর আক্রমণ হইতে সেই দেশ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিত না; তাহারা নিজেরা ঐ দেশ লুটিবে না, এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ দেখাইত।

রাজস্ব ও ধনভাণ্ডার

শিবাজীর সভাসদ্ কৃষ্ণাজী অনন্ত ১৬৯৪ সালে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর রাজস্বের পরিমাণ বৎসরে এক কোটি হোণ এবং চৌথ আশী লক্ষ হোণ ধার্য্য ছিল। হোণ একটি খুব ছোট স্বর্ণমুদ্রা, ইহার দাম প্রথমে চারি টাকা ছিল, পরে পাঁচ টাকা হয়; সুতরাং এই দুই বাবদে শিবাজীর আয় সাত হইতে নয় কোটি টাকার মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদায় হইত অনেক কম, এবং তাও সব বৎসরে সমান নহে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাণ্ডারে যে ধনরত্ন পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ মারাঠা ভাষার সভাসদ-বখরে এবং ফারসী ইতিহাস "তারিখ-ই- শিবাজী"তে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। ইহার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল ছয় লক্ষ মোহর এবং প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ হোণ, ও সাড়ে বারো খণ্ডী ওজনের ভাঙ্গা সোনা; রৌপ্যমুদ্রা ছিল ৫৭ লক্ষ টাকা, এবং ৫০ খণ্ডী ওজনের ভাঙ্গা রূপা; এ ছাড়া হীরা মণিমুক্তা বহু লক্ষ টাকা দামের। [এক খণ্ডী কলিকাতার সাত মণের কিছু কম, ৬৮ মণ।]

অষ্টপ্রধান

১৬৭৪ সালে রাজ্যাভিষেকের সময় শিবাজীর আটজন মন্ত্রী ছিলেন; সেই উপলক্ষে তাঁহাদের পদের উপাধি ফারসী হইতে সংস্কৃতে বদলান হয় :—

(১) মুখ্য প্রধান (ফারসী নাম, পেশোয়া); ইনিই প্রধান মন্ত্রী, রাজার প্রতিনিধি ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ; নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে মতভেদ হইলে ইনি তাহার নিষ্পত্তি করিয়া রাজকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতেন। কিন্তু অপর সাত প্রধান তাঁহার অধীন বা অজ্ঞাবহ ছিল না, সকলেই নিজ নিজ বিভাগে একমাত্র রাজা ভিন্ন আর কাহাকেও প্রভু বলিয়া মানিত না।

(২) অমাত্য (ফারসী, মজমুয়া-দার) অর্থাৎ হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর বা একাউন্ট্যান্ট-জেনারেল); তাঁহার স্বাক্ষর ভিন্ন রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাবের কাগজ গ্রাহ্য হইত না।

(৩) মন্ত্রী (ফারসী, ওয়াকিয়া-নবিশ); ইনি রাজার দৈনিক কার্য্যকলাপ এবং দরবারের ঘটনার বিবরণ লিখিতেন। যাহাতে রাজাকে গোপনে হত্যা বা বিষ খাওয়াইবার কোনরূপ চেষ্টা না হয়, সেজন্য রাজার সঙ্গী, দর্শনপ্রার্থী আগন্তুক ও খাদ্যদ্রব্যের উপর মন্ত্রীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত।

(৪) সচিব (ফারসী, শুরু-নবিস); ইনি সরকারী চিঠিপত্রের ভাষা ঠিক হইল কিনা দেখিয়া দিতেন। যাহাতে জাল রাজপত্রের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য সচিবকে প্রত্যেক ফর্ম্মান ও দানপত্রের প্রথম পংক্তি নিজহস্তে লিখিয়া দিতে হইত।

(৫) সুমন্ত (ফারসী, দবীর) অর্থাৎ পর-রাজ্য-সচিব (ফরেন সেক্রেটারী); ইনি বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা ও বিদায় করিতেন এবং চরের সাহায্যে অন্যান্য রাজ্যের খবর আনাইতেন।

(৬) সেনাপতি (ফারসী, সর-ই-নৌবৎ)

(৭) দানাধ্যক্ষ, অথবা মারাঠী ভাষায় ডাক-নাম "পণ্ডিতরাও" (ফারসী, সদর ও মুহতসিবের পদ মিলাইয়া); ইনি রাজার পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দক্ষিণা ধার্য্য করিয়া দিতেন, ধর্ম ও জাতসম্পর্কীয় বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার করিতেন, পাপাচার ও ধর্মভ্রষ্টতার শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধির হুকুম দিতেন।

(৮) ন্যায়াধীশ (ফারসী, কাজী-উল্-কুজাৎ), অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি (চীফ্ জাষ্টিস); ধর্ম-সম্বন্ধীয় মামলা ছাড়া অপর সব বিবাদের বিচারভার ইঁহার হাতে ছিল।

ইঁহাদের মধ্যে সেনাপতি ছাড়া আর সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলেও (দানাধ্যক্ষ ও ন্যায়াধীশ ভিন্ন) অপর পাঁচজন অনেক সময় সৈন্যদলের নেতা হইয়া যুদ্ধে যাইতেন, এবং ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কোন অংশে কম বীরত্ব বা রণ-চাতুর্য্য দেখাইতেন না। ফর্ম্মান, দানপত্র, সন্ধিপত্র প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় সরকারী কাগজে প্রথমে রাজার মোহর, তাহার পর পেশোয়ার মোহর, এবং সর্ব্বনীচে অমাত্য মন্ত্রী সচিব ও সুমন্ত—এই চারি প্রধানের স্বাক্ষর থাকিত।

বর্ত্তমান যুগে বিলাতে মন্ত্রীসভা (ক্যাবিনেট)ই দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা; তাঁহারা সব বিভাগে নিজ হুকুম চালান, যুদ্ধ সন্ধি রাজস্ব শিক্ষা সর্ব্ববিষয়ে রাজ্যের নীতি স্থির করেন। রাজা তাঁহাদের মত মানিতে বাধ্য, কারণ তাঁহাদের পশ্চাতে দেশের অধিকাংশ লোক আছে এবং রাজা তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কাজ না করিলে তাঁহারা রাগিয়া পদত্যাগ করিবেন, জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিবে, এবং রাজাকে অপদস্থ (হয়ত পদচ্যুত) হইতে হইবে। কিন্তু শিবাজীর উপর মারাঠী অষ্টপ্রধানদের কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাঁহারা রাজার কেরানী (সেক্রেটারি) মাত্র, রাজার হুকুম পালন করিতেন, তাঁদের কোন উপদেশ শুনা না শুনা রাজার ইচ্ছা। প্রধানেরা কোন বিষয়েই রাজনীতি বাঁধিয়া দিতে পারিতেন না, এমন কি তাঁহাদের নীচের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত বিভাগীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজার কাছে আপীল করিতে পারিত। আর এই অষ্ট প্রধানের প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, হিংসাপরবশ,—ইংরাজ ক্যাবিনেটের সদস্যদের মত সুশৃঙ্খল, একজোটে বাঁধা দল ছিল না।

লেখকেরা, এবং অনেক স্থলে হিসাবরক্ষকেরা সকলেই জাতিতে কায়স্থ ছিলেন (চিটনবিস, ফর্দ্দনবিস ইত্যাদি)। সৈন্যদের বেতনের হিসাব লিখিত "সবনিস" উপাধিধারী এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী। ইহাদের পদ সামান্য হলেও প্রভাব ছিল খুব বেশী। শিবাজীর কর্ম্মচারীরা (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সুবাদার, থানাদার প্রভৃতি) অতি নির্লজ্জভাবে পীড়ন করিয়া ঘুষ লইত এবং রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া টাকা জমাইত।

শিবাজীর সৈন্য-সংখ্যা

ইংরাজ-যুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই রকম অশ্বারোহী সৈন্য ভর্ত্তি করা হইত; যাহারা সম্পূর্ণভাবে রাজার চাকর এবং রাজসরকার হইতে অস্ত্র বর্ম্ম ও অশ্ব পাইত তাহাদের নাম "পাগা"; আর যে-সব ভাড়াটে অশ্বারোহী নিজেই অস্ত্র বর্ম্ম ও ঘোড়া কিনিয়া, ডাক পড়িলে নানা রাজ্যে

বেতনের লোভে কাজ করিত, তাহারা “সিলাদার”। পাগা সৈন্যদের ফারসী ভাষায় “বার্-গীর” (= ভারবাহী) বলা হইত, ইহা হইতে আমাদের “বর্গী” শব্দের উৎপত্তি। যে বৎসর বা যে অভিযানে যত লোক আবশ্যক হইত, সেই অনুসারে রাজা কম বেশী সিলাদার ভাড়া করিতেন।

রাজস্থাপনের গোড়ার দিকে শিবাজীর অধীনে এক হাজার (অথবা বারো শত) পাগা এবং দুই হাজার সিলাদার অশ্বারোহী ছিল। তাহার পর রাজ্যবিস্তার ও দূর দূর দেশ আক্রমণের ফলে তাঁহার সৈন্যদল ক্রমশঃ বাড়িয়া জীবনের শেষ বৎসরে দাঁড়াইয়াছিল—৪৫ হাজার পাগা (২৯ জন সেনানীর অধীনে ২৯ দলে বিভক্ত) এবং ৬০ হাজার সিলাদার (৩১ জন সেনানীর অধীনে); আর এক লক্ষ মাব্‌লে পদাতিক (৩৬ জন সেনানীর অধীনে)।

এই পদাতিকগুলি বর্ত্তমান সভ্যজগতের সৈন্যদের মত বারো মাস কুচকাওয়াজ করিত না বা রাজার কাজে সৈন্য-আবাসে আবদ্ধ থাকিত না; তাহারা চাষের সময় নিজ গ্রামে গিয়া জমি চাষ করিত, আর বিজয়া দশমীর দিন বিদেশ আক্রমণ করিবার জন্য, অথবা যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিলে তাহার আগেই, আবার সৈন্য-নিবাসে আসিয়া জুটিত; তখন তাহাদের অস্ত্র বর্ম্মে সজ্জিত ও দলবদ্ধ করিয়া নেতার অধীনে রাখিয়া সৈন্যদল গঠন করা হইত। দুর্গরক্ষী পদাতিকেরা ইহাদের হইতে পৃথক; তাহারা দুর্গের নীচে চাষ করিবার জন্য জমি পাইত, এবং পরিবারদিগকে দুর্গে (কখন-বা ঐ নীচের গ্রামে) রাখিত। ইহারা বারোমেসে চাকর; ঘর ছাড়িয়া দূরে যাইতে হইত না।

শিবাজীর নিজের ১২৬০ (অন্য মতে তিন শত) হাতী, তিন হাজার উট, এবং ৩৭ হাজার ঘোড়া ছিল।

সৈন্য-বিভাগের শৃঙ্খলা

রাজার নিজ অশ্বারোহী (অর্থাৎ পাগা)-র দল এইরূপে গঠিত হইত। ২৫ জন সাধারণ সৈন্যের (বার্‌গীর-এর) উপর এক হাবলাদার (যেমন সার্জ্জেণ্ট), পাঁচ হাবলাদার (অর্থাৎ ১২৫ জন সাধারণ সওয়ার)-এর উপর এক জুমলাদার (যেমন কাপ্টেন), এবং দশ জুমলাদার (অর্থাৎ, ১২৫০ জন সওয়ার)-এর উপর এক হাজারী (অর্থাৎ কর্ণেল)। তাহার উপর পাঁচ হাজারী (ব্রিগেডিয়ার জেনারাল) এবং সর্ব্বোচ্চ সর্-ই-নৌবৎ (কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্)। প্রতি ২৫ জন অশ্বারোহীর জন্য একজন ভিস্তি ও একজন নালবন্দ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পদাতিক বিভাগে নয়জন সিপাহী বা 'পাইক'-এর উপর এক নায়ক (কর্পোরাল), পাঁচ নায়কের (অর্থাৎ ৪৫ পাইকের) উপর এক হাবলাদার, দুই (বা তিন) হাবলাদারের উপর এক জুম্‌লাদার, দশ জুম্‌লাদার (অর্থাৎ ৯০০-১৩৫০ পাইক)-এর উপর এক হাজারী।

রাজার শরীর-রক্ষী (গার্ড ব্রিগেড) ছিল দুই হাজার বাছা বাছা মাব্‌লে পদাতিক, খুব জমকাল পোষাক ও ভাল ভাল অস্ত্রে সজ্জিত।

প্রত্যেক সৈন্যদল (রেজিমেণ্ট)-এর সঙ্গে হিসাব-পরীক্ষক (মজমুয়াদার), সরকার (কারভারি), আয়-লেখক (জমা-নবিস) এক একজন করিয়া থাকিত।

পাগা জুম্‌লাদারের বার্ষিক বেতন ৫০০ হোণ

পাগা মজমুয়াদারের বার্ষিক বেতন ১০০ হইতে ১২৫ হোণ

পাগা ৮ হাজারীর বার্ষিক বেতন ১,০০০ হোণ

পাগা জমানবিস প্রভৃতি তিনজনের একুন বার্ষিক বেতন ৫০০ হোণ

পাগা পাঁচ-হাজারীর বার্ষিক বেতন ২,০০০ হোণ

পদাতিক জুমলাদারের বার্ষিক বেতন ১০০ হোণ

পদাতিক জুম্‌লাদারের সবনবিসের বার্ষিক বেতন ৪০ হোণ

পদাতিক হাজারীর বার্ষিক বেতন ৫০০ হোণ

পদাতিক হাজারীর সবনবিসের বার্ষিক বেতন ১০০ হইতে ১২৫ হোণ

শিবাজীর রণ-নীতি

তাঁহার সৈন্যগণ বর্ষাকালে নিজ দেশে ছাউনিতে যাইত; সেখানে শস্য, ঘোড়ার আস্তাবলের ব্যবস্থা থাকিত। বিজয়া দশমীর দিন সৈন্যগণ ছাউনি হইতে কুচ করিয়া বাহির হইত, আর সেই সময় সৈন্যদলের ছোটবড় সব লোকের সম্পত্তির তালিকা লিখিয়া রাখা হইত, তাহার পর দেশ লুঠিতে যাইত। আট মাস ধরিয়া লস্কর পরের মুলুকে পেট ভরাইত, চৌথ আদায় করিত। স্ত্রী, দাসী, নাচের বাঈজী সৈন্যদলের সঙ্গে যাইতে পারিত না। যে সিপাহী এই নিয়ম ভঙ্গ করিত তাহার মাথা কাটার হুকুম ছিল। "শত্রুর দেশে স্ত্রীলোক বা শিশুকে ধরিবে না, শুধু পুরুষ মানুষ পাইলে বন্দী করিবে। গরু ধরিবে না, ভার বহিবার জন্য বলদ লইতে পার। ব্রাহ্মণদের উপর উপদ্রব করিবে না, চৌথ দিবার জামিন-স্বরূপ কোনও ব্রাহ্মণকে লইবে না। কেহ কু-কর্ম্ম করিবে না। আট মাস বিদেশে সওয়ারী করিবার পর বৈশাখ মাসে ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে। তখন, নিজ দেশের সীমানায় পৌঁছিলে সমস্ত সৈন্যের জিনিষপত্র খুঁজিয়া দেখা হইবে, পূর্ব্বের তালিকার সঙ্গে মিলাইয়া যাহা অতিরিক্ত পাওয়া যায় তাহার দাম উহাদের প্রাপ্য বেতন হইতে বাদ দেওয়া যাইবে। বহুমূল্য জিনিষ থাকিলে তাহা রাজসরকারে জমা দিতে হইবে। যদি কোন সিপাহী ধনরত্ন লুকাইয়া রাখে এবং তাহার সর্দ্দার টের পায়, তবে তাহাকে শাসন করিতে হইবে।

"সৈন্যদল ছাউনিতে পৌঁছিলে, হিসাব করিয়া লুঠের সোনা রূপা রত্ন ও বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া সব সর্দ্দারেরা রাজার দর্শনার্থ যাইবে। সেখানে হিসাব বুঝাইয়া দিয়া, মালপত্র রাজভাণ্ডারে রাখিয়া, সৈন্যদের বেতনের হিসাব যাহা প্রাপ্য তাহা রাজকোষ হইতে লইবে। যদি নগদ টাকার বদলে কোন দ্রব্য লইতে ইচ্ছা হয় তাহা হুজুরের কাছে চাহিয়া লইবে। গত অভিযানে যে যেমন কাজ ও কষ্ট সহ্য কবিয়াছে তদনুসারে তাহার পুরস্কার হইবে। কেহ নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া থাকিলে, তাহার প্রকাশ্য অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর চারি মাস (অর্থাৎ আবার দশহরা পর্য্যন্ত) ছাউনিতে থাকিবে।" [সভাসদ-বখর]।

দুর্গের বন্দোবস্ত

প্রত্যেক দুর্গ ও থানা তিন শ্রেণীর কর্ম্মচারীর হাতে রাখা ছিল; তাহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগে প্রধান, প্রত্যেকেই অপর দুইজনের উপর সহিংস সতর্ক দৃষ্টি রাখিত; অতএব তাহাদের পক্ষে একজোটে প্রভুর দুর্গ ধন নাশের ষড়যন্ত্র করা সম্ভব ছিল না। এই তিনজন (১) হাবলাদার, (২) সর-ই-নৌবৎ, (৩) সবনিস্। ইহাদের প্রথম দুইটি জাতে মারাঠা, তৃতীয়টি ব্রাহ্মণ, সুতরাং জাতিভেদের ঝগড়াতে ঐ তিনজনের দল বাঁধার ভয় দূর হইল। দুর্গের রসদ মাল প্রভৃতি একজন কায়স্থ লেখক (কারখানা-নবিস)-এর জিম্মায় থাকিত। বড় বড় দুর্গগুলির দেওয়াল চার-পাঁচ এলাকায় ভাগ করা ছিল, প্রত্যেক এলাকা একজন রক্ষীর (তট্-সর-ই-নৌবৎ-এর) হাতে। দুর্গের বাহিরে পার্‌ওয়াবি ও রামুশী (বংশগত চোর)—এই দুই জাতেব লোক চৌকী দিত।

দুর্গের হাবলাদার নীচের আমলাদের নিয়োগ বরখাস্ত করিতে পারিত, সরকারী চিঠিপত্র তাহার নামে আসিত, এবং সরকারের জন্য লিখিত চিঠিপত্রে নিজের মোহর দিয়া পাঠাইত। তাহার কর্ত্তব্য ছিল প্রত্যহ সন্ধ্যায় দুর্গদ্বার চাবি বন্ধ করা এবং প্রাতঃকালে তাহা খোলা। এই ফটকের চাবিগুলি সে সর্ব্বদা সঙ্গে বাখিত, রাত্রে পর্য্যন্ত বালিসের নীচে গুঁজিয়া ঘুমাইত। সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘুরিয়া দুর্গের ভিতরে ও বাহিরে সব ঠিক আছে কিনা দেখিত, আর অসময়ে খবর না দিয়া হঠাৎ গিয়া পাহারাদারেরা ঘুমাইতেছে কি সতর্ক আছে তাহার খোঁজ লইত। সর-ই-নৌবৎ রাত্রের চৌকীদারদের কাজ দেখিত।

ভূমির কর ও প্রজাশাসন-প্রণালী

"দেশের সমস্ত জমি জরিপ করিয়া ক্ষেত্র ভাগ করিবে। আটাশ আঙ্গুলে একহাত, পাঁচ হাত ও পাঁচ মুঠিতে এক কাঠি, বিশ কাঠি লম্বা ও বিশ কাঠি প্রস্থে এক বিঘা, ১২০ বিঘায় এক চাবর। এইরূপে প্রত্যেক গ্রামে জমির কালি মাপ করা হইবে। প্রতি বিঘার ফসল নির্ধারণ করিয়া তাহার দুইভাগ রাজা লইবেন, আর তিন ভাগ প্রজা পাইবে।

"নূতন প্রজা বসতি করাইয়া তাহাদের খাইবার বাবদে এবং গাইবলদ ও বীজশস্য কেনার জন্য টাকা অগ্রিম দিবে, এবং তাহা দুই-চার বৎসরে পরিশোধ করিয়া লইবে। রায়তদের নিকট হইতে ফসল কাটার সময় ফসলের আকারে রাজকর লইবে।

"প্রজাগণ জমিদার দেশমুখ ও দেশাইদের আজ্ঞাধীন থাকিবে না; উহারা প্রজাদের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। অন্যান্য রাজ্যে এই-সব পুরুষানুক্রমিক ভূস্বামী (মিরাসদার)-রা ধন ক্ষমতা ও সৈন্যবলে বাড়িয়া প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল; অসহায় প্রজারা সব তাহাদের হাতে; তাহারা দেশের রাজাকে অগ্রাহ্য করিত এবং প্রজার দেওয়া রাজকর নিজে খাইয়া রাজসরকারে অতি কম টাকা জমা দিত। শিবাজী এই শ্রেণীর জমিদারের দর্প চূর্ণ করিলেন। মিরাস্‌দারদের গড় ভাঙ্গিয়া দিয়া, কেন্দ্রস্থানগুলিতে নিজ সৈন্যের থানা বসাইয়া, জমিদারদের হাত হইতে সব ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া, তাহাদের প্রাপ্য আয় নির্দ্দিষ্ট হারে বাঁধিয়া দিয়া, প্রজাপীড়নের ও রাজস্ব-লুণ্ঠনের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। জমিদারদের গড়-নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইল। প্রত্যেক গ্রাম্য-কর্ম্মচারী নিজ ন্যায্য পারিশ্রমিক (অর্থাৎ শস্যের অংশ) ভিন্ন আর কিছু পাইবে না।" [সভাসদ]

তেমনি জাগীরদারগণও নিজ নিজ জাগীরের মহালে শুধু খাজনা আদায় করিবেন, প্রজাদের উপর ভূস্বামী বা শাসনকর্ত্তার মত কোন প্রকার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কোন সৈন্য আমলা বা রায়তকে জমির উপর স্থায়ী সত্ত্ব (মোকাসা) দেওয়া হইত না, কারণ তাহা হইলে তাহারা স্বাধীন হইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিত এবং দেশে রাজার ক্ষমতা লোপ পাইত।

কমবেশী এক লাখ হোণ আদায়ের মহালের উপর একজন সুবাদার (বার্ষিক বেতন চারিশত হোণ) ও একজন মজ্‌মুয়াদার (বেতন ১০০ হইতে ১২৫ হোণ) রাখা হইত; পালকী খরচ বাবদ সুবাদারকে আরও চারি শত হোণ দেওয়া হইত। এই সমস্ত সুবাদার জাতে ব্রাহ্মণ, এবং পেশোয়ার তত্ত্বাবধানে থাকিত। [সভাসদ]

ধর্ম্ম-বিভাগ

রাজ্যমধ্যে যেখানে দেব ও দেবস্থান ছিল, শিবাজী তাহাতে প্রদীপ নৈবেদ্য নিত্যস্নান প্রভৃতির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিতেন। মুসলমান পীরের আস্তানা ও মসজিদে প্রদীপ ও শিরণী সেই সেই স্থানের নিয়ম অনুসারে রাখিবার জন্য অর্থ সাহায্য দিতেন। বাবা ইয়াকুৎ নামক পীরকে ভক্তি করিয়া নিজ খরচে কেল্‌শী-নামক শহরে বসাইয়া জমি দান করিলেন। "বেদক্রিয়া-দক্ষ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যোগক্ষেম ব্রাহ্মণ, বিদ্যাবন্ত, বেদশাস্ত্র-সম্পন্ন জ্যোতিষী, অনুষ্ঠানী, তপস্বী, সৎপুরুষ গ্রামে গ্রামে বাছিয়া তাহাদের পরিবারের সংখ্যা অনুসারে যে পরিমাণ অন্নবস্ত্র লাগে সেই আয়ের মহাল ঐ গ্রামে গ্রামে দিলেন। প্রতি বৎসর সরকারী আমলারা এই সাহায্য তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিত।" [সভাসদ]

"লুপ্ত বেদচর্চ্চা শিবাজীর অনুগ্রহে আবার জাগিয়া উঠিল। যে ব্রাহ্মণ ছাত্র এক বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে তাহাকে প্রতি বৎসর এক মণ চাউল, যে দুই বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে তাহাকে দুই মণ, ইত্যাদি পরিমাণে দান করা হইত। প্রত্যেক বৎসর তাঁহার পণ্ডিত রাও শ্রাবণ মাসে ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বৃত্তি কমবেশী করিয়া দিতেন। বিদেশী পণ্ডিতদের সামগ্রী এবং মারাঠা দেশের পণ্ডিতদের খাদ্য দক্ষিণা-স্বরূপ দেওয়া হইত। মহাপণ্ডিতদের ডাকিয়া সভা করিয়া নগদ টাকা বিদায় দেওয়া হইত।" [চিটনিস-বখর]

রামদাস স্বামী

শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী (জন্ম ১৬০৮ মৃত্যু ১৬৮১, খৃঃ) মহারাষ্ট্র দেশের অতি বিখ্যাত এবং সর্ব্বজনপূজ্য সাধু-পুরুষ। তাঁহার ভক্তিশিক্ষার বাণী অতি সরল সুন্দর ও পবিত্র। ১৬৭৩ সালে সাতারা-দুর্গ জয় করিবার পর শিবাজী গুরুকে উহার চারি মাইল দক্ষিণে পারলী (অথবা সজ্জনগড়)-এ আশ্রম বানাইয়া দেন। এখনও লোকে বলে যে সাতারার ফটকের উপর চূড়ায় একখানা পাথরের ফলকে বসিয়া শিবাজী পারলী-স্থিত গুরুর সঙ্গে দৈববলে কথাবার্ত্তা কহিতেন। রামদাস আর আর সন্ন্যাসীর মত প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে যাইতেন। শিবাজী ভাবিলেন, "গুরুকে এত ধন ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছি, তবুও তিনি ভিক্ষা করেন কেন? তাঁহার কিসে সাধ পূরিবে?" তাহার পরদিন একখানা কাগজে রামদাসের নামে সমস্ত মহারাষ্ট্র রাজ্য ও রাজকোষ দিলাম বলিয়া দানপত্র লিখিয়া তাহাতে নিজ মোহর ছাপিয়া ভিক্ষার পথে গুরুকে ধরিয়া তাঁহার পায়ের উপর রাখিলেন। রামদাস পড়িয়া মৃদু

হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, এসব গ্রহণ করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার গোমস্তা মাত্র হইলে। এই রাজ্য তোমার নিজের ভোগসুখের বা স্বেচ্ছাচার কবিবার দ্রব্য নহে; তোমার মাথার উপরে এক বড় প্রভু আছেন তাঁহার জমিদার তুমি তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া চালাইতেছ—এই দায়িত্ব জ্ঞানে ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন করিবে।"

রাজ্যের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যখন এক সন্ন্যাসী, তখন সেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বস্ত্র শিবাজীর রাজপতাকা হইল—ইহার নাম "ভাগবে ঝাণ্ডা।"

"সমর্থ" বামদাস স্বামীর জীবন ও শিক্ষা

১৬০৮ সালে চৈত্র মাসে শুক্লা নবমীতে সূর্য্য-উপাসক একটি ব্রাহ্মণবংশে রামদাসের জন্ম, তাঁহার পিতার দেওয়া নাম 'নারায়ণ'। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মন্ত্র-গ্রহণের সময় তিনিও মন্ত্র লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। বারো বৎসর বয়সে এই পিতৃহীন বালক মাতার ব্যাকুল অনুরোধে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু মন্ত্র পড়িবার সময় বিবাহ-সভা হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন, এবং সংসার ত্যাগ করিলেন। তাহার পর নাসিক নগরের নিকট গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে আশ্রয় লইয়া বারো বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিবার পর "রামদাস" নামে দীক্ষা লইলেন। মহারাষ্ট্রে লোকের বিশ্বাস যে তিনি পূর্বজন্মে হনুমান ছিলেন, তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু তাহারই নিদর্শন। তুকারাম ও অন্যান্য সাধুগণ বিষ্ণুর অপর অবতার 'বিটোবা'র পূজা প্রচার করিতেন, কিন্তু রামদাস হনুমানের মত শ্রীরামচন্দ্রের চরম সেবক ছিলেন এবং সেই অবতারকে নিজ ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা করেন।

দীক্ষার পর বারো বৎসর ধরিয়া রামদাস অন্যান্য সাধুদের মত ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন। প্রবাদ আছে যে স্বয়ং রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলেন, "সংসারে প্রবেশ কর, এবং এক নূতন ভক্ত সম্প্রদায় গঠন কর।" তীর্থদর্শন শেষ করিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে (১৬৪৪) রামদাস জন্মভূমিতে ফিরিলেন। এবং সাতারা জেলার চাফল গ্রামে বসতি করিয়া সেখানে রাম ও হনুমানের দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৬৪৮)। অসাধারণ দক্ষতার সহিত তিনি অল্পদিনের মধ্যেই "রামদাসী" নামে এক নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন, তাঁহার অনেক শিষ্য হইল, তাহাদের জন্য মঠ স্থাপিত হইল। এইরূপে দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

তাহার পর আরও দশ বৎসর ধরিয়া তিনি রায়গড়-দুর্গের নিকট শিবতর-গ্রামে নির্জ্জনবাস ও চিন্তার ফলে "দাস-বোধ" নামক পদ্যগ্রন্থ (২০ সর্গে) রচনা করিয়া তাহাতে নিজের ধর্ম্ম-উপদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। সংস্কৃত ও প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, এজন্য গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে।

রামদাসের পুণ্য-প্রভাবে মোহিত হইয়া শিবাজী "শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম" এই মন্ত্রে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলেন। গুরু তাঁহাকে সংক্ষেপে অতি মহান উপদেশ দিলেন। কিন্তু যখন শিবাজী ভক্তির আবেগে বলিলেন, "আমি আপনার চরণে থাকিয়া সেবা করিব" তখন রামদাস তাঁহাকে ধমকাইয়া নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "ইহার জন্যই কি তুমি আমার কাছে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছ? তুমি ক্ষত্রিয়, কর্ম্মবীর,—তোমার কর্ত্তব্য দেশ ও প্রজাদের বিপদ হইতে রক্ষা করা, দেবব্রাহ্মণের সেবা করা। তোমার করিবার অনেক কাজ রহিয়াছে। ম্লেচ্ছগণ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে;

তোমার কর্ত্তব্য তাহাদের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করা। ইহাই রামচন্দ্রের অভিপ্রায়। ভগবদ্-গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ স্মরণ কর—যোদ্ধার কর্ত্তব্যের পথে চল, কর্ম্মযোগ সাধনা কর।"

১৬৭৩ সালে পারলি-দুর্গ অধিকার করিবার পর শিবাজী সেখানে রামদাস স্বামীকে আনিয়া বসাইলেন, তাঁহার জন্য মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, দুর্গের নূতন নাম রাখিলেন সজ্জনগড়, অর্থাৎ "সাধুর গড়"; সন্ন্যাসী ও ভক্তদের ভরণ-পোষণের জন্য নিকটের গ্রামে দেবোত্তর জমি দিলেন।

কর্ম্মযোগের আদর্শ

রামদাস শিবাজীকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী বলিয়া সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতেন, তাঁহাকে সকলের সম্মুখে রাজার আদর্শ বলিয়া ধরিতেন। রামদাস কর্ত্তৃক পদ্যে রচিত শিবাজীর নামে এক পত্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে গুরু রাজাকে সম্বোধন করিতেছেন—"হে নিশ্চয়ের মহামেরু! বহুলোকের সহায়, অটলপ্রতিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়জয়ী, দানবীর, অতুল গুণসম্পন্ন, নরপতি, অশ্বপতি, গজপতি, সমুদ্র ও ক্ষিতির অধীশ্বর, সদা প্রবল বিজয়ী, বিখ্যাত ধার্ম্মিক বীর! ...পৃথিবী তোলপাড় হইয়াছে; ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। গো-ব্রাহ্মণ, দেব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য নারায়ণ তোমাকে পাঠাইয়াছেন। ...ধর্মসংস্থাপনের জন্য নিজ কীর্ত্তি অমর রাখিও।"

শিবাজী শেষ-বয়সে রাজকার্য্যে সর্ব্বদা স্বামীর উপদেশ লইতেন। রামদাসের শিক্ষায় ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত এবং জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় শিবাজীর প্রতি উপদেশ মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতার সাধনাকে সিদ্ধির সহজ পথে আনিয়া দেয়। রামদাসের ধর্ম্মশিক্ষাকে "ফলিত ভগবদ্দীতা" বলা যাইতে পারে; তাঁহার শিষ্য গীতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন।

রামদাসের বাজনৈতিক উপদেশ

শিবাজীর পর যুবক শম্ভুজী যখন রাজা হইলেন, তখন বৃদ্ধ রামদাস মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া নূতন রাজাকে অনেক উপদেশ দিয়া পদ্যে এক পত্র লেখেন। তাহাতে আছে—

বহু লোককে একত্র করিবে,

বিচার করিয়া লোক নিযুক্ত করিবে,

শ্রম করিয়া আক্রমণ করিবে

ম্লেচ্ছের উপর। ১৪

যাহা আছে তাহার যত্ন করিবে,

পরে আরও [রাজ্য] যোগ করিবে,

মহারাষ্ট্র-রাজ্য [বিস্তার] করিবে

যত্রতত্র। ১৫

লোকদের সাহস দিবে,

বাজি রাখিয়া তরবারি চালাইবে,

‘চড়িয়া বাড়িয়া’ [ক্রমে অধিকতর] খ্যাতি

লাভ করিবে। ১৬

শিব রাজাকে স্মণ রাখিও,

জীবনকে তৃণ সমান মনে করিও,

ইহলোকে পরলোকে তরিবে

কীর্ত্তিরূপে। ১৭

শিব রাজার রূপ স্মরণ কর,

শিব রাজার দৃঢ় সাধনা স্মরণ কর,

শিব রাজার কীর্ত্তি স্মরণ কর

ভূমণ্ডলে। ১৮

শিব রাজার বোলচাল কেমন,

শিব রাজার চলন কেমন,

শিব রাজার বন্ধু করিবার ক্ষমতা কেমন,

সেইমত। ১৯

সকল সুখ ত্যাগ করিয়া,

যোগ সাধিয়া,

রাজ্য-সাধনায় কেমন তিনি

দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ২০

তুমি তাহারও অধিক করিও;

তবে ত তোমাকে পুরুষ বলিয়া জানা যাইবে

। ২১

শিবাজী-পরিবার

শিবাজীর আট বিবাহ—

১। সই বাঈ (নিম্বলকরের কন্যা); মৃত্যু ৫ সেপ্টেম্বর ১৬৬৯ তাঁহার পুত্র শম্ভুজী।

২। সয়িরা বাঈ (শির্কের কন্যা); শিবাজীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন এই অপবাদ দিয়া শম্ভুজী তাঁহার প্রাণবধ করেন। তাঁহার পুত্র রাজারাম।

৩। পুতলা বাঈ (মোহিতের কন্যা); স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

৪। সাকোয়ার বাঈ (গাইকোয়াড়ের কন্যা); বিবাহ ১৬৫৬ সালে। ১৬৮৯ সালে মুঘলেরা রায়গড় অধিকার করিবার পর বন্দী হইয়া ইঁহাকে অনেক বৎসর আওরংজীবেব শিবিরে থাকিতে হয়।

৫। কাশী বাঈ। মৃত্যু ১৬৭৪ মার্চ্চ মাসে।

৬। ও ৭। দুইজন স্ত্রী, ১৬৭৪ সালের মে মাসে শিবাজীর অভিষেকের পূর্ব্বে বৈদিক মন্ত্রসহ ইঁহাদের বিবাহ হয়।

৮। একজন স্ত্রী, ৮ই জুন ১৬৭৪ সালে বিবাহ হয়।

শিবাজীর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিল, যথা

১। শম্ভুজী, জন্ম ১৪ই মে ১৬৫৭, সিংহাসনলাভ ২৮ জুন ১৬৮০ আওরংজীব কর্ত্তৃক প্রাণবধ ১১ মার্চ ১৬৮৯।

২। রাজারাম, জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৬৭০, সিংহাসন-অধিরোহণ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৬৮৯, মৃত্যু ২ মার্চ্চ ১৭০০।

৩। সখু বাঈ, মহাদজী নিম্বলকবের স্ত্রী।

৪। অম্বিকা বাঈ, হবজী মহাডিকের স্ত্রী।

৫। রাজকুমারী বাঈ, গণোজীরাজ শির্কের স্ত্রী।

শিবাজীর আকৃতি ও ছবি

শিবাজীর বয়স যখন ৩৭ বৎসর তখন (অর্থাৎ ১৬৬৪ সালে) সুরতের জনকতক ইংরাজ তাঁহাকে দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা লিখিয়াছেন—"তাঁহার দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি রকমের, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বেশ পরিমাণ-সই। তাঁহার চলন-ফেরন সতেজ জীবন্ত; মুখে মৃদুহাসি লাগিয়াই আছে; চক্ষুদুটি তীক্ষ উজ্জ্বল, সবদিকে ঘুবিতেছে। তাঁহার বর্ণ সাধারণ দক্ষিণীদের অপেক্ষা গৌর।" ফরাসী-পর্য্যটক তেভেনো ইহার দুই বৎসর পরে লেখেন,—"এই রাজার আকার ছোট, বর্ণ ফরসা, চক্ষুদুটি প্রচুর তেজঃপূর্ণ এবং চঞ্চল।"

শিবাজীর তিনখানি বিশ্বাসযোগ্য ছবি আছে; এগুলি যে তাঁহার সময়ে আঁকা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত প্রতিকৃতি। ইহা একজন ডচ্ ভদ্রলোক আওরংজীবের জীবদ্দশায় (অর্থাৎ ১৭০৭ এর পূর্ব্বে) ভারতবর্ষে ক্রয় করেন।

(২) হল্যাণ্ডে রক্ষিত প্রতিকৃতি। ১৭৭২ সালে ডচ্-দূত বাদশাহর নিকট লাহোরে যাইবার সময় ইহা ক্রয় করেন। ১৭২৪ সালে ভ্যালেন্টিন ইহার এক এনগ্রেভিং তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করেন। এই ছবির একটি অতি সুন্দর (এবং কতক পরিবর্ত্তিত) ষ্টীল এনগ্রেভিং অর্ম্ম তাঁহার *Historical Fragments* গ্রন্থে ১৭৮২ সালে ছাপেন, এবং তাহাই নানাস্থলে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ভারতে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে।

(৩) কুমার মুয়জ্জমের চিত্রকর মীর মহম্মদ অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজীর যে চিত্র আঁকিয়া ১৬৮৬ সালে মানুশীকে উপহার দেয়,তাহা এখন প্যারিসের রাষ্ট্রীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার সুন্দর প্রতিলিপি আভিন-সম্পাদিত *Storia do Mogor* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আছে, এবং দুখানা খারাপ অনুকরণ (বোধ হয় উড-কাট) ১৮২১ এবং ১৮৪৫ সালে দুইখানি ফরাসী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। কিন্তু দক্ষতার অভাবে এই চিত্রকর শিবাজীর মুখে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই।

বম্বের মিউজিয়মে এবং পুণার ইতিহাস-মণ্ডলের হস্তে শিবাজীর দুইখানা ছবি আছে; প্রথমটিতে শিবাজী অসিহস্তে দণ্ডায়মান, দ্বিতীয়টিতে তিনি অশ্বারোহণ তরবারি দিয়া সিংহ-শিকারে নিযুক্ত (মিনিএচার)। এগুলি মুঘল-যুগের হইলেও আঁকিবার কাল ঠিক নির্ণয় করা যায় না।

সব ছবিগুলিতেই শিবাজীর মুখ একই গঠনের, কিন্তু প্রথম দুইখানি ছবিতে তাঁহার তেজপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ঠিক প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় : ইতিহাসে শিবাজীর স্থান

শিবাজী ও আওরংজীব

শিবাজীর কীর্ত্তির আলোকে ভারতবর্ষের গগন উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভাবতে চক্রবর্ত্তী সম্রাট শাহানশাহ আওরংজীব অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল সৈন্যবলের অধিকারী হইয়াও বিজাপুর-রাজ্যের জাগীরদারের এই ত্যাজ্যপুত্রকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। মাঝে মাঝে যখন তাঁহার প্রকাশ্য দরবারে দাক্ষিণাত্যের সংবাদ পড়িয়া শুনান হইত—আজ শিবাজী অমুক জায়গা লুঠ করিয়াছেন, কাল অমুক ফৌজদারকে হারাইয়াছেন, তখন আওরংজীব শুনিয়া নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। উদ্বিগ্নচিত্তে মন্ত্রণাগারে গিয়া তিনি বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করিতেন, শিবাজীকে দমন করিবার জন্য আর কোন্ সেনাপতিকে পাঠান যায়, প্রায় সব মহারথীইত দক্ষিণ হইতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়াছেন? এই আলোচনায় এক রাত্রে মহাবৎ খাঁ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন,"হুজুর! সেনাপতির দরকার কি? কাজী সাহেবের এক ফতোয়া পাঠাইলেই শিবা ধ্বংস হইবে!" কাজী আবদুল ওহাবের কথায় ধর্মধ্বজী বাদশাহ উঠিতেন বসিতেন ইহা সকলেই জানিত।

পারস্যের রাজা দ্বিতীয় শাহ আব্বাস আওরংজীবকে ধিক্কার দিয়া পত্র লিখিলেন (১৬৬৭)—"তুমি নিজেকে রাজাব রাজা (শাহানশাহ বাদশাহ) বল আর শিবাজীর মত একটা জমিদারকে দুরস্ত করিতে পারিলে না। আমি সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি তোমাকে রাজ্য-শাসন শিখাইব।" শিবাজীর স্মৃতি কাঁটার মত আওরংজীবের হৃদয়ে আমরণ বিদ্ধ ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বাদশাহ পুত্রের প্রতি যে শেষ উপদেশ লিখিয়া যান, তাহাতে আছে— "দেশের সব খবর রাখাই রাজকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। এক দণ্ডের অবহেলা বহুবর্ষব্যাপী মনস্তাপের কারণ হয়। এই দেখ, অবহেলার জন্য হতভাগা শিবাজী আমার হাত হইতে পলাইল, আর তাহার ফলে আমাকে আমরণ এই পরিশ্রম ও অশান্তি ভোগ করিতে হইল।"

আশ্চর্য্য সফলতা এবং অতুলনীয় খ্যাতিতে মণ্ডিত হইয়া শিবাজী সেই যুগের ভারতে সর্ব্বত্রই হিন্দুদের চক্ষে এক নূতন আশার উষা-তারা রূপে দেখা দিলেন। একমাত্র তিনি হিন্দুদেব জাত্ ও তিলকের, শিখা ও উপবীতের রক্ষক ছিলেন। আশা ভরে সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত, তাঁহার নাম করিয়া সমগ্র জাতি মাথা তুলিত।

মারাঠা রাজ্যের পতনের কারণ

তবে কেন শিবাজীর রাজনৈতিক অনুষ্ঠান স্থায়ী হইল না? কেন তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার মৃত্যুর আট বৎসরের মধ্যেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল? কেন মারাঠারা এক রাষ্ট্র সঙ্ঘ (নেশন) হইতে পারিল না? কেন অন্যান্য ভারতীয় রাজন্য ও জাতির মত তাহারাও বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইল?

ইতিহাসের গভীর চর্চ্চা করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায়।

প্রথম কারণ–জাতিভেদের বিষ

মারাঠারা যখন শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা-লাভের জন্য খাড়া হয় তখন তাহারা বিজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন তাহারা গরীব ও পরিশ্রমী ছিল, সাদাসিদে ভাবে সংসার চালাইত, তখন তাহাদের সমাজে একতা হিল, জাত বা শ্রেণীর বিশেষ পার্থক্য বা বিবাদ ছিল না। কিন্তু শিবাজীর অনুগ্রহে রাজত্ব পাইয়া, বিদেশ-লুঠের অর্থে ধনবান হইয়া, তাহাদের মন হইতে সেই অত্যাচার-স্মৃতি এবং তাহাদের সমাজ হইতে সেই সরলতা ও একতা দূর হইল; সাহসের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা বাড়িল। ক্রমশঃ সমাজে জাতিভেদের বিবাদ উপস্থিত হইল।

বহুদিন ধরিয়া অনুর্ব্বর দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশের অনেক ব্রাহ্মণই শাস্ত্রচর্চ্চা ও যজন-যাজন ত্যাগ করিয়া হিন্দু মুসলমান রাজসরকারে চাকরি লইয়া অর্থ ও প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। মারাঠা জাত্ নিরক্ষর, অসি বা হলজীবী; কিন্তু কায়স্থগণ জাতিতেই "লেখক", তাহারা লেখাপড়া করিয়া সরকারী চাকরি পাইতে লাগিল, ধনে মানে বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হিংসায় জ্বলিতে লাগিল, কায়স্থগণকে শূদ্র ও অন্ত্যজ বলিয়া ঘোষণা করিল। উপবীত গ্রহণের অপরাধে কায়স্থ ("প্রভু") জাতের অকথ্য কুৎসা প্রচার করিল, তাহাদের নেতাদের একঘরে ("গ্রামন্য") করিল।

এমন কি শিবাজীর অভিষেকের সময়ই ব্রাহ্মণেরা একজোটে মারাঠা জাতের ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করিয়া, বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মে ও মন্ত্র-পাঠে শিবাজীর কোন অধিকার নাই এই বলিয়া বসিল। তাহাদের এইরূপ অহঙ্কার ও গোঁড়ামিতে উত্ত্যক্ত হইয়া শিবাজী একবার (১৬৭৪ সালে) বলেন, "ব্রাহ্মণদের জাতিগত ব্যবসা শাস্ত্রচর্চ্চা ও পূজা; উপবাস ও দারিদ্র্যই তাহাদের ব্রত; শাসন-বিভাগে চাকরি করা তাহাদের পাপ। অতএব, সব ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও আমলা, সেনাপতি ও দূতকে চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দিয়া শাস্ত্রসম্মত কাজে লাগাইয়া রাখা হিন্দু রাজার কর্ত্তব্য। আমি তাহাই করিব।" তখন ব্রাহ্মণেরা কাঁদাকাটি করিয়া তাঁহার ক্ষমা পায়।

এইরূপে ব্রাহ্মণেরা অধিক ক্ষমতা পাইয়া অব্রাহ্মণদিগের প্রতি সামাজিক অত্যাচার অবিচার করিতে লাগিল। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও একতা ছিল না। তাহাদের মধ্যে শ্রেণী (বা শাখা)-বিভাগ এবং কৌলীন্য-অভিমান লইয়া ভীষণ দলাদলি ও বিবাদ বাধিয়া গেল। পেশোয়ারা কোঁকনবাসী ("চিৎপাবন" শাখার) ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যখন দেশের রাজা তখনও পুণা অঞ্চলে স্থানীয় ("দেশস্থ" শাখার) ব্রাহ্মণেরা কোঁকনস্থদিগকে অশুদ্ধ হীন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের সঙ্গে পঙ্ক্তি-ভোজন করিত না। আবার চিৎপাবনেরা "কর্হাডে" শাখার ব্রাহ্মণদের উপর খড়্গহস্ত! পেশোয়ারা অপর অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য রাজশক্তি প্রয়োগ করিতেন।

গোয়া-অঞ্চল-বাসী গৌড় সারস্বত (শেন্‌বী)-শাখার ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ, কিন্তু তাহাদিগকে আর সব শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রায় এখানকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মত অবজ্ঞা ও পীড়ন করিত। এইরূপে জাতের সঙ্গে জাত, এমনকি, একই জাতের মধ্যে এক শাখার সঙ্গে অপর শাখা, বিবাদ করিতে লাগিল; সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, রাষ্ট্রীয় একতা লোপ পাইল, শিবাজীর অনুষ্ঠান ধূলিসাৎ হইল।

মারাঠারা রাজ্য হারাইয়াছে, তাহাদের ভারতব্যাপী প্রাধান্য লোপ পাইয়াছে, তাহাদের আবার বিজাতির পদানত হইতে হইয়াছে, তবুও তাহাদের চৈতন্য হয় নাই, তাহাদের মধ্যে এই জাতে জাতে বিবাদ আজও চলিয়াছে—জাতিভেদের বিষ এতই ভীষণ।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচার-বিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিষ। সেই বিভাগমূলক ধর্ম্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা—ইহাই অসাধ্য সাধন।

"শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দু-সমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে; কারণ ধর্ম্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরেই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলি বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া, এমন কি, সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সেই শতদীর্ণ ধর্ম্মসমাজের স্বরাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধানসঙ্গত হইতে পারে না।"

দ্বিতীয় কারণ—নেশন-গঠনের চেষ্টার অভাব

মারাঠা-প্রাধান্যের সময় নেশনের শিক্ষা ও অর্থবল, একতা ও সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যম বৃদ্ধি কবিবার কথা স্থিরমনে ভাবা হইত না, তাহার জন্য দৃঢ় চেষ্টা হইত না; সব লোক নির্ব্বিচারে পূর্ব্বপ্রথা অনুসরণ করিত, হিন্দু জগৎ যেন চোখ বুজিয়া কালস্রোতে ভাসিয়া চলিত। আর ইউরোপের জাতিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ভাবিয়া, খাটিয়া, প্রচার করিয়া, অবিরাম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল; এইরূপ এক ক্রমোন্নতিশীল সঙ্ঘবদ্ধ জাতির সহিত সংঘর্ষ হইবামাত্র বিশাল মারাঠা-সাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাই প্রকৃতির বিধান।

ইউরোপের সহিত ভারতের এই পার্থক্য আজও রহিয়াছে। ভারত ক্রমশঃ বেশী পিছনে পড়িতেছে,—রণে বাণিজ্যে, শিল্পে, সমবেত চেষ্টায় ইউরোপের তুলনায় দিন দিন অধিকতর হীন ও অসমর্থ হইতেছে। মারাঠা ইতিহাস হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

"দিনের দিন সবে দীন

ভারত হয় পরাধীন"

আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার সত্য কারণ নহে,—নৈতিক অবনতির ফল মাত্র।

তৃতীয় কারণ—সুশাসনের স্থায়ী ব্যবস্থার অভাব

মারাঠা রাজত্বে সময় সময় স্থান-বিশেষে সুশাসন ও প্রজার সুখসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত এবং অস্থায়ী। কোন বিশেষ রাজা বা মন্ত্রীর গুণে এই সুফল ফলিয়াছিল; আর তিনি চোখ বুজিবা মাত্র আবার আগের সব কু-শাসন ও অরাজকতা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কার্য্য নষ্ট করিয়া দিত। শিবাজীর পর শম্ভুজী, মাধব রাও পেশোয়ার পর রঘুনাথ রাও ইহারই দৃষ্টান্ত। এই কারণে মারাঠা-শাসনে দক্ষতার অভাব, ঘুষের রাজত্ব, এবং হঠাৎ আগাগোড়া পরিবর্ত্তন বড়ই বেশী দেখা যাইত। ইহাতে প্রজার সুখ-সম্পদ নষ্ট হইল, জাতির নৈতিক বল লোপ পাইল।

চতুর্থ কারণ—স্বদেশ অপেক্ষা স্বার্থের টান বেশী

সে যুগের সমাজের অবস্থা এবং লোকের মনে প্রবৃত্তি যেরূপ ছিল তাহাতে জাতি অপেক্ষা নিজবংশ, স্বদেশ অপেক্ষা পৈত্রিক মৌরসী মহাল (মারাঠী-ভাষায় "বতন") বেশী মূল্যবান বোধ হইত। দেশে রাজা ও রাজবংশের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক স্থলে জমির স্বত্ব বড় অনিশ্চিত এবং গোলমেলে হইয়া উঠিয়াছিল; একই গ্রামের উপর অধিকার দাবি করিত, তিনচার জন ভূস্বামী (যথা, দেশাই, দলবী, সাবন্ত—তাহা ছাড়া দেশের রাজা) এবং পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া অথবা বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে যোগ দিয়া নিজ অধিকার স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিত; স্বজাতীয় রাজা বা দেশের বিচারালয় এই ব্যক্তিগত স্বার্থের সহায়ক না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া দেশের শত্রুকে ডাকিয়া আনিত। ফলতঃ, "বতন" মারাঠা মাত্রেরই প্রাণ ছিল, জন্মভূমি কিছুই না। "বতন" রক্ষা বা বৃদ্ধি করিবার জন্য মারাঠারা কোন পাপ করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। নিজের জাত বা শ্রেণীর অপেক্ষা কোন বৃহত্তর একতার বন্ধন সে যুগের হিন্দুরা কল্পনা করিতে পারিত না। নিজের বংশের বা জাতের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের হিত যে বড় ও শ্রেয় তাহা রাজা-প্রজা উচ্চনীচ কেহই বুঝিত না, ভাবিত না। সকলেরই চেষ্টা নিজ ধন ও বল, মর্য্যাদা ও সামাজিক পদ বৃদ্ধি করা, তাহা স্বরাজেই হউক, আর পরাধীনতা স্বীকার করিয়াই হউক।

এই অগণিত লোকসমূহ নিজের স্বার্থ অপেক্ষা কোন মহত্তর উদ্দেশ্য, নিজের ইচ্ছা অপেক্ষা কোন মহত্তর চালনা-শক্তি মানিত না। তাহারা, জীবনের শৃঙ্খলাকে সুখের অন্তরায় এবং নিয়ম-পালনকে দাসত্ব বলিয়া ভাবিত। যদি দেশে সকলেই নিজ নিজ খেয়াল দমন করিয়া এক সর্ব্বব্যাপী বিধি ও সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তাকে মানিয়া লয়, তবেই সে জাতি একতাবদ্ধ ও অজেয় শক্তিশালী হইতে পারে, সভ্যতার দ্রুত উন্নতি করিতে পারে। এই জন-সমষ্টির নিয়মানুবর্ত্তিতা (ইংরাজীতে যাহাকে 'ডিসিপ্লিন' বা 'রেন্ অব্ ল' বলে) যে জাতির নাই তাহারা স্বাধীন হইতে পারে না,—স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অনাচার অরাজকতা করিয়া শেষে কোনও মহত্তর জাতির নিকট হীনস্বীকারে বাধ্য হয়, নিজেদের পরাধীনতার শৃঙ্খল নিজেরাই গড়ে। জগতের ইতিহাস যুগে যুগে এই সত্যই প্রচার করিতেছে। অন্যান্য মারাঠা নেতারা এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল, স্বার্থে অন্ধ, জাতীয়তার কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ছিল বলিয়াই, শিবাজীর সমস্ত চেষ্টার ফল তাঁহার অবর্ত্তমানে পণ্ড হইল; তিনি যে মহৎ কাজের সূচনা করিয়া যান তাহা স্থায়ী করা, জাতীয় দেহ গড়িয়া তোলা সম্ভব হইল না।

পঞ্চম কারণ—অর্থনৈতিক অবনতি

মারাঠা-শাসনের প্রধান দোষ ছিল অর্থনীতির অবহেলা। কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি, প্রজা ও দোকানদারদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা ও ঘুষ বন্ধ করা, সুনির্ম্মিত ও সুরক্ষিত পথঘাট, বিচারালয়ে বিবাদের সত্বর সুবিচার, স্থায়িভাবে দেশের ধন-বৃদ্ধি এবং তাহার দ্বারা রাজ্যের শক্তির উন্নতি,—ইহার কোনটির দিকেই রাজা-উজীরের দৃষ্টি ছিল না। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল "মুলুক্‌গিরি" অর্থাৎ পর-রাজ্য লুঠ করিয়া ধন-দৌলত আনা; তাহতেই তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত লোকবল ব্যয় হইত। ইহার ফলে মারাঠারা অন্য সব লোকের—হিন্দু মুসলমান, রাজপুত জাঠ, কানাড়ী বাঙ্গালী,—দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত জুড়িয়া রাজা-প্রজার, পীড়ক[21] ও শত্রু হইল,—জগতে এক জনও বন্ধু রাখিল না। এই অন্ধ ও অসৎ রাজনীতি অনুসরণের ফলে মারাঠাদের পতনের জন্য সকলেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। আর, তাহাদের বারংবার লুণ্ঠনের ফলে দেশের সর্ব্বত্রই ধনাগম বন্ধ হইল, কৃষি বাণিজ্যে দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল, অনেক উর্ব্বর ক্ষেত্র জঙ্গলে পরিণত এবং সমৃদ্ধ শহর দগ্ধ ভগ্ন জনহীন হইল; লোকে অর্থ সঞ্চয় করিবার, অর্থ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। শেষে এমন হইল যে মারাঠারা আসিয়া পূর্ব্বের চৌথের দশমাংশও পাইত না। কেবলমাত্র রাজ্য-লুঠের বলে যে জাতি বলীয়ান হইবার চেষ্টা করে তাহার অর্থবল এইরূপ মরীচিকা মাত্র।

ষষ্ঠ কারণ—সত্যাশ্রয়তার ও রাষ্ট্রীয় বলের অভাব

মারাঠাদের মধ্যে বীর ও যোদ্ধা অনেক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের নেতারা রাজনীতির ক্ষেত্রে কৌশল ও প্রতারণাই বেশী অবলম্বন কবিতেন। তাঁহারা বুঝিতেন না যে, মিথ্যা কথা দু'একবার চলে—চিরকাল চলে না। কথা রক্ষা না করিলে, বিশ্বাসঘাতক হইলে, সত্য ব্যবহার না করিলে, কোন রাজ্যই টিকিতে পাবে না। মারাঠা সেনাপতি ও মন্ত্রীরা লাভের সুযোগ পাইলেই সন্ধি ভঙ্গ করিতেন, নিজ কথার বিপরীত আচরণ করিতেন—ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেন না। কেহই তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে, বিশ্বাস করিতে পারিত না।

রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে যুদ্ধ ও কৌশল (ডিপ্লোম্যাসি) দুই-ই আবশ্যক, এবং যুদ্ধও সময় বুঝিয়া, পূর্ব্ব প্রস্তুত হইয়া, করা উচিত। কিন্তু মারাঠা রাজনীতি ছিল প্রত্যেক বৎসর কোন-না কোন প্রদেশে অভিযান পাঠান। এই বাৎসরিক যুদ্ধে কিছু অর্থ লাভ হইত বটে, কিন্তু সৈন্যনাশ ও শত্রুবৃদ্ধি হইয়া তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিত। এই সব দূরদৃষ্টিহীন অভিযান এবং কূট পররাষ্ট্র নীতি ও ষড়যন্ত্র অনুসরণের ফলে মারাঠা রাজশক্তি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। আর সেই সময় সুদক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদেশী বণিকেরা স্থিরবুদ্ধিতে পদে পদে অগ্রসর হইয়া, ক্রমশঃ নিজ শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের সার্ব্বভৌম প্রভু হইল, মারাঠা জাতি ইংরাজের অধীন হইল। ইহা প্রকৃতির অনিবার্য্য বিধান।

---

[21]একজন বাঙ্গালী কবি সংস্কৃতে বর্গীদিগকে "কৃপায় কৃপণ, গর্ভবতী ও শিশুর পীড়ক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১৭৪৩ সাল)।

শিবাজীর চরিত্র

মারাঠাদের গৌরব যে-সময়েই শেষ হউক না কেন, শিবাজী তাহার জন্য দায়ী নহেন; এই জাতীয় পতন তাঁহার কীর্ত্তি ম্লান করে নাই, বরং বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার চরিত্র নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, সন্তানপ্রীতি, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধর্ম্মানুরাগ. সাধুসন্তের প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জ্জন, শ্রমশীলতা, এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি উদারভাব সে যুগে অন্য রাজবংশে কেন, অনেক গৃহস্থঘরেও অতুলনীয় ছিল। রাজা হইয়া তিনি রাজ্যের সমস্ত শক্তি দিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা, নিজ সৈন্যদলের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন, সর্ব্ব ধর্ম্মের মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সম্মান এবং সাধুসজ্জনের পোষণ করিতেন।

তিনি নিজে নিষ্ঠাবান ভক্ত হিন্দু ছিলেন, ভজন ও কীর্ত্তন শুনিবার জন্য অধীর হইতেন, সাধু-সন্ন্যাসীর পদসেবা করিতেন, গোব্রাহ্মণের পালক ছিলেন। অথচ, যুদ্ধ-যাত্রায় কোথাও একখানি কোরাণ পাইলে তাহা নষ্ট বা অপবিত্র না করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং পরে কোন মুসলমানকে তাহা দান করিতেন; মসজিদ ও ইস্‌লামী মঠ (খান্‌কা) দেখিলে তাহা আক্রমণ না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁ শিবাজীর মৃত্যুর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "কাফির জেহন্নমে গেল"; কিন্তু তিনিও শিবাজীর সৎ চরিত্র, পরস্ত্রীকে মাতার সমান জ্ঞান, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সর্ব্ব ধর্ম্মে সমান সম্মান প্রভৃতি দুর্লভ গুণের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। শিবাজীর রাজ্য ছিল "হিন্দবী স্বরাজ", অথচ অনেক মুসলমান তাঁহার অধীনে চাকরি পাইয়াছিল [দৃষ্টান্তের জন্য আমার ইংরাজী শিবাজীর ৩য় সংস্করণের ৪০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

সর্ব্ব জাতি, সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান। ভারতবর্ষের মত নানা বর্ণ ও ধর্ম্মের লোক লইয়া গঠিত দেশে, শিবাজীর অনুসৃত এই রাজনীতি অপেক্ষা অধিক উদার ও শ্রেয় কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না।

শিবাজীর প্রতিভা ও মৌলিকতা

লোক দেখিবামাত্র তাহাদের চরিত্র ও ক্ষমতা ঠিক বুঝিয়া, প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করাই প্রকৃত রাজার গুণ। শিবাজীর এই আশ্চর্য্য গুণ ছিল। আর, তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী-শক্তি ছিল চুম্বকের মত—দেশের যত সৎ দক্ষ মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত; তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়া, তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিয়া, তাহাদের নিকট হইতে তিনি আন্তরিক ভক্তি এবং একান্ত বিশ্বাস ও সেবা লাভ করিতেন। এইজন্যই তিনি সর্ব্বদা সন্ধি-বিগ্রহে, শাসন ও রাজনীতিতে এত সফল হন। সৈন্যদের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগী হইয়া ফরাসী সৈন্যমধ্যে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন।

সৈন্য-বিভাগের বন্দোবস্তে—শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সব বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্ম্মের নানা সুর একত্র ধরিবার ক্ষমতা,প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনুষ্ঠান-নৈপুণ্য—এই সকল গুণের তিনি পরাকাষ্ঠা দেখান। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার ও তাঁহার সৈন্যগণের জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কোন

প্রণালীর যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইবে, নিরক্ষর শিবাজী শুধু প্রতিভার বলেই তাহা আবিষ্কার ও অবলম্বন করেন।

শিবাজীর প্রতিভা যে কত মৌলিক, কত বড়, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে তিনি মধ্য-যুগের ভারতে এক অসাধ্য সাধন করেন। তাঁহার আগে কোন হিন্দুই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত প্রখর দীপ্তিশালী শক্তিমান মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই; সকলেই পরাজিত নিষ্পেষিত হইয়া লোপ পাইয়াছিল। তাহা দেখিয়াও এই সাধারণ জাগীরদারের পুত্র ভয় পাইল না, বিদ্রোহী হইল, এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিল। ইহার কারণ—শিবাজীর চরিত্রে সাহস ও স্থির চিন্তার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল; তিনি নিমিষে বুঝিতে পারিতেন, কোন ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত, কোথায় থামিতে হইবে—সময় কোন নীতি অবলম্বন করা শ্রেয়,—এই লোক ও অর্থবলে ঠিক কি কি করা সম্ভব। ইহাই সর্ব্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। এই কার্য্যদক্ষতা ও বিষয়-বুদ্ধিই তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য সফলতার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

শিবাজীর রাজ্য লোপ পাইয়াছে; তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন দান তাঁহার অমর কীর্ত্তি। তাঁহার জীবনের চেষ্টার ফলে সেই বিক্ষিপ্ত পরাধীন জাতি এক হইল, নিজ শক্তি বুঝিতে পারিল, উন্নতির শিখরে পৌঁছিল। ফলতঃ, শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্ত্তা এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর। তাঁহার শাসন-পদ্ধতি, সৈন্য-গঠন, অনুষ্ঠান-রচনা সবই নিজের সৃষ্টি। রণজিৎ সিংহ বা মাহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মত তিনি ফরাসী সেনাপতি বা শাসনকর্ত্তার সাহায্য লন নাই। তাঁহার রাজ্য-ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, এবং পেশোয়াদের সময়েও আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত।

নিরক্ষর গ্রাম্য বালক শিবাজী কত সামান্য সম্বল লইয়া, চারিদিকে কত বিভিন্ন পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া, নিজেকে—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মারাঠা জাতিকে—স্বাধীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা এই গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই আদি যুগের গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের পর শিবাজী ভিন্ন অপর কোন হিন্দুই এত উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই।

একতাহীন, নানা খণ্ডরাজ্যে বিচ্ছিন্ন, মুসলমান রাজার অধীন, এবং পরের চাকর মারাঠাদের ডাকিয়া আনিয়া শিবাজী প্রথমে নিজ কার্য্যের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা নিজেই নিজের প্রভু হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তাহার পর, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে বর্ত্তমান কালের হিন্দুরাও রাষ্ট্রের সব বিভাগের কাজ চালাইতে পারে; শাসন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে, জলে-স্থলে যুদ্ধ করিতে, দেশে সাহিত্য ও শিল্প পুষ্টি করিতে, বাণিজ্য-পোত গঠন ও পরিচালন করিতে, ধর্মরক্ষা করিতে, তাহারা সমর্থ; জাতীয় দেহকে পূর্ণতা দান করিবার শক্তি তাহাদের আছে।

শিবাজীর চরিত-কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মত হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন, কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নূতন শাখাপল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড় ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্য্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে,—জাতি অমর অজেয় হয়।

সমাপ্ত